SWANIRBACHITA TARAPADA ROY

A Collection of varieties articles

by

Tarapada Roy

ISBN 81-7572-040-9

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

শ্রীঅসিত ভৌমিক
করকমলেষু—

ভূমিকা

সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত অথচ আমার নিজের কাছে প্রিয় রচনাগুলির সঙ্কলন এই বই।

এর মধ্যে পঁয়ত্রিশ বছর আগের লেখা যেমন রয়েছে তেমনি অতি সম্প্রতি রচিত গল্পও রয়েছে।

গল্প-উপন্যাস, নাটক, রম্য-রচনা সবই এই বইতে রয়েছে। নেই আমার কবিতা এবং ছোটদের রচনা ও ছড়া, বিবিধ প্রবন্ধ ইত্যাদি। সেগুলো নির্বাচিত সঙ্কলন অন্যভাবে করতে হবে।

এইচ-এ, ৫৫
সেক্টর ৩, সল্টলেক
কলকাতা ৯১

বিষয়সূচি

উপন্যাস

খাঁচাছাড়া

॥ এক ॥
উপক্রমণিকা

I am thy father's spirit,
Doom'd for a certain time to walk the night,'
—Shakespeare, Heamlet.

এ আমার স্বপ্নাদ্য কাহিনী।

এ কাহিনী আনন্দের না বেদনার, সুখের না দুঃখের, জীবিতের অথবা মৃতের—তা আমি নিজেও জানি না।

এই আখ্যানের রাস্তাঘাট, মানুষজন, সাল-তারিখ কিছু ঠিক, কিছু বেঠিক। তা নিয়ে আমার চিন্তা নেই। আর এই ইহলোকের যাঁরা, ওই পরলোকের যাঁরা নিজ গুণে, বিনা প্ররোচনায় আমার এই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেছেন তাঁরা নিশ্চয় নিজগুণেই আমাকে মার্জনা করবেন।

এ কাহিনী কোনো এক ভট্টাচার্য বংশের দুই যুগের দুই অবিচ্ছেদ্য আত্মারামকে নিয়ে, একজন এই বংশের দ্বিতীয় প্রজন্ম, অন্যজন একই ডায়নাস্টির শেষ পুরুষ।

প্রথম আত্মারাম তথা হারু তথা কাকাবাবুর মৃত্যু অথবা জন্ম হয়েছিল উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো এগারোয় যেদিন মোহনবাগান ক্লাব আই এফ এ শিল্ড পেল—সে বহুকাল আগের কথা; দ্বিতীয় আত্মারাম, আমাদের খুব কাছের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। এক অসফল, উদ্যোগহীন ব্যক্তি, হলেও-বা-হতে-পারতো কবি, এই পরের আত্মারাম—তাকে নিয়েই আমাদের যত গল্প।

একজন বাঙালি ভদ্রলোকের পক্ষে আত্মারাম নামটা নিয়েই বসবাস করা কঠিন। তার সঙ্গে ভট্টাচার্য, পুরো নাম আত্মারাম ভট্টাচার্য। যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে জলজ্যান্ত উঠে এসেছে, বর্গীর হাঙ্গামায় ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

পদবীটার দায়িত্ব অবশ্যই আত্মারামের পিতৃ পুরুষদের কিন্তু আসল নামটা আত্মারামের মাতামহের দেয়া। আত্মারাম জন্মেছিল গয়াতে তার মামার বাড়িতে। গয়া মিউনিসিপ্যালিটির দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেয়ারম্যান তখন রায়সাহেব আত্মারাম

চৌধুরী, তিনি ছিলেন আমাদের বর্তমান আত্মারামের মাতামহের প্রধান বন্ধু। সেই প্রাতঃস্মরণীয় চৌধুরী সাহেবের নামেই আত্মারামের নামকরণ হয়েছিল, বিনিময়ে রায়সাহেব একটি সতেরো আনি সোনার আশরফি দিয়ে বন্ধুর দৌহিত্র এই আত্মারামের মুখদর্শন করেছিলেন।

কিছু কিছু নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে আত্মারাম ভট্টাচার্যের এখন পর্যন্ত বিয়ে থা, চাকরি-বাকরি বিশেষ কিছুই হয় নি। তার বয়স এখন ত্রিশের ওপাশে। কয়েকটি অপোগণ্ড ছাত্রের প্রাইভেট টিউশনি করে কালীঘাটের এক প্রাচীন ভাঙা দোতলা পৈতৃক ভিটের শূন্যগৃহে তার দিন কাটে।

বহু কালের জরাজীর্ণ বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা খসে গত শতকের ছোটো ছোটো আকারের লাল বাংলা ইট বেরিয়ে পড়েছে। শতাধিক বৎসরের পুরোনো বাড়িতে এখন সব কিছুই প্রায় ভেঙে-ধসে নিচতলায় একটা ঘরে এসে ঠেকেছে আর ভাঙা সিঁড়ির মাথায় সিঁড়িকোঠা বা চিলেকোঠা ঘর কোনো অজ্ঞাত কারণে এখনো টিকে আছে।

এই একতলার ঘরের এক পাশে একটা জনতা কেরোসিন স্টোভে আত্মারাম রান্নাবান্না করে। ঘরের অন্য পাশে রয়েছে একটা বিশাল কালো তিন হাত উঁচু মেহগনি কাঠের খাট, দুটো সিঁড়ির ধাপ খাটের সঙ্গে করা আছে, সেটা বেয়ে উঠতে হয়। খাটটা আত্মারামের পিতামহী বিবাহের সময় পিত্রালয় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই খাটের বাজুতে চমৎকার পদ্ম, গোলাপ আর গোলাপের পাতা, কাঠের খোদাইয়ের কাজ, কবেকার কিন্তু মনে হয় যেন ফুলগুলো তাজা, টাটকা সদ্য ফুটে উঠল, এই এঁদো অন্ধকার ঘর আলো করে।

কোনো রকমে আত্মারামের দিন যায়। সে মানুষটি ভালো। ভালো থাকা কী ব্যাপার, ভালো আছি না খারাপ আছি এসব নিয়ে কোনো দুঃখ ছিল না আত্মারামের। নিজের অবস্থার সঙ্গে সে যথেষ্টই মানিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু আজ কিছুদিন হল সে পড়েছে একটা অদ্ভুত ঝামেলায়। তার ঠাকুর্দার এক কাকা সেই উনিশশো এগারো সালে মারা যান। তখন সেই কাকার বয়েস মাত্র উনিশ। সেদিন মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জিতেছে, সারাদিন লাফালাফি, দৌড়োদৌড়ি করে কাকাবাবু বাড়ি ফিরে এসেছেন, তখন তাঁর পেটে নাড়িছেঁড়া খিদে। কাকাবাবু ফিরে এসেই খেতে বসেছেন, উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি মুখে আলুসেদ্ধ-ভাত হঠাৎ গলায় আটকে গেল, তারপর কিসে কী হল বলা কঠিন কিন্তু ক্ষুধার্ত কাকাবাবু কপালে দুচোখ তুলে রান্নাঘরের পিঁড়ির উপরেই ভিরমি খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

তখন থেকে এ বাড়িতে আলুসেদ্ধ-ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। আর সেই যে খালি

পেটে চোঁচোঁ খিদে নিয়ে কাকাবাবু ভরসন্ধেয় অপঘাতে মারা গেলেন তাঁর কিন্তু সরাসরি পরলোক যাওয়া হল না, ক্ষুধার্ত অশরীরী কাকাবাবু ওই বাড়ির মধ্যেই রয়ে গেলেন। কাকাবাবু যদি বিখ্যাত ব্যক্তি হতেন তবে এতদিনে তাঁর মৃত্যুর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী করার সময় এসে গেছে প্রায়, কিন্তু কাকাবাবুর খিদে আজও মেটে নি; বাড়ির মধ্যেই ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ান।

ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনে আগে একটা বেল গাছ ছিল, কাকাবাবু সেখানেই বসবাস করতেন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে এক কালবোশেখিতে বেল গাছটা পড়ে যায় তারপর থেকে কাকাবাবু নিজের বাড়ির ভাঙা চিলেকোঠার এক প্রান্তে কয়েকটা চামচিকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকেন। এটা অবশ্য শুধু দিনের বেলাটুকুর জন্যে, রাতে যখন চামচিকেরা বেরিয়ে পড়ে তিনিও বেরিয়ে পড়েন একই সঙ্গে, বেশি দূর যান না, বাড়ির মধ্যেই থাকেন।

অনেক কাল আগে ভূত হওয়ার প্রথম প্রথম কাকাবাবুকে কেউ কেউ অল্প-বিস্তর ভয় পায় নি তা নয়, যত নিকট আত্মীয়ই হোক হাজার হোক ভূত তো! কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সত্তর বছরে আত্মারামদের বাড়ির লোকদের কাকাবাবুর ভৌতিকতা গা-সহা হয়ে গেছে। পুরুষানুক্রমে ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন। কাকাবাবু যখন প্রথম ভূত হলেন তখনও কাকাবাবুর মা বেঁচে, তিনি যখন বুঝতে পারলেন ছেলে মরে গিয়েও কোথাও যায় নি বাড়িতেই আছে, সন্ধ্যা হলেই রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করছে পেট ভরা খিদে নিয়ে, তিনি ভূত ছেলেটাকে কখনো একটু দুধের সর, কখনো এক টুকরো মাছ ভাজা খেতে দিতেন। একটা ছোট বাটিতে করে বেল গাছটার নিচে রেখে আসতেন, রাতে কোনো এক সময়ে সুযোগ মতো কাকাবাবু সেটা খেয়ে নিতেন। কিন্তু শরীর তো নেই তাই ওঁর খাওয়ার যতটা লোভ তার এক চিলতেও ক্ষমতা নেই।

সে যা হোক কাকাবাবুর মায়ের এই ভূত-ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ানোর ব্যাপারটা সবাই বুঝে ফেলল কিন্তু স্নেহ কিংবা মায়াবশত কেউ কিছু বলল না। বরং কাকাবাবু, যাঁর ডাকনাম ছিল হারু, শেষপর্যন্ত ভালোমন্দ খাওয়ার একজন বাঁধা ভাগীদার হয়ে গেলেন। ভাদ্রমাস, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে, সকলেরই কিন্তু খেয়াল আছে, 'এই হারুকে দুটো তালের বড়া দিস।' কিংবা বড়মামা কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা এনেছেন, সবাই মনে করে বেলতলায় হারুর জন্যে রাখা বাটিতেও এক টুকরো সরভাজা দিয়ে দিত।

এইরকম চলেছে অনেকদিন। পড়াপ্রতিবেশীরাও জেনে গেল। কাছাকাছি কোনো বাড়িতে বেড়ালে মাছ দুধ চুরি করে খেলে পর্যন্ত সকলে বলত, 'হারু খেয়ে গেছে।'

কাকাবাবু কিন্তু কখনোই নিজের ভিটে ছেড়ে যান নি, এই গত তিয়াত্তর বছরে একদিনের জন্যেও যান নি। একবার বছর ষাটেক আগে কী কারণে যেন, আরেকবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এ বাড়ির সবাই সদর দরজায় তালা দিয়ে কলকাতা ছাড়া হয়েছিল, তখন কাকাবাবু ছিলেন এই বাড়িতেই। কাকাবাবুর-তখন খাওয়া জুটত না কিন্তু শরীর নেই তাই খিদে আছে কিন্তু খিদের কষ্ট নেই, লোভ আছে কিন্তু লোভের নিবৃত্তি নেই, খাওয়ার জন্যে খুব মন হুহু করে উঠলে দুটো বেলপাতা চিবোতেন। বেলপাতার গন্ধ বড় সাত্ত্বিক; ভূতেদের তেমন পছন্দ নয়, তবু কাকাবাবু সেই দুর্দিনে কষ্টেসৃষ্টে বেলপাতা চিবিয়েই কাটিয়ে দিতেন। হাজার হোক মনুষ্যজন্মে তো ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন, বেলপাতায় অন্যান্য প্রেতদের যত কষ্ট হয়, তাঁর তা হত না।

সকাল-সন্ধ্যা প্রাইভেট টিউশনি করে আত্মারামের চলে যায়। একা মানুষ, কখনো ডিমসেদ্ধ-ভাত, কখনো মোড়ের মাথা থেকে আলুরদম-রুটি কিনে আনে। সকালে মোড়ের চায়ের দোকানের চা, বিস্কুট কখনো ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে সামান্য জলখাবার কোনোরকমে নিজের আহার হয়ে যায় আত্মারামের।

কিন্তু অসুবিধা হয়েছে ওই কাকাবাবুটিকে নিয়ে। ভট্টাচার্য বাড়িতে এখন আর কেউ নেই, কাকাবাবুর পুরো দায়িত্ব এখন এসে পড়েছে আত্মারামের উপর। আত্মারামের তাতে আপত্তি নেই। সম্পর্ক তো আর তেমন ফেলনা নয়, ভূত হোক, মানুষ হোক, ইচ্ছে করলেই কী দায়িত্ব এড়ানো যাবে। লোকে ছি ছি করবে, ভূতেরাও জানতে পারলে ছি ছি করবে, আপন ঠাকুর্দার আপন কাকা, সাধুভাষায় যাকে বলে খুল্লপ্রপিতামহ, মহাভারতের ভীষ্মদেব অভিমন্যুর যা হতেন ঠিক তাই।

ফেলার সম্পর্ক তো নয়। আর তাছাড়া এই ভট্টাচার্য বাড়ির এক অংশ তো কাকাবাবুর, তা নিয়ে তো তিনি কোনোদিনই কিছু আত্মারামের কাছে দাবি করেন না। এমন কী আত্মারামের জন্যে ভালো ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাঙা চিলেকোঠায় চামচিকের মধ্যে কষ্ট করে থাকেন। এত সব বিচার বিবেচনা করে তারপর কাকাবাবুর দায়িত্ব কী করে অস্বীকার করবে আত্মারাম?

আত্মারাম বহু বিবেচনা করে দেখেছে। এই পুরোনো ভট্টাচার্য বংশে এখন তারা মাত্র দুজন, সে আর কাকাবাবু। কাকাবাবুকে সে ফেলতে পারবে না আবার এই বাড়ির অংশও তো কাকাবাবুরও নিশ্চয় অর্ধেক পরিমাণ। কোনো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে তিনি হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবেন। আর কাকাবাবু নিজে তো কোনোরকম আলাপ আলোচনার ঊর্ধ্বে।

এই পুরোনো ভাঙা বাড়িতে আত্মারাম আর থাকবে না। বেচেটেচে কোথাও

চলে যাবে। কিন্তু কাকাবাবুর অনুমতি দরকার। তিনি কী তা দেবেন, দিতে পারবেন। আর কাকাবাবু যদি তার সঙ্গে যেতে চান, আত্মারাম নিশ্চয়ই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তা সে যেখানেই যাক। এককালের প্রাচীন পূর্বপুরুষ, সাবেকি ভট্টাচার্য বংশের যে রক্ত আত্মারামের ধমনীতে বইছে, কাকাবাবুর ধমনীতেও সেই একই রক্তধারা বহমান।

এই রকম ভাবতে ভাবতে আত্মারামের খটকা লাগে, কাকাবাবু তো আর মানুষ নয়, প্রেতাত্মার আবার ধমনীই বা কী, রক্তই বা কী?

মেহগনি খাটের উপরে বহুকাল লাট হয়ে যাওয়া শতচ্ছিন্ন গদিতে একটা ময়লা তেলচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে আকাশপাতাল ভাবে আত্মারাম। জনতা স্টোভের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কড়িকাঠ, বরগা কালো হয়ে গেছে, ভিতরের ছাদের পলেস্তারা খসে গিয়ে লম্বা টালিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আর কতদিন থাকা যাবে এই বাড়িতে, কে সারাবে? তার চেয়ে বেচেবুচে বেরিয়ে পড়া ভালো। আবার কাকাবাবুর কথা আসে, কাকাবাবুকে ফেলে তো যাওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময়ে ভাবনার এই মুহূর্তে আত্মারামের প্রত্যেকবারই মনোরমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু মনোরমা, সে আজ কোথায়?

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। আজ কয়েকদিন হল খুব বৃষ্টি হচ্ছে। একটু বৃষ্টি বেশি হলেই, ঝিরিঝিরির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই, আত্মারামের ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। এতদিন দেয়াল চুঁইয়ে জলটা পড়ত, কিন্তু কালকে রাতে সরাসরি খাটটার উপরে জল পড়েছে। এখনো গদিটা স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে রয়েছে। গদিটাকে সে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভারি গদি একা ওলটানো কঠিন। তাছাড়া ওলটাতে গিয়ে ভয় হল, হয়তো একেবারেই ফেঁসে যাবে। একশো বছর আগের কোনো এক শিমুল গাছের তুলো বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে।

খাটটা টানাটানি করা আরো কঠিন, অসম্ভব। আর এইটুকু ঘরে তো জায়গাই বা কোথায়। তবে সোজাবুদ্ধির কোনোদিনই অভাব হয়নি আত্মারামের, সে ঠিক করেছে আজও যদি ছাদ দিয়ে জল পড়ে সে চাদর বালিশ নিয়ে খাটের নিচে শোবে। খাট আর গদিটা তাঁবুর কাজ করবে। অবশ্য দু-চারটে আরশোলা বা নেংটি ইঁদুর বিরক্ত করতে পারে, তা করুক।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ আরো ঘন হয়ে এসেছে। জোলো হাওয়া বৃষ্টির গুঁড়ো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে পূবের জানালাটা দিয়ে। কিছুক্ষণ ভালোই লাগছিল, তারপর উঠে বন্ধ করতে গেল জানলার পাল্লাদুটো। তখনই তার মনে হল, নিশ্চয়ই কাকাবাবুর কোনো কষ্ট হয় না বৃষ্টিতে!

আর মনোরমা এই বৃষ্টির দিনে কোথায়, কোন বাড়িতে সে এখন কি করছে, কেমন আছে?

॥ দুই ॥
পুরনো সেই দিনের কথা

'Old, unhappy far ofl things,
and battles long ago.'
—Wordsworth, The Solitary Reaper.

তারিখটা ছিল উনত্রিশে জুলাই, উনিশশো এগারো সাল, খেলা শেষ হওয়ার মাত্র দশ মিনিট বাকি। রুদ্ধশ্বাস সমান সমান খেলা চলছে, সাহেব আর বাঙালির জীবনপণ খেলা। তখন আর মাত্র দশ মিনিট বাকি, গ্যালারি স্তব্ধ হয়ে গেল, হাজার হাজার দর্শকের চিৎকার, উত্তেজনা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল, শুধু কিছু গোরা আর ট্যাশ সাহেব উদ্দাম লাফাতে লাগল, নেটিভদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে, অকল্পনীয় ফ্রি-কিকে ইয়র্কশায়ার এক গোলে এগিয়ে গেল।

র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন কাকাবাবু, যাঁর ডাক নাম হারু, ভালো নাম হারুপদ ভট্টাচার্য। কালীঘাটের বাড়ি থেকে কোনো রকমে কাঁচা লঙ্কা তেল দিয়ে ডাল ভাত মেখে গলাধঃকরণ করে সাড়ে দশটার সময় বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়িতে রান্না হতে হতে প্রতিদিন বেলা দেড়টা-দুটো হয়ে যায়। জোরাজুরি করে মাকে দিয়ে চারটি ডাল ভাত সেদ্ধ করিয়ে খেয়ে আসতে পেরেছে। বাড়িতে উনুন ধরে না বেলা দশটার আগে, মা আলাদা করে তোলা উনুনে রান্না করে দিয়েছেন।

মায়ের একটু বেশি দুর্বলতা আছে হারুর উপর, বড় রোগা ছেলে, তার উপরে কোলের ছেলে। হাড় জিরজিরে, কঙ্কালসার চেহারা পিলেভর্তি বেঢপ পেট, বছরের অর্ধেক সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগে বিছানায় পড়ে থাকে। মা বার বার মানা করেছিলেন হারুকে, 'এতটা পথ, গড়ের মাঠ কী কাছে নাকি, তোর এই শরীরে এতটা হাঁটা সইবে না।'

হারু নিষেধ শোনে নি। বলেছিল, 'পাড়ার সবাই তো যাচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যাব। আর তা ছাড়া আমাদের নীলুকাকা খেলছে, ফাইনালে তাঁর খেলা দেখতে যাব না।' মোহনবাগানের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় নীলমাধব ভট্টাচার্য কী এক দূর সম্পর্কের ভাই হতেন হারুর বাবার। শেষ পর্যন্ত মা আর বাধা দিতে পারলেন না।

এবছর প্রথমে যেমন বৃষ্টিবাদলা ছিল না একেবারে খটখটে, আষাঢ় মাসের

শেষ থেকে জোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এখন শ্রাবণ প্রায় অর্ধেক হয়ে এল তবু বৃষ্টির বিরাম নেই। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, হাতে বুট জুতো নিয়ে কালীঘাটের পোটোপাড়ার মধ্য দিয়ে শর্টকাট করে, ভবানীপুর দিয়ে, পোড়াবাজারের পিছন দিয়ে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে হই হই করতে করতে বেলা বারোটার মধ্যে র‍্যামপার্টে জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে পড়ল হারু।

হারু যুবকটি রুগ্ন ও দুর্বল। চেতলা স্কুলে পড়ত, পর পর দুবার এণ্ট্রান্সে ফেল করেছে। এখন থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আবার উঠে গেল, নতুন পরীক্ষার নাম হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন, ছোটো করে ম্যাট্রিক। ম্যাট্রিক আবার একটা পরীক্ষা নাকি, কোথায় এণ্ট্রান্স আর কোথায় ম্যাট্রিক, ম্যাট্রিকুলেশনের নাম দিয়েছেন পণ্ডিত মশায়েরা মাতৃকুলনাশন। এ পরীক্ষা পাশ করা আর না করা সমান, হারু ঠিক করেছে এণ্ট্রান্স যখন হলই না, ম্যাট্রিক দরকার নেই। ম্যাট্রিক পাশের কোনো মূল্যই থাকবে না। একেবারে খেলো ব্যাপার হবে।

হারুর বড়োমামা আলিপুরের উকিল রামজীবন চট্টোপাধ্যায়ের মুহুরি। হারুর হাতের লেখা ভালো, সৎ বংশ, তা ছাড়া বোকাও নয়, বড়মামা বলে রেখেছে রামজীবনবাবুকে। রামজীবনবাবুর বড়ো ছেলেও তাঁরই সেরেস্তায় বসেছে, পাঁচ সাত বছর ওকালতি করছে এরই মধ্যে বেশ পসার করে ফেলেছে বড়োমামার উকিলবাবুর বড়ো ছেলে রামগতিবাবু। ওই রামগতিবাবুর জন্যেই একটা বাচ্চা মুহুরি লাগবে, আশা করা যাচ্ছে কাজটা হয়ে যাবে হারুর। একদিন বড়োমামার সঙ্গে গিয়ে রামজীবনবাবু আর রামগতিবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছে হারু। পদ্মপুকুরের কাছে বিরাট বাড়ি। রামজীবনবাবু বলেছেন, 'মুহুরির কাজ করবে? একালের ছেলেরা তো এসব কাজ করতে চায় না। তাদের নাকি মানহানি হয়! এণ্ট্রান্সটা পাশ করতে পারলে বা মোক্তার হতে পারতে।'

অত উচ্চাশা হারুর নেই। রামগতিবাবু তাকে আশ্বাস দিয়েছেন, 'বর্ষাটা যাক পুজোর পরে এসো। তোমাকে দিয়েই আমার চলে যাবে। দরকার পড়লে বাবার সেরেস্তায় তো চারপাঁচ জন পাকা লোক রয়েছেন।' তারপর একটু থেমে বলেছেন, 'তবে বাবার মুহুরিবাবুদের দিয়ে আমার চলছে না। এখন মক্কেলরা এত চালাক হয়েছে। বাবাকে এক পক্ষ নিলেই অন্য পক্ষ আমাকে মামলা দিতে আসে। ভাবে বুড়ো কত্তা নিশ্চয়ই ছেলেকে মামলা ছেড়ে দিয়ে জিতিয়ে দেবে। বাবাকে তারা অবশ্য চেনে না। কিন্তু আমার আলাদা মুহুরি চাই। মনে হচ্ছে, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে তোমাকে দিয়েই হবে। এর মধ্যে তুমি তোমার বড়োমামার কাছে কাজটা বুঝে নিতে থাকো।'

এই মুহূর্তে অবশ্য এসব চিন্তা হারুর মাথায় নেই। প্রায় দু ক্রোশ পথ হেঁটে

আসা, তারপর পাকা চার ঘণ্টা খালি পেটে দাঁড়িয়ে থাকা, শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, চেঁচানো, লাফানো অবশেষে এই খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিটও বাকি নেই একটা বল ঢুকে গেল গোলের মধ্যে, গোল লাইনের উপরে হীরালাল মুখার্জি হাঁ করে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। বাঁদিকের গোল পোস্টটার দিকে—হারু এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না, এত বড়ো মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা, এত বড়ো আশাভঙ্গের ঘটনা হারুর উনিশ বছরের জীবনে আর ঘটেনি।

হারু মাঠের মধ্যে একবার নীলুকাকার দিকে তাকাল। নীলমাধব ভট্টাচার্য তখন মাথা নিচু করে হতভম্ব স্থির দাঁড়িয়ে, অভিলাষ ঘোষ তাঁর পাশে গিয়ে কী একটা বললেন, তাতে যেন নীলুকাকার সম্বিত ফিরে এল। দ্রুত পায়ে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

মোহনবাগান সেণ্টার করেছে। হালদার বাড়ির গদাইদা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই হারু এসেছে। গদাইদার প্রবল উৎসাহ, কিন্তু এই মুহূর্তে নিতান্ত মনমরা, হারুকে বললে, 'চল হারু, অনেকটা হাঁটতে হবে। আর দেখে কি হবে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে অঘটন ঘটল। ইস্ট ইয়র্কের গোলকিপার দানবের মতো চেহারা, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া হাতের পাঞ্জা দশটা লোকের সমান যে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে দেখছে শিবদাস ভাদুড়ি তাকে পরাজিত করে গোল শোধ করে দিয়েছে। র‍্যাম্পার্টের আর মাঠের অর্ধেক লোক যারা তখন নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরবার উদ্যোগ করছিল, তারা পাগলের মতো ছুটে এল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল জনতা। কে যেন ভিড়ের মধ্যে একটা ট্যাঁশ সাহেবকে পেছন থেকে লাথি ঝাড়ল। অন্যদিকে একটা গোরা সার্জেন্ট একটা ঘোড়া চালিয়ে দিল একদল দর্শকের মধ্যে দিয়ে, বলা বাহুল্য সেই দর্শকেরা কেউই সাদা-চামড়া নয়।

গদাই হালদারের সঙ্গে হারুর আর ফেরা হল না, কে ফিরবে এই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে? দম বন্ধ, নাড়ি বন্ধ, হৃৎপিণ্ডের আন্দোলন বন্ধ পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের বেশি কষ্ট দিলেন না শিবদাস ভাদুড়ি, ইস্ট ইয়র্কের সাহেবগুলোকে পাশ কাটিয়ে একটা দুর্দান্ত বল তুলে দিলেন কিংবদন্তির অভিলাষ ঘোষের পায়ে, দানব ক্রেসি কিছুই করতে পারল না, যে দুই হাত দিয়ে সে বল ধরে সেই দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা চাপড়ে গুম মেরে গেল।

রেফারির বাঁশিতে শেষ হুইসল বাজল। ততক্ষণে সমবেত জনতা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। শেষ বাঁশি বাজতেই গদাই হালদার শূন্যে একটা সাড়ে তিন হাত লাফ দিয়ে পড়লেন, একদল অচেনা লোকের উপরে। তারাও তখন লাফাচ্ছে। কেউ কিছু মনে করল না। মাথার উপরে দু হাত তুলে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে হারুও লাফাতে লাগল, নাচতে লাগল।

বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার আর বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আদিগঙ্গায় বিচুলি ঘাটে জামাকাপড় সুদ্ধ একটা ডুব দিল হারু। একটু সাঁতার কাটল। মধ্য শ্রাবণের জোয়ারে ও জলে ফুলে ফেঁপে রয়েছে আদিগঙ্গা। ওপারে চেতলার হাটের মাঝ-বরাবর জল ঢুকে গেছে। স্নানের পর ঘাটে ফিরে এসে হারু দেখে বুট জুতো জোড়া পাড়ের বেলগাছটার গুঁড়ির পাশে রেখে গিয়েছিল, সেটা নেই। খুব বেশি পায়ে দেওয়া হয়নি, জুতোটা প্রায় নতুন বললেই চলে। এই তো গত পুজোর সময় ধর্মতলায় গিয়ে হার্পারের দোকান থেকে কেনা, দেড় টাকা দাম লেগেছিল, এত দামের জিনিসটা কে চুরি করল?

অবশ্য জুতো হারানোয় হারুর কোনো অসুবিধা হল তা নয়। কারণ শুধু জুতো পরা কেন, জামা কাপড় সব কিছু থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে অব্যাহতি পেল হারু। বাড়ি ফিরে উত্তেজিত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হারু ম্যালেরিয়া-ভোগী দুর্বল যুবকটি সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারল না। প্রথম ভাতের গ্রাসটা মুখে দিয়েই কী রকম দম বন্ধ মনে হল তার, আলু সেদ্ধ দিয়ে টান টান করে মাখা ভাতের প্রথম দলাটাই গলায় আটকে গেল নাকি বুকের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা উঠে এল, কিছু বুঝে ওঠার আগে কপালে চোখ তুলে ধরাশায়ী হল হারু। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ।

সব শেষ অথবা সব শুরু।

হারুর সব শেষ হল, শুরু হল কাকাবাবুর।

হারু নামে সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত অকালমৃত যে যুবকের কথা আমরা এতক্ষণ বললাম, মাত্র উনিশ বছর বয়েসে আনন্দ ও পরিশ্রমের আতিশয্যে যে দেহত্যাগ করেছিল, সঙ্গত কারণেই তাকে আমরা আপনি আজ্ঞে করিনি।

কিন্তু আজ এই উনিশশো চুরাশি সালে হারুর অশরীরী অস্তিত্বের বয়েস তিয়াত্তর পার হয়ে চুয়াত্তরে এসে পড়েছে। যদিও উনিশ বছরের যুবকের আত্মা সে, কিন্তু তার প্রবীণতা স্মরণ করে এই কাহিনীতে তাকে কাকাবাবু হিসেবে আপনি বলে সম্বোধন করব, তবে হারুকে তুমিই বলব।

সেটাই উচিত হবে। তা ছাড়া হারু নামে এণ্ট্রান্স ফেল, খেলা-পাগল যুবকটিকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা বহুকাল বিগত হয়েছেন। কাকাবাবু বেঁচে থাকলে এখন তাঁর বয়েস হত নব্বুয়ের কোঠায়। উনিশশো ষাট সালে পাশের বাড়ির গদাই হালদার, তার পরে সাতষট্টি সালে কাকাবাবুর এক ভাগিনেয়, যার হারুর মৃত্যুকালে বয়েস ছিল সাত-আট বছর, এরা দুজন মারা যাওয়ার পর মর-পৃথিবীতে কাকাবাবুকে স্মরণ করতে পারে এমন কেউ রইল না।

ফলে এখনকার ভট্টাচার্য বাড়ির আশেপাশের লোকেদের কাকাবাবু সম্পর্কে

কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। তবে সবাই মোটামুটি জানে যে ভট্টাচার্য বাড়িতে একটা বহু পুরোনো ভূত আছে। আগে কাকাবাবু ছোটোখাটো গোলমাল করতেন, কিন্তু একালের মানুষদের তাদের কথাবার্তা চালচলন, আচার-আচরণ কাকাবাবুর কাছে কেমন গোলমেলে লাগে, তিনি তাদের যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন।

চিরকাল এরকম ছিল না। প্রথম-প্রথম সন্ধ্যার আড়ালে কাকাবাবু একটু মজা করতেন। সেই তিয়াত্তর বছর আগে কাকাবাবুর দু চারজন বন্ধুবান্ধব এ পাড়ার কয়েকজন বখা যুবক কালীঘাট মন্দিরের চাতালে বসে দল বেঁধে গাঁজা খেত। কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা কাকাবাবু তাদের পাশে গিয়ে বসতেন। হাতে হাতে গাঁজার কলকে ঘুরছে হঠাৎ কাকাবাবু দুজনের মধ্যে অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে কলকেটা ধরে নিলেন। গাঁজার নেশায় সবাই বুঁদ, এই আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমে কেউ টের পেত না কিন্তু একটু পরে গোলমাল লাগত, হাতে হাতে গাঁজার কলকেটা তো আর ঘুরছে না, কলকেটা গেল কোথায়? হঠাৎ নেশার চোখে কাকাবাবুর চেতলা স্কুলের ক্লাস ফ্রেণ্ড শিবকালী, তখন সে ইস্কুল ছেড়ে চেতলা হাটে মশারির দোকান করেছে, সে দেখে একটু দূরে শূন্যে অন্ধকারে উত্তরের অশ্বত্থ গাছটার বাঁয়ে জ্বলন্ত কলকেটা উড়ছে আর তার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শিবকালী সেদিকে তাকিয়ে দেখতেই কে যেন শূন্য থেকে কলকেটা আছড়ে ফেলল গাঁজাখোরদের চক্রের মধ্যিখানে, ছোটো মাটির কলকে মট করে ভেঙে গেল।

কে ভাঙল কলকেটা, এই নিয়ে একে অন্যকে দোষারোপ করে প্রায় হাতাহাতি করতে যাচ্ছে, তখন শিবকালী দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে বলল, 'আরে, আমরা কেউ কলকেটা ফেলিনি, এটা হারুর কাণ্ড। একে শনিবারের সন্ধে, তারপরে বিকেলে চতুর্দশী লেগেছে। যে যার মতো বাড়ি ফিরে যা।'

কালীঘাট থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত আদিগঙ্গার পূর্বপারের পাড়াটায় সে আমলে হারুর মতো আরো কেউ কেউ ছিল। সাধারণত হঠাৎ বা অপঘাতে মৃত্যু হলে বছর খানেক হাওয়ায় হাওয়ায় পাড়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ মিটে যেতে তারাও মিলিয়ে যেত।

কিন্তু কোথায় যেন কী একটা গোলমাল হয়েছিল হারু অর্থাৎ কাকাবাবুর ক্ষেত্রে ওই গাঁজার কলকের ঘটনা ঘটেছিল তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক মাস পরে। ততদিনে বাড়ির লোকেরা, পাড়ার লোকেরা জেনে গেছে হারু যায় নি, হারু রয়ে গেছে।

শিবকালী একদিন সকাল বেলায় ভট্টাচার্য বাড়িতে গিয়ে হারুর বড়দা চারুবাবু, মানে আত্মারামের প্রপিতামহের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা বলেছিল। হারুর সহপাঠী ছিল, সেও হারুর বড়দাকে বড়দা বলত, বলল, 'বড়দা, হারু তো

এখনো ঘোরাঘুরি করছে। বামুনের ছেলে, লোকে নিন্দে করছে, বলছে ব্রহ্মদত্যি উৎপাত করছে। আপনারা আরেকবার ওর শ্রাদ্ধশান্তি করুন। তা না হলে তো ও কিছুতেই যাচ্ছে না। তাছাড়া ওরও একটা ফিউচার আছে, ভবিষ্যৎ, পরজন্ম আছে। এতগুলো দিন যদি ভূত হয়েই নষ্ট করে, তবে পরের জন্মের আয়ুটাও তো এখানেই কমে যাবে। তখন আবার অঘোরে মারা পড়বে।'

শিবকালীর কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু সে নাম করা গাঁজাখোর। আগের বছর মহালয়ার রাতে শিবকালী সারা সন্ধ্যা বেহুঁশ। গাঁজা খেয়ে কালী মন্দিরের হাঁড়িকাঠে মাথা দিয়ে আত্মবলিদানের চেষ্টা করেছিল।

গেঁজেলের কথায় কোনো পাত্তা দেন নি হারুর বড়দা। তাছাড়া হারু যে মরেও রয়ে গেছে এটা তাঁদের এখন বেশ গা-সহা ব্যাপার। মা তো হারুকে ভালোমন্দ যা পারেন এখনো খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। হারু রয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। হারুর জন্যে মা যেরকম কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন এখন তবু সেটা করছেন না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না বটে কিন্তু কাছাকাছি আছে, মার পক্ষে এটাই যথেষ্ট।

তবে মা নিজে দু'একটা গোলমাল করছেন হারুর ব্যাপারে তাঁর জীবিতে-মৃতে ভেদাভেদ দূর হয়ে গেছে। মাথা খারাপ নয় কিন্তু ব্যাপারটা অবাস্তব। সেদিন বড়োমামা এসেছিলেন, যিনি পদ্মপুকুরের বড়ো উকিল রামজীবনবাবুর সেরেস্তায় মুহুরির কাজ করেন। তাঁরই ছেলে রামগতি উকিলের কাছে হারুর কথা ছিল চাকরি করার।

মা সেদিন বড়োমামাকে বললেন, 'রামগতিবাবুর ওখানে হারুর কাজটা হতে পারে কিনা?' বড়োমামা রান্নাঘরের বারান্দায় একটা কাঁঠাল কাঠের পিড়িতে বসে মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা পাথরের বাটি থেকে গুড় মাখানো ফুটি খাচ্ছিলেন, কয়েক মাস আগে মৃত ভাগিনেয়ের চাকরির প্রস্তাব শুনে তাঁর হাতের কালো পাথরের বাটিটা পড়ে দু টুকরো হয়ে গেল, তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন, 'হারু? হারু কোথায়? সে কী করে কাজ করবে?' হারুর মা ভাঙা পাথরের বাটির টুকরোগুলো মেঝে থেকে কুড়োতে কুড়োতে জবাব দিলেন, 'কেন, সে খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়, কুড়ি বছর বয়স হতে চলল তার, সে কাজ করতে পারবে না? সন্ধ্যাবেলায় তো উঠোনের ওই বেলতলায় বসে থাকে, তুই আজ সন্ধ্যায় আসিস তো সঙ্গে পাঠিয়ে দেব রামগতিবাবুর বাড়িতে।'

বড়োমামা বেল গাছটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, তখনো হারুর মা বলে যাচ্ছেন, 'তুই একটু উকিলবাবুকে বলিস, ছেলেটা বড়ো লাজুক, একটু আড়ালে আড়ালে থাকবে। তাই বলে কাজ কর্মে কোনো অসুবিধে হবে না।' তারপরে

পারেনি কিন্তু কবিতা সে খুব ভালবাসত, আধুনিক কবিতার খোঁজখবর রাখত খুব। সেই জোর করত, 'আত্মারাম কোনো এখনকার কবির নাম হতে পারে না। আত্মারাম ভট্টাচার্য নামে লিখলে মনসামঙ্গল লিখতে হবে।' আত্মারাম দু একজন গদ্যময় তরুণ কবির নামোল্লেখ করতে যাচ্ছিল, মনোরমা বাধা দিয়ে বলল, 'কবির নাম হবে বিষ্ণু দে, শঙ্খ ঘোষ। শুনলেই বোঝা যাবে কবি।'

মনোরমার প্ররোচনাতেই আত্মারামকে শেষ পর্যন্ত নাম বদল করে রাম আচার্য হতে চেয়েছিল। রাম আচার্যের প্রথম কবিতার বইয়ের জন্যে একটা নামও সে ঠিক করে ফেলেছিল, চমৎকার স্মার্ট নাম; কবির নামের মতোই একদম টানটান, ঋজু, 'সামনে দারুণ দিন আসছে।'

আর একটা ক্ষীণ দুরাশা ছিল সেই যুবক কবির মনে, যদি সাহস হয়, যদি সাহস করে মনোরমার কাছে অনুমতি চাওয়া যায়, যদি দয়া করে অনুমতি দেয় মনোরমা, তাহলে সে তার প্রথম কবিতার বই উৎসর্গ করবে, মনোরমাকে, লিখে দেবে, 'মনোরমা, শুধু মনোরমার জন্যে।'

সত্যিই আশ্চর্য লাগে আত্মারামের , মনোরমা এত সহজে, এত আলতো ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে তার সম্মুখ থেকে সে মোটেই ভেবে উঠতে পারেনি।

সেই এক শীতের সন্ধ্যা, কালীঘাটের ট্রাম রাস্তা তখনো পাতালরেল খুঁড়ে ফেলেনি, ট্রামগুমটির সামনে দাঁড়িয়ে মনোরমা বলল, 'আমরা বাড়ি সুদ্ধ সবাই পরশুদিন খড়্গপুর চলে যাচ্ছি। ওখান থেকে এসেই পরীক্ষা দেব। এর মধ্যে আর দেখা হবে না, পরীক্ষার সময় দেখা হবে।'

মনোরমারা থাকত মনোহরপুকুর রোডের দিকে একটা ভাড়া বাড়িতে। মনোহরপুকুরে বাসা বলে আত্মারামের দুএকজন বন্ধু মনোরমার সম্পর্কে ঠাট্টা করে উল্লেখ করত আত্মারামের মনোহরা। অবশ্য মনোরমার সামনাসামনি ইয়ার্কি করার ছেলে খুব বেশি ছিল না। শ্যামলী, দোহারা চেহারার মেয়েটির একটা ভারিক্কি ভাব ছিল। মা মরা দুই ছোট ভাই আর এক বোন সুদ্ধ প্রৌঢ় পিতা আর বৃদ্ধা ঠাকুমার মাঝারি একটা সংসারের বেশ বড়ো দায়িত্বই তাকে পালন করতে হয়েছে অতি নাবালিকা বয়স থেকে।

সাদাসিধে, সরল মনোরমার বিশেষ কোনো উচ্চাশা ছিল না, কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। মনোরমা যখন থেকে আত্মারামদের বাড়ির সামনে দিয়ে কালীঘাট মহাকালী পাঠশালায় পড়তে যেত তখন থেকেই মনোরমার মুখ চেনা তার। এরপরে মুখচেনাটা পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল এক পাঁউরুটির লাইনে।

সেবার একটা পাঁউরুটির দুর্ভিক্ষ ঘটে গেল কলকাতায়। একদিকে পাঁউরুটি তৈরি হচ্ছে না, রুটির কারখানাগুলো গম পাচ্ছে না অন্যদিকে যে মুহূর্তে রটে

গেল বাজারে পাঁউরুটির অভাব, যে সব লোকেরা কোনোদিন এ দ্রব্য খায়নি, খাবে না, তারা মরীয়া হয়ে উঠল এক টুকরো পাঁউরুটি যোগাড় করার জন্যে।

আত্মারামের সংসারে, কালীঘাটের এই ভট্টাচার্যদের বাড়িতে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও পাঁউরুটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, যেমন নিষিদ্ধ ছিল, রসুন, মুরগি বা মুরগির ডিম।

আত্মারামের মাতামহ ছিলেন গয়া জেলার সাব জেলর। বিহারের অনেক জেলা সদরে আর মহকুমা শহরে তিনি ঘুরেছেন। মামার বাড়িতে রসুন, পেঁয়াজ, ডিম, পাঁউরুটি সবই চলছিল। পুরুষেরা পাজামা পরত, মায়েরা রান্না করার বা গেরস্থালির কাজ করার সময়ে কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিত। বিকেলে শহরের বাজারে টাঙা করে বা পায়ে হেঁটে বাজার করতে যেত বাড়ির মেয়েরা।

পিতৃসংসার থেকে কিছুটা আধুনিকতার বাতাস বয়ে এনেছিলেন আত্মারামের মা। তিনিই আত্মারামদের বাড়িতে প্রথম পাঁউরুটি প্রচলন করেন। তখন অবশ্য আত্মারাম জন্মায় নি এবং আত্মারামের নীতি-পরায়ণা পিতামহী পরলোকে গিয়েছেন।

সে যা হোক। আমাদের এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে ভট্টাচার্য-বাড়ির জটিল ও ক্ষয়িষ্ণু ইতিহাস থেকে আমরা যথাসাধ্য দূরে থাকার চেষ্টা করব। আমাদের আপাতত দৃষ্টি ষাটের দশকের মধ্যভাগে হাজরার মোড়ে একটি অতিদীর্ঘ পাঁউরুটির লাইনে মেয়েদের এবং ছেলেদের দুটো লাইন। আত্মারাম আর মনোরমা দুজনে দু লাইনে প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে। এ রকম একটি অতি অকিঞ্চিৎকর কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার লজ্জা উভয়েরই এবং সেইদিনই তাদের প্রথম আলাপ হল। আত্মারাম মনোরমাকে বলল, 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?' তখনো আত্মারামের সে বয়স হয়নি যে বয়েসে সমবয়সিনীকে আপনি বলা যায় অবশ্য এরই কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় সম্বোধন বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, তরুণ-তরুণীরা এমন কী প্রেমিক-প্রেমিকা পর্যন্ত পরস্পরকে তুই বলে সম্বোধন করা শুরু করেছে।

আত্মারামের সরাসরি প্রশ্নে মনোরমা সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, 'তুমি যতক্ষণ, আমিও ততক্ষণ।' লাইন অত্যন্ত ঢিমে তালে এগোচ্ছে, খুচরোর গোলমাল, সরাসরি বাঁধা দাম তেতাল্লিশ না চুয়াল্লিশ পয়সা অনেকেই ঠিক মতো খুচরো আনে নি। অনেকে এমনি এমনিই রাস্তায় একটা লাইন দেখে ঝোঁকের বসে এবং হাতে কিছু করার নেই বলে দাঁড়িয়ে গেছে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আত্মারাম তার সাবালকত্ব প্রমাণের জন্য মনোরমাকে বলল, 'দেখ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে মাঝে মধ্যে লাইনে দাঁড়াতে হয়। যদি কোথাও দেখ অনেক লাইন, তার মধ্যে দু একটা লম্বা আর দু একটা ছোটো

কোনটায় দাঁড়াবে?' মনোরমার এই অযাচিত চপল প্রশ্নের খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'ছোটো লাইনটায়।'

আত্মারাম বুদ্ধির পরিচয় দিল এবার, বলল, 'ওইটাই ভুল হবে। সবসময় জানবে ছোটো লাইনটাতেই সবচেয়ে বেশি দেরি হয়, আর বড়োটা তাড়াতাড়ি এগোয়।'

সেদিন অবশ্য সেই লাইনে সবশেষ পর্যন্ত আত্মারাম বা মনোরমা কেউই রুটি পায় নি। কী একটা গোলমাল বেঁধে আর রুটি বিলি হয় নি, সব ভেস্তে যায়। তবে ভাঙা লাইন থেকে বেরোনোর পর মনোরমার একটা কথায় মর্মাহত হয়েছিল আত্মারাম, বাড়ির দিকে দ্রুত ফিরতে ফিরতে মনোরমা বলে গেল, 'ধ্যুৎ। এত কথা বলে নাকি ভিড়ের মধ্যে!' বলে একটা ভ্রূভঙ্গি করে সে দ্রুত মনোহরপুকুরের দিকে চলে গেল।

এর পরে অনেকদিন আর মনোরমার সঙ্গে আত্মারামের বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। আত্মারাম অস্বস্তি বোধ করেছে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে এড়িয়ে গেছে। মনোরমাও খুব পাত্তা দেয় নি।

বছর দেড়েক পরে আশুতোষ কলেজের সামনে দেখা। উচ্চতর মাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে, আত্মারাম ভর্তি হওয়ার খোঁজ খবর নিতে গেছে। তার খুব ইচ্ছে ছিল, বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আর না হলে বাংলায় অনার্স। কিন্তু রেজাল্ট তত ভালো হয়নি। দুটোর কোনোটাই সে পেল না। অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছে, কিন্তু বাংলায় কী করে এত কম পেল, সেটা তার খুব দুঃখ।

কলেজের গেটের মুখেই মনোরমার সঙ্গে দেখা। সে নিজেই এগিয়ে এসে আলাপ করল, 'তুমিও তো এবারেই পাস করলে, এখানেই ভর্তি হচ্ছ বুঝি?' আত্মারাম বলল, 'দুটো প্রশ্নেরই উত্তর হ্যাঁ। আর তুমিও কি এখানে ভর্তি হচ্ছ?'

মনোরমা বললে, 'আমাদের তো কলেজ সকাল বেলায়, আমি বাংলায় অনার্স নিচ্ছি।'

আত্মারামের নিজেরও খুব ইচ্ছে ছিল বাংলায় অনার্স নেওয়ার, সে সরল ভাবে বলল, 'আমিও নেব ভেবেছিলাম বাংলায় অনার্স, কিন্তু নম্বর ভালো নেই, দিল না। তোমার নিশ্চয় খুব ভালো নম্বর।' মনোরমা মৃদু হেসে বলল, 'তেমন কিছু নয়, টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিসন। তার মধ্যে আবার ইংরেজিটা প্রায় ফেল করতেই বসেছিলাম।'

কলেজ আরম্ভ হওয়ার পরে মনোরমার সঙ্গে আত্মারামের প্রায় নিয়মিতই দেখা হত, অবশ্য মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মনোরমাদের কলেজ ভাঙত,

আত্মারামদের কলেজ শুরু হত। একই দালান, একই ঘর চেয়ার টেবিল, মনোরমারা বেরোত, আত্মারামরা ঢুকে যেত।

এই যাতায়াতের পথে কখনো কলেজের গেটে, কখনো পার্কের সামনে ফুটপাথে অথবা কখনো হাজরার মোড়ে বান্ধবী বেষ্টিতা মনোরমার সঙ্গে ক্ষণিক দৃষ্টিবিনিময় হত তার। এক আধ দিন সন্ধ্যাবেলায় বা বিকেলের দিকেও দেখা হত। দুজনেরই অভ্যেস ছিল হাজরার মোড়ে ফুটপাথের উপর নীলকণ্ঠের পত্রিকার দোকানে নানা পত্রপত্রিকার পাতা ওলটানো। তখন কদাচিৎ দু একটা কথাও হয়েছে।

এই সময়েই আত্মারামের দু একটা কবিতা এদিকে ওদিকে দু একটা কাগজে কষ্টেসৃষ্টে বার হচ্ছে। যে সব কাগজে সে কবিতা পাঠিয়েছে, ভয়ে ভয়ে সে সব কাগজ খুলে দেখত তার মধ্যে তার নিজের কোনো কবিতা বেরিয়েছে কিনা। এই রকম এক পড়ন্ত বিকেল বেলায়, তখন যতীন দাস পার্কের পশ্চিম থেকে ঈষৎ রক্তিম রোদ হাজরা মোড়ের ধূলিমলিন, চটাওঠা পেভমেণ্টের উপর এসে পড়েছে, কোনাকুনি পার্কের বুড়ো নিমগাছের ডালে অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষীণ সাদা ফুল হাওয়ায় মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে, কম্পিত বক্ষে আত্মারাম কৃত্তিবাস পত্রিকা খুলে দেখল সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় নিচের দিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা দীর্ঘ কবিতার নিচে তার খুব ছোটো একটা কবিতা ছাপা হয়েছে।

আত্মারামের বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠল এবং সেই মুহূর্তে সে লক্ষ করল তারই পাশে মনোরমা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সস্তা ছাপা নীল ফুল শাড়িতে বিকেলের কনে দেখানো আলোয় মনোরমাকে অতুলনীয়া মনে হচ্ছে।

আত্মারামকে একটু লাজুক স্বভাবেরই বলা চলে, কিন্তু আজ যেন কী হল হঠাৎ, খুব দামি দুটো টাকা দিয়ে নীলকণ্ঠের কাছ থেকে কৃত্তিবাস কাগজটা কিনে ফেলল, তারপর মনোরমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে একটু আসবে তোমাকে একটা জিনিস দেখাব?'

আত্মারামের ভয় ছিল মনোরমা হয়তো আপত্তি করবে, সে কিন্তু কোনোরকম ইতস্তত না করে বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

আত্মারাম বলল, 'সামনের পার্কটায় বড়ো ভিড়। চলো কালীঘাট পার্কে যাই।' কালীঘাট পার্কের এক পাশে একটা বেঞ্চিতে মনোরমার থেকে বেশ একটু তফাতে বসে কৃত্তিবাস কাগজের সাতচল্লিশের পৃষ্ঠাটা খুলে সেই ছোটো কয়েক লাইন কবিতাটা বার করে মনোরমাকে দেখাল, 'এই দেখ এই কবিতাটা আমি লিখেছি।'

তখনো রৌদ্রের শেষ আভা নীল আকাশের গায়ে মেঘে মেঘে লেগে রয়েছে। সেই আলোয় একবার পত্রিকার পৃষ্ঠার দিকে, আরেকবার আত্মারামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মনোরমা, অবাক হয়ে যাওয়া গলায় সে কোনো রকমে বলল,

'সত্যি!' তারপর আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগে খুব নরম করে নিজের মনে মনে দুবার, তিনবার, চারবার পড়ল।

তুমি থেকো

আত্মারাম ভট্টাচার্য

রাস্তা দিয়ে যাব
অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হবে না
এমন যেন কোনোদিনও কখনো না হয়।
যে রাস্তা দিয়েই যাই
তুমি সেখানেই থেকো।

ঐ পৃষ্ঠার একটু ওপরে চোখ পড়তেই মনোরমা দেখল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার শেষ পংক্তি জ্বলজ্বল করছে।

মুঠো ভরা রঙ বেরঙের টিকিট
ঘাঁটলে কী একটাও সাচ্চা বেরোবে না।

দেখতে দেখতে ছায়া আর অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কালীঘাট পার্কে লতাপাতার আড়ালে ইলেকট্রিকের আলো, আর সতীশ মুখার্জি রোডের রাস্তায় সদ্য বসানো নিয়নের নীল রশ্মি মায়াজাল রচনা করল মর-পৃথিবীর এক প্রান্তে।

অনেকক্ষণ পরে আত্মারাম বলল, 'জানো, আমার কবিতাটা কিন্তু অনেক বড়ো ছিল। প্রায় সবটাই কেটে দিয়ে শুধু শেষের প্যারাটা ছেপেছে।'

মনোরমা একটু থেমে থেকে কী যেন একটু চিন্তা করে বলল, 'কবিতাটা পড়ে কিন্তু সেটা কেউই ধরতে পারবে না।' বলে আত্মারামের মুখের দিকে তাকাল, কথাটায় আত্মারাম সুখী হল না দুঃখিত হল, সেটা বুঝতে পারল না মনোরমা।

॥ চার ॥
সরকারমশাই ও হারু

—উঠতে পারিত যদি সহসা, প্রকাশি সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় তাহলে তাদের মনে সেই এক বিদীর্ণ বিস্ময় জন্ম নিত;

—জীবনানন্দ দাশ, সেই সব শেয়ালেরা।

বৈশাখ মাসের সন্ধেবেলা। আকাশ ঘনকালো হয়ে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আসছে। কালীঘাটের মোড়ের দিক থেকে হালদার পাড়ার মধ্য দিয়ে নরহরি সরকার কালীঘাট বাজারের সামনে তাঁর বাসা বাড়িতে দ্রুত পা চালিয়ে ফিরছিলেন।

ঝোড়ো বাতাস কিছুক্ষণ ধরে চলছিল কিন্তু হঠাৎ বাতাস কমে গিয়ে প্রবল বেগে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির প্রচণ্ড তোড় তার উপরে নরহরি সরকার তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না, তাঁর বাঁ পায়ে একটা পুরোনো ব্যথার টান আছে।

নরহরি সরকারকে এ পাড়ার প্রায় সকলেই সরকারমশায় বলে। ভদ্রলোক কালীঘাটের পুরোনো লোক নন, বাড়ি পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে, কলকাতায় ওয়ালেস কোম্পানির অফিসে কেরানির কাজ করেন। আজ প্রায় পঁচিশ বছর কালীঘাটের এই অঞ্চলে সরকারমশায় বাসাভাড়া করে আছেন। নিরীহ গোবেচারা মানুষ, বিদেশি লোক বলে পাড়া প্রতিবেশী সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রেখে চলেন।

সেটা উনিশশো বারো সাল। সাধারণত সব অফিসযাত্রী-ই হাতে একটা ছাতা নিয়ে বেরোত। সরকার মশায়ের হাতেও একটা ছাতা ছিল। জোর হাওয়ার জন্যে তিনি প্রথমে ছাতাটা খুলতে খুব একটা ভরসা পান নি। কিন্তু হাওয়া কমে যখন বৃষ্টি নেমে এল সরকার মশায় ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে এগোতে লাগলেন।

গলির মোড়ের ভট্টাচার্যদের বাড়ির ওখানটায় গ্যাসের বাতিটা গত পরশুদিন থেকে জ্বলছে না। দিনকে দিন কী হাল হচ্ছে কলকাতার। চারদিকে সবরকম কাজকর্মে ঢিল পড়ছে। কর্পোরেশন তো খুবই ফাঁকিবাজ হয়ে পড়েছে। এই বৃষ্টির মধ্যে ও জায়গাটা আবার ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভট্টাচার্য বাড়ির বাইরের রোয়াকে আগে হই হুল্লোড়, কথাবার্তা হত। কিন্তু মোহনবাগানের ফাইনাল জেতার দিন রাতে হঠাৎ ওদের ছেলেটা গলায় ভাত আটকে মরে গিয়ে বাড়িটা কেমন নিঝুম হয়ে গেছে।

ভট্টাচার্য বাড়ির ঠিক সামনে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল সরকারমশায়ের। সেই ছেলেটা যার নাম ছিল হারু, সেই হারু নাকি ভূত হয়েছে। এখনো তাকে নাকি খেতে দিতে হয়, সে দু-একটা টুকটাক গোলমাল যে করে না, তাও নয়। তবে ঠিক দাঁত খিঁচোনো, নাকি কাঁদুনে, ভয় দেখানো ভূত সে নয়। সরকারমশায় সেটা শুনেছেন।

এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। অন্ধকারের মধ্যে কিছু বোঝা গেলো না ব্যাপারটা কী হল, হঠাৎ সরকারমশায়ের হাত থেকে এক ঝটকায় কে যেন ছাতাটা কেড়ে নিয়ে ভট্টাচার্য বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেও সরকারমশায় ঠাহর করতে পারলেন ভট্টাচার্য বাড়ির সদর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু যতদূর মনে হল ছাতাটা নিয়ে কে যেন ওই দরজার মধ্যে দিয়েই দৌড়ে ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

সরকারমশায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভট্টাচার্য বাড়ির বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে। এই সময় কেমন একটা হিমঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল তার গায়ে। একটু শিউরে উঠে

থমকে দাঁড়ালেন। এ নিশ্চয়ই হারুর কাণ্ড। ওই ছোকরাই তার ছাতাটা কেড়ে নিয়েছে। অল্প বয়সে ছেলেটা একটু বখা ছিল, সরকারমশায়ের এক ভাগ্নে দেশ থেকে তাঁর কাছে এসে থাকত কলকাতায় পড়াশুনা করার জন্যে, তাঁর সেই ভাগ্নে শ্যামলাল এই হারুর সঙ্গে এককাসে চেতলা ইস্কুলে পড়েছে। সেই সময়ে তিনি এই হারুকে আর শ্যামলালকে দেখেছিলেন কালীঘাটের খালের সিঁড়ির সবচেয়ে নিচুধাপে বসে দুই বন্ধুতে মিলে কী একটা বিড়ি না বার্ডসাই মৌজ করে ফুঁকছে। খুব রাগ হয়েছিল সরকারমশায়ের। মা মরা ছেলে শ্যামলাল, তাকে তার বাবা, সরকারমশায়ের ভগ্নীপতি; সেই পাবনা থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন মামার কাছে লেখাপড়া শেখার জন্যে, সেই ছোকরা কিনা খালপারে ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে বসে নেশাভাঙ করছে!

সরকারমশায় ভাগ্নেকে যথেচ্ছ গালগাল করলেন, অবশেষে হারুকেও ধমকালেন, 'তুমি অতি বখা ছেলে, তুমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা করবে না।'

সরকারমশায়ের শাসানির জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক শ্যামলাল কিন্তু একবারেই এণ্ট্রান্স পাস করতে পেরেছিল, সে জায়গায় হারু দুবার ফেল করল।

তা যাই হোক, এই মুহূর্তে যে হারু সেদিনের শাসানির প্রতিবাদে আজ এতকাল পরে ছাতাটি কেড়ে নিয়ে শিক্ষা দিল সেটা বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না সরকারমশায়ের। হিম হাওয়ার এবং শীতল বৃষ্টির আকস্মিক শিহরণের সঙ্গে জড়িত একটা অমানুষিক ভয় দেখা দিল তাঁর মনের মধ্যে।

দশ আনা দামের একটা ছাতার জন্যে শেষে বিপদে পড়ব নাকি। হারু পাড়ার ছেলে বা ভাগ্নের সহপাঠী হলেও ভূত তো। সামনে একটা বড়ো তেঁতুলগাছ; আর একটু এগিয়ে গেলে মহাকালী পাঠশালার সামনে দু-একটা দোকানপাট, আলো-টালো আছে। তাছাড়া এই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে আশেপাশে একটি লোকজন চোখে পড়ছে না। খোঁড়া পা নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত সরকারমশায় যথাসাধ্য জোরে হেঁটে সামনের তেঁতুলতলাটা পার হয়ে গেলেন। তাঁর বারবার ভয় হচ্ছিল হয়তো পিছন থেকে এসে হারু ছাতাটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারবে।

তেঁতুলতলা পেরোতেই বৃষ্টির ঝাপটা অনেকটা কমে এল, গ্রীষ্মের সায়াহ্নের ঝড়বৃষ্টি যেমন তাড়াতাড়ি আসে তেমনি তাড়াতাড়ি চলে যায়। বৃষ্টি কমেছে। এ দিকটায় রাস্তায় দোকানপাট লোকজনও দেখা যাচ্ছে।

সরকারমশায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করলেন। তিনি ভিতু বা সংস্কারগ্রস্ত লোক নন। বড়ো সাহেব কোম্পানির ছোটো বাবু। জীবনে অনেক দেখেছেন, শুনেছেন। ভূত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ভয়টা কেন যেন আছে। এই তো এখনো বুকটা দুরদুর করছে। মনে পড়লে, কিংবা খেয়াল থাকলে হয়তো রামনামও জপ করতেন।

বাসায় পৌঁছাতে সরকারমশায়ের গৃহিণী অবাক হয়ে গেলেন, 'বৃষ্টিতে ভিজে একদম চুরচুর হয়ে গেছেন? কোথাও একটু দাঁড়াতে পারতেন।' তারপর একটু লক্ষ করে বললেন,'এ কি আপনার ছাতা কি হল? ছাতাটা হারিয়ে এলেন নাকি?'

সরকারমশায় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন,'আগে একটা গামছা দাও বলছি।' গামছা দিয়ে মুছে, হাত পা ধুয়ে শুকনো কাপড় পরে, খাটের উপর বসে একটা কাঁসার বাটিতে নারকেলের নাড়ু দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে গৃহিণীকে সরকারমশায় বললেন, 'হারুদের বাড়ির সামনে, ওই তেঁতুলতলাটার একটু আগে, হারু বোধহয় ছাতাটা কেড়ে নিয়ে গেল।'

হারুর মৃত্যুর পরের আচার আচরণ ইতিমধ্যে পাড়ার লোকেরা কেউ কেউ জেনেছে। সরকার গৃহিণীও জেনেছেন। এইতো সেদিন রাতে মুখুজ্যেদের বাড়ির হেঁসেলে ঢুকে শিলনোড়াটা যে হারুই ভেঙেছে সে বিষয়ে মুখুজ্যেদের বাড়ির ঠিকে চাকরানি কাত্যায়নী তাকে বলেছে। যদিও মুখুজ্যে গিন্নি বলেছেন কাত্যায়নীই আগের দিন ভেঙে জোড়া দিয়ে রেখে গিয়েছিল। কাত্যায়নী দিব্যি দিয়ে বলেছে সে করেনি, সে আরো বলেছে, এটা হারুর কাণ্ড। হারু ছাড়া এ কাজ কে করবে। অত শক্ত একটা নোড়া কে ভাঙতে পারবে, সাধারণ মানুষের গায়ের জোরে হবে না। হারুর ছাতাকাড়া শুনে সরকারগৃহিণী একটুও বিস্মিত হলেন না। শুধু কয়েকবার রাম রাম করে ঠাকুরঘরে ঢুকে একটুকরো তুলসীপাতা এনে স্বামীর কানের পিছনে গুঁজে স্বামীর দুই কানে একশো আটবার রাম-রাম জপ করলেন।

পরের দিন সকালবেলা বাজার যাওয়ার আগে সরকারমশায় একবার ভট্টাচার্য বাড়িতে গেলেন। মহাকালী পাঠশালার সামনে থেকে তেঁতুলতলায় ওপারে ভট্টাচার্যদের পুরোনো দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বৈশাখের সকালের উজ্জ্বল রোদে, রাস্তাঘাট বাড়িঘর উদ্ভাসিত। আগের দিন সন্ধ্যার বৃষ্টিতে ধুয়ে এখন সব ঝকঝক করছে। তেঁতুলগাছের সবুজপাতায় আলোর ঝিকিমিকি, দু-একটা টিয়াপাখি উড়ে উড়ে ডাকছে।

সরকারমশায় অবাক হয়ে গেলেন কাল রাতে এখানেই এত ভয় পেয়েছিলেন। সত্যি, সময় ভেদে কত রকম কী হতে পারে একই জায়গায়। একই মানুষের।

ভট্টাচার্য বাড়ির সদর দরজা খোলা। চেনা শোনা বাড়ি, অনেকদিন এ পাড়ায় বাস হয়ে গেল তাঁর। একটা গলাখাঁকারি দিয়ে উঠোন দিয়ে ঢুকে পড়লেন। সামনের বারান্দায় হারুর বিধবা মা, ভট্টাচার্য বাড়ির বুড়ি গিন্নি বড়ো বৌকে রান্নার চাল একটা তামার বাটি দিয়ে মেপে দিচ্ছেন। সরকারমশায়কে দেখে দুজনেই তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানলেন।

সরকারমশায় একটু অপ্রস্তুত হলেন এত সকালে হুট করে গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে

ঢুকে পড়া উচিত হয় নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর চোখে পড়ল উঠোনের একপাশে বারান্দার গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে তাঁর কালকে রাতের ছাতাটি।

সরকারমশায় মাঝে মাঝে ছাতা হারিয়ে ফেলেন বলে তাঁর গিন্নি নীল সুতো দিয়ে ছাতার মধ্যে একটা ফুল তুলে দিয়েছেন যাতে ছাতাটা হারিয়ে গেলে চেনা যায়। সরকারমশায় একটু এগিয়ে যেতেই ছাতাটার ফিতের কাছে সেই নীলফুলটা দেখতে পেলেন। তিনি কোনো ভূমিকা না করেই হারুর মাকে বললেন, 'এই ছাতাটা আমার, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' 'হারুর মা জানালেন, 'কালকে বৃষ্টির পরে দেখি উঠোনে পড়ে আছে। যা হাওয়া দিচ্ছিল, ভাবলাম বুঝি রাস্তার কোনো লোকের হাতের ছাতা বাতাসের দমকায় উড়ে আমাদের পাঁচিল টপকে বাড়ির মধ্যে পড়েছে।'

সরকারমশায় এ নিয়ে আর বিশেষ কথা না বাড়িয়ে ছাতাটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হলেন। বাজারের পথে একটু এগোতেই হারুর বড়দা চারুবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিও বাজার সেরে বাড়ি ফিরছেন।

চারুবাবু সরকারমশায়ের সমবয়সী। দুজনে বেশ বন্ধুত্ব আছে। চারু ভট্টাচার্য ভবানীপুর পোস্ট অফিসে কাজ করেন।

চারুবাবুকে দেখে সরকারমশায় দাঁড়িয়ে গেলেন, 'আপনাদের বাড়ি থেকে ছাতাটা নিয়ে এলাম।' ছাতাটা দেখিয়ে বললেন। দেখা গেল চারুবাবু ব্যাপারটা জানেন, 'ও আপনার ছাতা বুঝি এটা? আপনার হাত থেকে ঝড়ের সময় উড়ে গিয়েছিল বুঝি?'

সরকারমশায় যে কথাটা বলার জন্যে সকালবেলা উঠে ভট্টাচার্য বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কী করে বলবেন তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন। এই মুহূর্তে দুম করে সেটা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি সরাসরি বললেন, 'ঠিক উড়ে গেছে বোধহয় নয়। আমার কেমন যেন ধারণা ঝড়ের সময় হারু এসে আমার হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে আপনাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।'

ভবানীপুর পোস্ট অফিসের দুঁদে সাবপোস্টমাস্টার চারু ভট্টাচার্যমশাই মৃত ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনে খুব বেশি চমকালেন বলে মনে হল না। আসলে তাঁর এরকম শোনা অভ্যেস হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে হারুর অলৌকিক উৎপাত সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তাঁর ধারণা এ সবই বাজে গুজব, কিছুটা রটেছে মাতৃদেবীর জন্যে, কেন যে হারুর জন্যে তিনি উঠোনে খাবার রেখে দেন। ছুঁচো, ইঁদুর কিংবা বেড়ালে খেয়ে নেয়। মা ভাবেন হারু খেয়েছে।

চারুবাবু একবার ভাবলেন, সরকারমশায়ের ভুল হয়েছে। ঝড়েই উড়ে গেছে

ছাতাটা। তারপর ভাবলেন নরহরি সরকার তো গেঁজেল শিবকালী পাল নয়, তাঁর কথাটা খেলো হতে পারে না। তাছাড়া আরো দশজন হারুর ব্যাপারে দশরকম কথা বলছে, সেটাও তাঁর কানে আসছে। তিনি বিষয়টাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না, শুধু একটু চুপ করে শুনে সরকারমশায়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'কি করা যায় হারুকে নিয়ে বলুনতো নরহরিবাবু?'

এ সম্পর্কে কোনো সহজ সমাধান সত্যিই জানা নেই সরকারমশায়ের। তবে হারু যখন ভট্টাচার্য বাড়ির ভূত, হারুকে সামলানোর দায়িত্বও অবশ্যই তাদেরই। সে যা হোক, এরকম ক্ষেত্রে অন্যেরা যে রকম বলে সরকারমশায় তাই পরামর্শ দিলেন,'হারুর একটা পিণ্ড দিয়ে আসুন না গয়া গিয়ে। ওর আত্মাটার একটু বিশ্রাম তো দরকার। এত ছটফট করে ওর নিজের আত্মাটাই কষ্ট পাচ্ছে।'

চারুবাবু বললেন,'এক বছরতো এখনো পূর্ণ হয় নি। ভাবছি এবারকার মহালয়ায় গয়া গিয়ে হারুর একটা শান্তির ব্যবস্থা করব।' তারপর একটু ইতস্তত করে সরকারমশায়কে বন্ধু বিবেচনা করেই বললেন, 'তবে কথাটা বেশি উচ্চবাচ্য করবেন না। মার কানে যেন না যায়।'

কিছুটা বিস্মিত হলেন নরহরি সরকার। 'কেন? আপনার মা আপত্তি করবে নাকি?'

চারুবাবু মাথা নেড়ে জানালেন, 'মা অবশ্যই আপত্তি করবেন। কোলের ছেলে মরে গেছে, সব শোক সহ্য করে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মরে গেলেও আছে, চোখে দেখতে পারছে না কিন্তু মা বুঝতে পারছেন আছে। এটাই মার কাছে খুব বড় সান্ত্বনা। গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিলে তো হারু একদম হাওয়া হয়ে যাবে। মা এই বয়সে কি সেটা সহ্য করতে পারবেন?'

সমস্যাটার এই জটিল দিকটা সরকারমশায় ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি। শুধু সরকারমশায় কেন, হারুর ভৌতিকত্ব নিয়ে গত কয়েকমাস এ পাড়ায় যারা মাথা ঘামিয়েছে তারাও এ দিকটা ভেবে দেখেনি।

মায়ের স্নেহ উপেক্ষা করার জিনিস নয়। কিন্তু হারু আর হারুর ভূত কী এক হল। তাছাড়া সবচেয়ে বড়োকথা একটা জলজ্যান্ত ভূতের সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে পাড়ার মধ্যে বসবাস করা; অবশ্য স্বীকার করা উচিত হারু এখন পর্যন্ত তেমন কিছু অঘটন ঘটায় নি কিন্তু হাজার হলেও ভূত তো, তার কখন কী মতিগতি হবে, তার কী কিছু ঠিক আছে।

আকাশপাতাল নানারকম চিন্তা করতে করতে সরকারমশায় চারুবাবুকে ছেড়ে বাজারের দিকে এগোলেন। চারুবাবুও দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

এরই মধ্যে বৈশাখ মাসের বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে। তেঁতুলতলাটা পেরোতেই

চড়া রোদ। যাক, ছাতাটা ফেরত পাওয়া গেছে! সরকারমশায় ছাতাটা খুলে মাথায় দিতে গেলেন, কিন্তু ছাতাটা খুলল না।

ব্যাপারটা সরকারমশায়ের কেমন খটকা লাগল। ভূতের কেড়ে নেওয়া ছাতা সেটা আর ব্যবহার করা উচিত হবে। কিন্তু হারু, অশরীরী হারু তারই বা ছাতার দরকারটা কী, তার কী রোদ-বৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হয়, সেই বা শুধু শুধু ছাতাটা কাড়তে গেল কেন?

এই সব ভাবছেন অথচ মনের মধ্যে ভূতের ব্যাপারটার বিশেষ সায় মিলছে না। সে যা হোক, সরকারমশায় ঠিক করলেন, কালীবাড়ি থেকে শান্তিজল আর প্রসাদী ফুল নিয়ে এসে ছাতাটার ওপর ভালো করে ছিটিয়ে শোধন করে নিয়ে ব্যবহার করাই ঠিক। যদিও বিশ্বাস খুব একটা করেন না, তবু, সরকারমশায় ভাবলেন, আমি সংসারী মানুষ, কখন কিসে কী হয় কে জানে।

দুঃখের বিষয় কালীঘাটের ফুল-জল দিয়ে শোধন করে, এমন কী তুলসীপাতা ছিটিয়েও বন্ধ ছাতাটা খুলল না। অবশ্য ছাতাটার বাঁশের হাতলের মুখে একশো আটবার রাম নাম জপ করলেন সরকার গৃহিণী।

কিন্তু তাতেও ছাতা খোলা গেল না। নট নড়ন চড়ন নট ফট।

অবশেষে কালীঘাট বাজারের সামনে বসে যে মুসলমান মিস্ত্রি তাকে দিলে সে খুলে দিল। সে বলল, 'কলটা আটকে গিয়েছিল। একদম মুচড়ে গেছে: পালটিয়ে নতুন কল নিতে হবে।'

সরকারমশায় আর কল পাল্টালেন না। প্রায় নতুন ছাতাটা প্রায় বিনা পয়সায় বেচে দিলেন ছাতার মিস্ত্রিটার কাছে, তাকে বললেন 'এটা তুমি নিয়ে আমাকে যা হয় দাম দাও, আমি একটা নতুন ছাতা কিনে নেব।'

॥ পাঁচ ॥
আবার হারু

> But the play being acted is not mine.
> For this once let me go
> But the order of the acts is planned
> The end of the road already revealed.
>
> —Boris Pasternak, Hamlet.

হিসেবমতো এবার আমাদের উনিশশো চুরাশি সালে এবং আত্মারামের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু হারু ওরফে কাকাবাবুকে এই মুহূর্তে ছেড়ে আসা উচিত

হবে না। তবে হারুর ভৌতিক জীবনে সত্তর বছরের দীর্ঘ কাহিনী লিখবার ইচ্ছা বা অবকাশ আমার নেই।

আর শেষ পর্যন্ত এমন কিই বা লিখবার আছে? হারুর ব্যাপার স্যাপার তেমন কিছু মজার বা গোলমেলে নয়, আর দশটা পাড়া বেপাড়ার ভূত যেমন হয় হারুও সেই রকমই।

কিন্তু হারুর একটা বদ দোষ দেখা দিয়েছিল, যেটা নিয়ে অল্পবিস্তর আপত্তি-গোলমাল পাড়ার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

উনিশ বছর বয়েসের সদা যুবক খেলার মাঠে ফূর্তি করে এসে দুম করে মারা গিয়েছিল। জীবনে তার অনেক দেখার বাকি ছিল মৃত্যুর পরে হারুর স্বভাবে একটা বড় উশখুশ ভাব দেখা দিল। রাতে বিরেতে এর ওর বাড়ির জানালা দিয়ে, দরজার ফাঁক দিয়ে, কখনো ভেন্টিলেটারের ঘুপচি দিয়ে গৃহস্থের ঘরের মধ্যে উঁকি দিত সে।

হারুর অত্যাচারে পাড়ার লোকেদের প্রাইভেসি বলতে আর কিছু থাকল না। যদিও ব্যাপারটা হারু নিশ্চয়ই সরলভাবেই করে যাচ্ছিল। কিন্তু হারুর এই অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে ধীরে ধীরে পাড়ার লোকেরা মুখর হয়ে উঠল।

শিবকালী গেঁজেল অথবা সরকারমশায়ের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পাশ কাটিয়ে গেলেও পাড়ার লোকেরা যখন অনবরত, প্রায় প্রতিদিনই বলা চলে, ভট্টাচার্য-বাড়িতে এসে হারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল, ভট্টাচার্য-বাড়ির লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গয়ায় গিয়ে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদান করে আসব এধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিবেশীদের শান্ত রাখা গেল না। পরশুদিন কাদের কলতলায় নতুন বউ গা ধুচ্ছিল সন্ধ্যার পরে সেখানে নাকি হারু চৌবাচ্চার পিছনে লুকিয়েছিল, নতুন বৌয়ের হাত থেকে সাবান কেড়ে নিয়েছিল, হালদারদের বাড়ির নয়মাসের বাচ্চাটাকেও হারু সেদিন রাতে তক্তপোষের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়েছিল।

যেখানে যা হয়, কিছু ধরা বা বোঝা যায় না, হারুর নামে চলতে লাগল। ব্রজেশ্বর মোক্তার রাত্রিবেলা মক্কেলদের সঙ্গে বসে পরদিনের একটা ফৌজদারি মালপত্র নথিপত্র ঘাঁটছিলেন। সেই সমস্ত দরকারি কাগজে কে যেন কালির দোয়াতটা উল্টে দিল। এসব ছাড়া এ বাড়িতে, ওবাড়িতে ছোটোখাটো খাবার দাবার এমনকি মাছ-দুধ নিয়েও হারু নাকি টানাটানি শুরু করে দিল।

এরই মধ্যে জগাই হালদারের বাড়ির বড়ো মেয়েটিকে সন্ধ্যাবেলায় জোরে একটা থাপ্পড় মরল একজন, মেরেই সিঁড়ি দিয়ে চোঁ-চা দৌড়ে ছাদে উঠে গেল। মেয়েটির চেঁচামেচি শুনে সবাই দৌড়ে ছাদে গিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই, সব

হাওয়া। এই ব্যাপারটা যে হারুই করেছে, এ বিষয়েও কারোরই কোনো সন্দেহ রইল না।

কেউ কেউ আবার কোনো কোনো কাণ্ডে হারুর ওপর খুশিই হত, যেন ওই জগাই হালদারের বাড়ির বড়ো মেয়েটিকে মারা, মেয়েটি তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস হয়েছে, বাপ এখনো বিয়ে দিচ্ছে না। একটু বেলেল্লা ভাব দেখা যাচ্ছিল স্বভাবচরিত্রে, হারুর থাপ্পড়টা এক্ষেত্রে কারো ব'রো পছন্দই হয়েছিল।

কিন্তু তা হলেও পাড়াপ্রতিবেশীদের নানাধরনের অভিযোগ ও চাপে পড়ে হারুর বড়দা চারু ভট্টাচার্য মশায় পরের বছর কালিপুজোর সময় মেজো ভাই নারুকে সঙ্গে নিয়ে গয়ায় গিয়ে হারুর পারলৌকিক মুক্তির জন্যে যা কিছু করণীয় সম্ভব করে এলেন।

হারুর অত্যাচার এতে কমল কিনা, সত্যিই হারু আগে অত্যাচার করত কিনা, নাকি হারুর মার কথাবার্তা শুনে পাড়ার লোকে তার মৃত আত্মাকে কাল্পনিক প্রেতত্ব দান করে কিছু কিছু ঘটনার দায় তার উপরে চাপাত, এতদিন পরে সে বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

যেমন ঢিমে তেতালায় চলছিল তেমনই চলতে লাগল কালীঘাট পাড়ার জীবন। দুএকটা জন্ম মৃত্যু, বিয়ের সানাই, কোনো দিন মধ্যরাত্রে মাতালের হল্লা, দুই গলির ছেলেদের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি, দিন কেটে যেতে লাগল। মহালয়ায়, কালীপুজোয়, পয়লা বৈশাখে কালীমন্দিরে ভিড়, রথের মেলা দুর্গাপুজো। দিন কেটে যেতে লাগল। কলকাতা শহর একটু একটু করে ঢুকে যেতে লাগল কালীঘাটের মধ্যে। কালীঘাট একটু একটু করে ঢুকে যেতে লাগল কলকাতা শহরের মধ্যে। দিন কেটে যেতে লাগল।

বছর তিনেকের মাথায় হারুর মা মারা গেলেন। সে বছরই প্রথম মহাযুদ্ধ লাগল ইউরোপে। এত দূরে কলকাতা শহরেও সাজোসাজো রব। জিনিস-পত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। পাড়ার বখা ছেলেরা বাঙালি পল্টনে নাম লেখাবে বলে কেল্লার সামনে গিয়ে লাইন দিল। হারু বেঁচে থাকলে হয়তো যেত।

হারুর মা মরে যেতে হারুর কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রায় সবাই ভুলেই গেল। যে হারুর অত্যাচারে পাড়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখন আর বিশেষ কেউ তাকে মনে করে না। তবে একটা কথা লোকমুখে ছড়িয়ে আছে যে ভট্টাচার্য বাড়িতে একটা পোষা ভূত আছে। সেই ভূতটা যে সেই বাড়িরই অকালমৃত ছোটো ছেলে, যার নাম ছিল হারু, সেটা বেশিদিন লোকে মনে রাখল না। বছর আট দশেকের মাথায় হারুর পরিচয় এসে দাঁড়াল জনৈক নির্বিবাদী ভূত হিসেবে। তখন আর

লোকের দুধ মাছ চুরি গেলে, বাথরুমে নতুন বউয়ের হাত থেকে সাবান পিছলে চৌবাচ্চায় পড়ে গেলে বা শিলনোড়া ভেঙে গেলে হারুর ওপর দায়িত্ব চাপাত না।

হারুর অস্তিত্ব প্রায় সর্বত্র বিলোপ হয়ে এসেছিল। শুধু দু-এক জন পুরোনো সঙ্গী আর প্রতিবেশী হারুর কথা সামান্য খেয়াল রেখেছিল। আর একটা ব্যাপার ছিল। হারুর মার মৃত্যুর বছর দুয়েকের মাথাতেই চারুবাবুও মারা গেলেন। তিনি মৃত ছোটো ভাইয়ের প্রতি মমতাবশতই হোক বা অন্য কারণেই হোক বেলতলাটা লাল সিমেন্টে বাঁধিয়ে তার-মধ্যে একটা ছোটো মতো বাটির আকারে গর্ত করে দিয়েছিলেন হারুর খাবার দেওয়ার জন্যে। সন্ধ্যাবেলা এক চামচে দুধ হোক, এক টুকরো মাছ-হোক বাটির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হত। ওতেই হারুর হয়ে যেত।

অবশ্য হারুর মা এবং তারপরে চারুবাবু মারা যাওয়ার পরে হারু নামটার আর কোনো মানে রইল না। চারুবাবুর ছেলেমেয়েরা বেলতলায় খাবারের বাটিটাকে বলত কাকাবাবুর বাটি। সন্ধ্যাবেলা ভট্টাচার্য-বাড়ির একতলার হেঁসেলের থেকে গিন্নি বা বউ বলত, 'এই যা কাকাবাবুর খাবার দিয়ে আয়।' সেই শুরু, সেই থেকে হারু পুরুষানুক্রমে ভট্টাচার্য-বাড়ির কাকাবাবু হয়ে গেল। ছোট বড়ো সকলেরই, সব বয়েসের সব সম্পর্কের মেয়ে পুরুষের কাকাবাবু।

ধীরে ধীরে লোকেরা ভুলে গেল কাকাবাবুর পরিচয়। শুধু বাড়ির সবাই জানত এই বংশের এক পূর্বপুরুষ ভূত হয়ে বেঁচে রয়েছে এই বাড়িতেই। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণের দায়িত্ব ভট্টাচার্য বাড়ির লোকদের।

দিন কেটে যেতে লাগল। কালীঘাটের দক্ষিণপূর্বে টালিগঞ্জ থেকে মনোহরপুকুরের মধ্যে গড়ে উঠল ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন শহর বালিগঞ্জ। অনেক লোক সেখানে সস্তায় জমি কিনে পাড়া ছেড়ে উঠে গেল। এদিকে পুরোনো বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে। তারই উঠোনের পাশে উঠছে নতুন দালান। তবে এ পাড়ায়, সেরকম বাড়ির সংখ্যা খুব কম। কালীঘাটের নতুনকালের বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি ছড়িয়ে পড়ল বালিগঞ্জের দিকে। শুধু কিছু পুরোনো ভিটেমাটি জড়িয়ে থাকা লোক আর অজস্র অল্প আয়ের মানুষে ভরে গেল পাড়া।

এপাশে ওপাশে দু-চারটে খানাখন্দ আর ডোবামতোন ছিল, এই সেদিনও পাড়ার বউ-ঝিরা সেখানে বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে যেত। বর্ষাকালে ভরাডোবায় হয়তো দুএকটা ডুব দিয়ে স্নান সেরেও নিত। সেসব কবে কেমন করে বুজে গেল। উঠতে থাকল দুএকটা ছোটোখাটো বাড়ি। পুরোনো বড় বাড়িগুলোর এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটোনো খালিঘরগুলো ক্রমশ ভরে উঠল পরবর্তী বংশধরদের দ্বারা আর নতুন ভাড়াটেতে।

এরই মধ্যে ছিটিয়ে ছিটকিয়ে দুচারজন পুরোনো আমলের লোকও রয়ে গেল।

চেতলা হাটের গামছার দোকানদার কাকাবাবুর ইস্কুলের ক্লাস ফ্রেণ্ড গেঁজেল শিবকালী, কিসে কী হয়, থিয়েটারের কমিক পার্টে দারুণ নাম হল তার। অনেক পরে সিনেমাতেও তার খ্যাতি হয়। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের প্রথম যুগে শিবকালীর হাসির রেকর্ড, 'হারু কী চায়' লোকের ঘরে ঘরে বেজেছে, আনন্দ দিয়েছে। একটা মানুষ মরে গিয়েও আছে, খেতে পারছে না খাচ্ছে, দেখতে পারছে না দেখছে। হারু নামে এক বাল্যবন্ধুর বেঁচে না থেকে বেঁচে থাকার হাস্যকর প্রয়াস, চেতলাহাটের সেই গামছাওলা শিবকালী তার গেঁজেল আনুনাসিক কণ্ঠে হারুর মৃত্যুর বহু বছর পরে বাল্যবন্ধুর প্রেতাত্মাকে সে অমর করে দিয়ে গেল।

তারও আগের কথা। সেটা উনিশশো একুশ সাল। সেটা অসহযোগের বছর। নরহরি সরকারমশায় সাহেব কোম্পানির দাসত্বের চাকরি ছেড়ে, কালীঘাটের ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে সংসারের সবাইকে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গেলেন পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার এক গ্রামে। বঙ্গভঙ্গের আগের বছরে উনিশশো চার সালে তিনি এ পাড়ায় ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন। যদিও তাঁর দেশজ উচ্চারণভঙ্গি চিরদিনই তাঁর মেলামেশার একটা অন্তরায় হয়ে ছিল, তিনি নানাভাবে এ পাড়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

দেশে ফিরে যাওয়ার পরে, প্রায় পনেরো বছর পরে, আরেকবার এসেছিলেন সরকারমশায়। তখন বয়স হয়েছিল তাঁর। সস্ত্রীক কালীঘাট তীর্থ করতে এসেছিলেন। অনেক পালটে গেছে তখন সবকিছু। কালীঘাট পেরিয়ে বালিগঞ্জের নতুন রাস্তায় ট্রাম চলছে। ওপাশে ঝকঝকে নতুন নতুন বাড়ি। পুরোনো কালীঘাটের মতো ঘিঞ্জি নয়, খোলামেলা। ছাদ খোলা ডবল ডেকার বাস হু হু করে বাতাস কেটে যাতায়াত করছে শ্যামবাজার কালীঘাটের মধ্যে।

শুধু কালীঘাটের পুরনো পাড়াটাই তেমন কিছু বদলায় নি। একটা নতুন সিনেমা হল উঠেছে বড়ো রাস্তায়। তারই পাশে তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভায়রাভাইয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন সরকারমশায়। সেখান থেকেই একদিন সকালে পুরোনো পাড়ায় তিনি এলেন। দুচারজন চেনা লোক এখনো আছে। তবে কলকাতার মধ্যে এখন কালীঘাট পুরোপুরি ঢুকে গেছে, কলকাতায় মানুষদের মতোই এখানকার মানুষেরাও খুব ব্যস্ত।

দুচারটে খুব পুরোনো বাড়ি প্রায় ধসে পড়েছে বর্তমান বংশধরদের সেসব বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা নেই। এরই মধ্যে এর উঠোনের পাশে, ও বাড়ির পিছনের খিড়কির ফাঁকা চিলতে জায়গায় ছোটোখাটো নতুন একতলা-দোতলা বাড়িও উঠেছে অনেক। ভট্টাচার্য বাড়ির সামনে এসে সরকারমশায় প্রায় চিনতেই পারলেন না। সামনের রোয়াকটা আর একতালা বাইরের ঘরটা নেই। সেখানে

একটা নতুন বাড়ি প্রায় তৈরি শেষ। বাড়িটার সদরে মার্বেল পাথরে ফলক লাগানো 'মিত্রভবন।' তার মানে এ অংশটা ভট্টাচার্যরা বেচে দিয়েছে। হয়তো পিছনের দিকের অংশে এখনো ওরা আছে।

বাঁ পাশের পুরোনো প্যাসেজ দিয়ে ভট্টাচার্য-বাড়ির ভিতরে একটু খোঁজ নিতে গেলেন সরকারমশায়। অনেকদিনের পুরনো চেনা পরিবার, কলকাতায় এসেছেন এতকাল পরে, দেখা করে একটু খোঁজখবর নেওয়া তো উচিত। প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সরকারমশায়ের হঠাৎ মনে পড়ল অনেকদিন আগে এই পথ দিয়েই এ বাড়িতে ঢুকে হারুর কেড়ে নিয়ে যাওয়া ছাতাটা ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিনও ছিল এমনি এক বৈশাখ মাসের সকালবেলা। এই রকমই গনগনে রোদ উঠেছিল সেই সকালে। এবং তখুনি সরকার মশায়ের মনে পড়ল গতকাল বিকেলের শেষাশেষি সত্যিই খুব কালবোশেখি ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিল।

অনেকরকম ভাবতে ভাবতে ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনের মধ্যে ঢুকে গেলেন সরকারমশায়। এ পাড়ার পুরোনো লোক তিনি, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চিনবে। উঠোন দিয়ে একতলার বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হল সরকারমশায়ের। তারপর খেয়াল হল উঠোনের ঠিক মাঝখানে যে বেলগাছটা বহুকাল ছিল সেটা আর নেই। বারান্দার মেঝে চারদিকের দেয়াল অনেক চটে গেছে। বিবর্ণ, পুরোনো হয়ে গেছে বহুদিনের জীর্ণ কাঠের দরজা-জানালা।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। বাড়ির মধ্যে লোকজন কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না! এই সময় হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে কে যেন নেমে এল।

দিনের আলোয় স্পষ্ট চোখে ভূত দেখলেন সরকারমশায়, সিঁড়ি দিয়ে হারু নেমে আসছে। অন্তত পনেরো বছর আগে মারা গেছে ছোকরা, কিন্তু মুখ-চোখ, বয়েস-চেহারা সবকিছু মিলিয়ে পলকের মধ্যে বুঝতে পারলেন সরকারমশায়, এ সেই বখা হারু যে খালপাড়ে তাঁর ভাগ্নেকে বিড়ি খাওয়া শেখাচ্ছিল।

নরহরি সরকার স্বদেশী করা, খদ্দর পরা লোক। ভূত দেখে বিশ্বাস করার লোক তিনি নন। কিন্তু ওই দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পনেরো বছর আগের মরে যাওয়া মানুষ, যাকে কেওড়াতলা শ্মশানে নিজের চোখে তিনি পুড়তে দেখেছেন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সরকারমশায়। 'সর্বনাশ! হারু তো আজও ছাড়ে নি।' চকিতে চিন্তা করে সরকারমশায় দ্রুতগতিতে পশ্চাদপসরণ করলেন। হারু তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্যাসেজ পর্যন্ত চলে এসেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে রাস্তায় নেমে ভট্টাচার্য বাড়ির সামনের দিকে একবার মাথা ফিরিয়ে তাকালেন সরকারমশায়।

কী সাংঘাতিক কাণ্ড! কলকাতা শহরে দিনে দিনে কী অবস্থা দাঁড়িয়েছে। একেবারে

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সরকারমশায়ের দিকে। প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাস্তায় ভূত। আর একবার পিছন দিকে তাকালেন সরকারমশায়, ভট্টাচার্যদের বাড়ির বাইরের ফুটপাথে এখন আর কেউ নেই। হারু মিলিয়ে গেছে।

একটু সম্বিত পেতে সরকারমশায়ের খেয়াল হল রোদটা বড় টনটনে আর এ জায়গাটায় রোদটা বড় বেশি মাত্রায় রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সেই মুহূর্তে সরকারমশায় খেয়াল হল, এখানে এই মোড়ের মাথায় সেই বিশাল বহুকালের পুরোনো তেঁতুলগাছটা ছিল, সেটা নেই। কবে ঝড়েটড়ে পড়ে গেছে বোধহয়, না হয় কর্পোরেশনের লোকেরা কেটে ফেলেছে। তাই জায়গাটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পুরো এলাকাটাই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে।

রোদের জন্যে হাতের ছাতাটা খুলে মাথায় দিতে গেলেন সরকারমশায়। কিন্তু ছাতাটা এবারও খুলল না।

'তাহলে, এবারও হয়তো ছাতাটার জন্যেই হারু তাড়া করে এসেছিল, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে এগোতে এগোতে সরকারমশায় ভাবলেন। বড়ো রাস্তায় উঠে আসতেই শুনতে পেলেন, রাস্তার পাশের একটা গ্রামোফোনের দোকানে তখন শিবকালীর কমিক রেকর্ড 'হারু কী চায়' বাজছে। চোঙার চারপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে সেটা শুনে হো হো করে হাসছে।

দেশে থাকতেই সিরাজগঞ্জে এক উকিলবাবুর বাড়িতে সরকারমশায় শিবকালীর রেকর্ডখানা শুনেছিলেন। তাঁর খুব হাসি পায়নি অবশ্য, কাউকে তেমন কিছু বলেন নি। হারুর ব্যাপারটা যে তাঁরও জানা, শিবকালীকেও বেশ চিনতেন, এসব কথা কাউকে বলেন নি।

এখন রাস্তার এই দোকানে লোকদের 'হারু কী চায়' রেকর্ড শুনে এত হাসতে দেখে, সরকার মশায়ের কেমন চিন্তা হল। এরা কী জানে হারু কে, এরা কী জানে হারু এখনো আছে, এদের খুব কাছেই আছে?

॥ ছয় ॥

মনোরমা, মনোরমা

> 'আর যদি নাই আসো। ফুটন্ত জলের নভোচারী
> বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো নাই মেশো
> সেও এক অভিজ্ঞতা,'
>
> —বিনয় মজুমদার, আমার ঈশ্বরী।

আত্মারাম সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক

হয়েছিল। তার উপরে ভার ছিল কিছু প্রাক্তন ছাত্রের লেখা সংগ্রহ করার। বাংলার অধ্যাপক পরমেশবাবু তাকে বলেছিলেন যোগব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগব্রত ওদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র আর তা ছাড়া অন্যান্য পুরোনো ছাত্রদের সঙ্গেও তার খুব মেলামেশা রয়েছে।

অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে বেহালার অভ্যন্তরে এক গভীর গলির মধ্যে একদিন মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে সে যোগব্রত চক্রবর্তীর বাসায় পৌঁছাল। রবিবারের সকাল বেলা, তখন প্রায় সাড়ে দশটা। যোগব্রতর মা রান্নাঘরে কী রান্না করছিলেন। ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই আত্মারাম বলল, 'আমরা যোগব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' যোগব্রতর মা বললেন 'এই তো কয়েকঘণ্টা আগে রাত কাবার করে খোকন বাড়ি ফিরল। এখন তো ঘুমুচ্ছে।'

হঠাৎ এরই মধ্যে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে যোগব্রত সামনের ঘরটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, 'কে রে? কারা খুঁজছিস আমাকে?'

প্রথম দর্শনেই যোগব্রতকে দেখে অভিভূত হয়ে গেল মনোরমা। দেবশিশুর মতো চেহারা, যীশু খ্রিষ্ট যদি বাঙালি হতেন নিশ্চয় এইরকম দেখতে হতেন। একমাথা এলোমেলো চুল, একগাল অবিন্যস্ত দাড়ি, পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, মন্দ্র কণ্ঠ, মায়াময় দৃষ্টি যেন কোনো রোমাণ্টিক উপন্যাস থেকে মলাট ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে; মনোরমা সাবেকি কুলীন কায়স্থ বংশের কন্যা, সুদর্শন পুরুষ সে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক দেখেছে, রাস্তাঘাটে, কলেজেও দেখেছে, তবু যোগব্রতকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হওয়ার পরে যোগব্রত ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই।' আত্মারাম বলল, 'আমরা আশুতোষ কলেজ থেকে এসেছি। বার্ষিক ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা নিতে।' যোগব্রত এবার মনোরমার দিকে তাকিয়ে আত্মারামকে জিজ্ঞাসা করল, 'আশুতোষ কলেজ কি এর মধ্যে কো-এডুকেশন হয়ে গেছে নাকি?'

এই প্রশ্নে আত্মারাম এবং মনোরমা উভয়েই কেমন বিব্রত ও সঙ্কুচিত হল। আত্মারাম একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'না, তা নয়। ও হল মনোরমা মিত্র। ও পড়ে যোগমায়াতে। আর আমার নাম আত্মারাম ভট্টাচার্য আমি আশুতোষ কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক। এক পাড়ার মেয়ে, আপনার কাছে আমার সঙ্গে এমনিই এসেছে। একা যাব, তাই ওকে সঙ্গে করে এলাম।'

যোগব্রত ভ্রূ কোঁচকালো, 'এমনিই এসেছে। সঙ্গে করে এলাম। এগুলো একটা কথা হল। কী দিনকাল পড়েছে বাবা!'

কিছুক্ষণ ধরে অনর্গল কথা হল যোগব্রতর সঙ্গে আত্মারামের। মনোরমা চুপচাপ বসে হাতের কড়ে আঙুলে শাড়ির একটা প্রান্ত একবার করে জড়িয়ে একবার করে খুলে সময় কাটাতে লাগল। কবিতা, সাহিত্য, পত্রিকা, লেখা ছাপা, নানা রকম বিষয় নিয়ে কথার পর যোগব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি থাক কোথায়?' আত্মারাম বাড়ির ঠিকানা বলতে যোগব্রত বলল, 'আরে তাই বলো। তুমি তো তারপদদার বাড়ির উল্টোদিকে থাকো। তারাপদদাকে চেনো?'

আত্মারাম বলল, 'মুখ চিনি। উনি তো এ বাড়িতে শুধু রবিবার থাকেন। সারা সপ্তাহ ধরে বাইরে কোথায় থাকেন। ওঁর দাদা থাকেন এ বাড়িতে। তবে তাঁর মাথা খারাপ।' তারপর একটু ইতস্তত করে আত্মারাম বলল, 'তারাপদদার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা আছে। খুব সাহস হয় নি। জোরে জোরে হাঁটেন, ধমকের গলায় কথা বলেন।' হঠাৎ মনোরমা এর মধ্যে যোগ করল, 'ও পাড়ার লোকেরা ওঁর নাম দিয়েছে ভোম্বল দাস।'

এ কথা শুনে যোগব্রত হো হো করে হাসতে লাগল, 'তারাপদদার নাম দিয়েছে ভোম্বল দাস! তারাপদদা জানে কি?'

অনেক কথাবার্তার পর দু-কাপ চা খেয়ে আত্মারাম আর মনোরমা উঠল, ওঠার সময় যোগব্রত ওদের বলল, 'তোমাদের এক রবিবারে তারাপদদার বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে গেলে শংকরদা, সুনীলদা, শক্তিদা, শরৎদা এদের সঙ্গে আলাপ হবে।'

আত্মারাম বলল, 'শংকরদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। শংকরদার বাড়িতেও গেছি। আমি একদিন রাতে তারাপদদার বাড়ির সামনে শক্তিদার রিক্সাওয়ালার ভাড়া আমি আর আমার এক বন্ধু দিয়ে দিয়েছিলাম।'

সাহিত্যের লাইনে খুব বেশি হাঁটাহাঁটি করা হয় নি শেষ পর্যন্ত। আত্মারাম নিজে থেকে পিছিয়ে গিয়েছিল। দু-চারবার দু-একটা পত্রিকায় কবিতা-টবিতা দিতে গেছে, সুতৃপ্তি রেস্টুরেন্ট বা কফি হাউসেও গিয়েছে কিন্তু নিজেকে সে মেলাতে পারেনি সাহিত্যের আড্ডায়। সবসময়েই নিজেকে কেমন বহিরাগত মনে হয়েছে তার।

কথায় কথায় মনোরমা একবার বলেছিল, 'এই লোকগুলো একটু গোলমেলে। নিজেদের মধ্যে একরকম গলায়, একরকম ভাষায় কথা বলে। আবার বাইরের লোকের সঙ্গে আরেক রকম।' আত্মারাম অবশ্য আপত্তি করেছিল, সবাই তাই। তুমি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, অন্য সকলের সঙ্গে সে ভাবে কথা বলো নাকি?'

আত্মারাম আর মনোরমা টাইগার সিনেমায় সন্ধ্যার শো-তে 'কাম সেপ্টেম্বর'

দেখতে এসে ফিরে যাচ্ছিল। পুরোনো বই, তবু কী ভিড়, টিকিট পাওয়া গেল না। এটা তখন তাদের সেই বয়েস যখন কিছু না পেলেও মন খারাপ হয় না। চৌরঙ্গী রোড দিয়ে দুজনে হেঁটে দক্ষিণের দিকে আসছিল এলোমেলো কথা বলতে বলতে। মধ্যে মধ্যে মনোরমা দু-বছর আগে প্রথমবার দেখা 'কাম সেপ্টেম্বর' সেই মায়াবি গানের একটা পংক্তি গুনগুন করছিল।

শীতের সন্ধ্যা, ছুটির দিনের শেষ। রাস্তায় লোকজন, আলো। কলকাতাকে খুব উচ্ছল, উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। হঠাৎ পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে মনোরমা আত্মারামকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'ওই দেখ'।

সায়াহ্নের ঘন ট্রাফিকে দ্রুতগতি ট্রাম, বাস, লরি, ট্যাক্সি, গাড়ি সব কিছু উপেক্ষা করে ময়লা নীল হাফ শার্ট গায়ে দুটো হাত পাখির উড়ন্ত ডানার মতো দুপাশে ছড়ানো, টলমল পায়ে এক ছন্নছাড়া যুবক গান্ধীমূর্তির নিচের দিক থেকে কোনাকুনিভাবে হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের দিকে হেঁটে আসছে। মনে হচ্ছে যেন ভেসে চলেছে। গাড়ির হর্ন, ট্রাফিক, পুলিসের চিৎকার, হুইসিল; একটা ট্রাক দক্ষিণ দিক থেকে ফুল স্পীডে আসছিল, দেখতে পায়নি, শেষ মুহূর্তে ক্যাঁচ করে থেমে গেল কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই যুবকের। মনোরমা আত্মারামকে ফিসফিস করে বলল, 'কবি তুষার রায়। ডেথ-ডেথ খেলছেন।' আগের শনিবার দিনই ময়দানে মুক্তমেলায় সে বান্ধবীদের সঙ্গে গিয়েছিল, সেখানে তুষার রায়কে দেখেছে, নিতান্ত অবহেলাভরে সেদিন তুষার এক জাঁদরেল পুলিস অফিসারকে বলেছিল, 'ওরে ও ভাই পুলিস। আমাকে দেখে টুপিটা তোর একটুখানি খুলিস।'

পার্ক স্ট্রিটের ডানদিকের ফুটপাথে উঠে শীতের সন্ধ্যার নীল কুয়াশা আর আকাশি নিয়ন দ্যুতির মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন তুষার রায়।

এই রকম সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা এখনো আত্মারামের মনে পড়ে। এখনো মনে পড়ে মনোরমাকে।

মনোরমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না এ ব্যাপারটা বুঝতে তার দু-তিন বছর লেগেছিল। প্রথমে ভাবত হয়তো মনোরমা কাজেকর্মে কলকাতায় আসবে। তার সঙ্গে দেখা করবে। কোনোদিন দুপুরবেলায় দরজায় কড়া নাড়া শুনে ঘুম থেকে উঠে তাদের জীর্ণ ভট্টাচার্য-বাড়ির মলিন কপাট খুলে সে দেখবে মনোরমা দাঁড়িয়ে আছে।

মনোরমা এল না, চিঠিও দিল না। কিন্তু সেও তো একটা খোঁজ নিতে পারত, একবার খড়গপুর গিয়ে খুঁজে বার করতে পারত মনোরমাকে।

একেবারে যে চেষ্টা করে নি আত্মারাম তা অবশ্য নয়। একবার পুরী গিয়েছিল,

যাওয়ার সময় রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় পুরীর ট্রেনটা খড়্গপুরে দাঁড়াল, সমস্ত প্লাটফর্ম রেলের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজল সে, হঠাৎ মনোরমা আসতেও তো পারে প্লাটফর্মে। তারপর ট্রেন যখন ছাড়ল, আলো অন্ধকারে মেশানো খড়্গপুর শহরের এপাশ থেকে ওপাশ চোখ দিয়ে খুঁজল সে, কোনো আলোকিত অলিন্দে মনোরমা হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে।

মনোরমার কথা আপাতত থাক।

মনোরমা কতটা দুঃখী তা আমরা জানি না। তবু বলব ভট্টাচার্য বাড়ির দুঃখের সংসারের দরজায় মনোরমা না এসে হয়তো ভালই করেছে। যদি সে সত্যিই কোনোদিন আসে তখন না হয় দেখা যাবে।

এতক্ষণ আপনারা নানা কায়দা করে কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে গেছেন। আত্মারামের সংসারের মধ্যে প্রবেশ করতে চান নি। আসুন এবার সেখানে যাই। কী ছিরি সেই সংসারের! কী ছাঁদ!!

শ্রীহীন, ছন্দহীন সেই ভট্টাচার্য-বাহির গল্প আর দশটি ভেঙেপড়া সংসারের চেয়ে আলাদা নয়। নতুন করে সে গল্প লেখার কিছু নেই। আপনারা নিজেরাই কেউ কেউ এসেছেন সেরকম বাড়ি থেকে, আর কেউ কেউ পাশের বাড়ি বা উল্টো দিকের দোতলার জানলা থেকে দেখেছেন ফাটা দেয়ালে গর্তে অশ্বত্থের চারা বড় হচ্ছে, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে গত শতাব্দীর চুনবালি জড়ানো পলেস্তারা।

তবু গল্প বলার খাতিরেই ছোটো করে একটু বলে রাখি। নদীয়া জেলার যে চৌবেড়ে গ্রামে নীল দর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম তার থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে কণ্ঠপুর মৌজায় ভট্টাচার্যদের বহুকালের পুরোনো বসবাস ছিল। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর উপর্যুপরি খরায় ও বন্যায় এ অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজ সরকারের ডাক বিভাগে বড়ো চাকরি করতেন। গ্রাম সুবাদে আত্মারামের পিতামহের পিতামহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যকে তিনি চিনতেন এবং ব্রাহ্মণ পরিবারটির আর্থিক দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তিনি রামনারায়ণকে কলকাতার বড়ো ডাকঘরে একটি কাজ জোগাড় করে দেন।

দীনবন্ধুর চেয়ে রামনারায়ণ বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন এবং দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পরেও বহুবছর ডাক বিভাগে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন। আলিপুরে যখন প্রথম বড়ো জেলা সদর পোস্টঅফিস আলাদা করা হল তখন তিনিই তার প্রথম পোস্টমাস্টার নিযুক্ত হন এবং সেই সময়ে কণ্ঠপুরগ্রামের পাট সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিয়ে কালীঘাটে বসবাস শুরু করেন। সরকারি

চাকরির আয়ে কোনো রকমে কালী মন্দিরের কাছেই ছোটো দোতলা বাড়িটি তৈরি করেন। তার আগে কাছেই ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন।

রামনারায়ণই কলকাতা এলাকায় ভট্টাচার্য-বাড়ির মূল প্রতিষ্ঠাতা, যেমন মোগল সাম্রাজ্যের বাবর। রামনারায়ণের ছেলে চারু ভট্টাচার্য, চারুপদ ভট্টাচার্য, আত্মারামের প্রপিতামহ। তারই ভাই হারু, ভট্টাচার্য বাড়ির ভূত, পুরুষানুক্রমে কাকাবাবু। চারু ভট্টাচার্য থেকে আত্মারাম পর্যন্ত এই চারপুরুষের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে এ কাহিনী ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। শুধু আত্মারামের সম্মান রক্ষার জন্যে লিখে রাখা উচিত ভট্টাচার্য-বাড়ির কখনোই খুব জমজমাট বা বর্ধিষ্ণু ভাব ছিল না, আত্মারামের আমলেই যে তার সমূহ পতন হয়েছে তা নয়।

দু-চারটে ছেলেমেয়ে, ছোটোখাটো বা মাঝারি একটা চাকরি, পাঁচ দশ বছর পর একটা বাড়ির চুনকাম বা ছোটখাটো সংস্কার; কখনো একটা বিয়ে, একটা অন্নপ্রাশন, একটা শ্রাদ্ধ, কখনো দু-চারজন আত্মীয় কুটুম্ব। বছরের শেষে ভট্টাচার্য বাড়ির উঠোনের একমাত্র বেলগাছ কচিপাতায় ছেয়ে গেছে, ফলভারে নুয়ে পড়েছে। মোড়ের মাথায় প্রাচীন তেঁতুলগাছে টিয়াপাখিরা যথাসময়ে চেঁচামেচি করতে করতে সার বেঁধে ফিরে এসেছে। আত্মারামের বাপঠাকুরদারা যথারীতি জন্মেছে, বড়ো হয়েছে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা অর্জন করেছে অবশেষে আগে পরে সময়ে অসময়ে মারা গেছে। সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে কেটে গেছে দিন।

শুধু কাকাবাবু ব্যতিক্রম। তাঁর সুখ নেই, দুঃখ নেই, আনন্দ নেই, বিষাদ নেই; জরাহীন, মৃত্যুহীন এক প্রেতাত্মা। পৌনে শতাব্দী পার হয়ে গেল, তাঁর পূর্বপরিচয় আজ আর কেউ চেষ্টা করলেও স্মরণ করতে পারবে না।

উঠোনের বেলগাছ, যার তলায় বাঁধানো সিমেন্টের বাটিতে তাঁর খাবার দেওয়া হত, সেই বেলগাছও বহুদিন হল নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আত্মারাম জন্মানোর সময় পর্যন্ত ছিল না। তবে আত্মারাম বাঁধানো বেদীটা দেখেছে যার মধ্যে কাকাবাবুর বাটিটা ছিল। ছোটোবেলায় আত্মারাম কতবার সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘর থেকে মা কিংবা ঠাকুমার কাছ থেকে কোনো এক টুকরো খাবার নিয়ে ওই বাটির মধ্যে রেখে দিয়েছে।

কাকাবাবুকে খাবার দেয়ার রীতি হল সন্ধ্যার দিকে। আত্মারাম দেখেছে অনেক সন্ধ্যায় কাকাবাবুর খাবার ইঁদুরে বা পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। কাকাবাবু লোকজনের মাঝখানে খেতে আসেন নি। একবার ভোরবেলাতেও কী কারণে ঘুম থেকে উঠে আত্মারাম দেখেছিল একটা কাক বাসি খাবারটুকু খাচ্ছে। কেন যে রাতে কাকাবাবু খেয়ে নেন নি।

আত্মারামের দশ বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন। তখন তার পিতামহ আর

পিতামহী বেঁচে। রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের আমল থেকেই এ বাড়িতে অন্তত একজনের পোস্টাফিসে একটা চাকরি বাঁধা ছিল। সে আমলে ডাক বিভাগের চাকরিতে পারিবারিক সততার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। পারিবারিক সূত্রেই পুরষানুক্রমে এ বাড়ির লোকেরা ডাক বিভাগে কাজ করে এসেছে। আত্মারামের বাবাও তাই করেছিলেন। কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসের সদর দপ্তরে তিনি কাজ করছেন। তখন তাঁর অল্প বয়স, বড়োজোর চল্লিশ, মাত্র কয়েকমাস আগে তিনি কালীঘাট পোস্টাফিস থেকে জি পি ও-তে এসেছেন। অফিস ছুটির পর জি পি ও-র সামনেই রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম ধরতে ওপারে আসার সময় হঠাৎ কয়লাঘাটের দিক থেকে দ্রুত গতিতে চলে আসা একটা লরির নিচে তিনি চাপা পড়েন। সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় কয়েকদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি বেঁচে ছিলেন।

সেই সময় মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন আত্মারাম কালীঘাট থেকে ধর্মতলা এসে ট্রাম বদল করে কলেজ স্ট্রিটে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বাবাকে দেখতে যেত। বাবার কথা ভালোই মনে আছে আত্মারামের, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি করে তার হাসপাতালের কথা মনে আছে। ডেটল-ফিনাইল মেশানো হাসপাতালের রুগ্ন-গন্ধ, পাশাপাশি লোহার খাটে পরপর রোগী। কয়েকদিন মাত্র কষ্ট পেয়েই তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। এর পরে আর কখনো হাসপাতালে যেতে হয় নি আত্মারামকে। যাওয়ার খুব ইচ্ছেও নেই তার। এখনো অনেক সময় আনমনে একা একা হাসপাতালের সেই রুগ্ন-গন্ধ তার নাকে ফিরে আসে, কী রকম অসুস্থ মনে হয় তার; তার মনে পড়ে সারি সারি লোহার খাটে ঘর ভর্তি রোগী। কারো মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারো হাতে প্লাস্টার, কারো পা সামনের দিকে টানা দিয়ে আটকানো। দম বন্ধ করা স্মৃতি। দু-একবার স্বপ্নেও এই দৃশ্য আত্মারামের কাছে ফিরে এসেছে।

আত্মারামের বাবা মার যাওয়ার পর অফিসের লোকেরা এসে বলেছিল চেষ্টা করলে আত্মারামের মার জন্য একটা কাজ পোস্টাফিসে জোগাড় হতে পারে। বড়ো সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত করতে হবে, তা হলেই হয়তো হয়ে যাবে। আত্মারামের মার এ ব্যাপারে খুব আপত্তি ছিল না, তিনি নিজে ম্যাট্রিক পাশও ছিলেন। কিন্তু শ্বশুর মশায়ের আপত্তিতে তাঁর আর কাজের চেষ্টা করা হয় নি।

আত্মারামের বাবার আরো দুই ভাই ছিল। কিন্তু একজনের বয়েস যখন এগারো, আরেকজনের নয়, সেই সময় এক বর্ষার দিনে কালীঘাটের আদিগঙ্গায় দুই ভাই স্নান করতে গিয়ে একসঙ্গে ডুবে মারা যায়। বোধ হয় ছোট ভাই পিছল ঘাটে হড়কিয়ে আগে জলে ডুবে যায়, বড়ো ভাই তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুই জনেই জড়াজড়ি করে ডুবে মারা যায়।

আত্মারামের এক পিসিও ছিল। বাগবাজারে বিয়ে হয়েছিল। খুব আবছা আবছা তাকে মনে আছে আত্মারামের। আত্মারামের যখন বছর দুয়েক বয়েস তখন তার বিয়ে হয়ে যায়। তার আগে পর্যন্ত আত্মারাম অধিকাংশ সময় তার কোলেই থেকেছে। সেই পিসিও বিয়ের পরের বছরই বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। সেই শোকটা শিশু আত্মারামের খুব লাগে নি, কিন্তু পিসির জন্য এখনো তার কেমন একটা মায়া হয়। সামনের বারান্দায় প্রতিদিন মা পিসিকে তারপর পিসি মাকে চুল বেঁধে দিত, খুবই শৈশবের স্মৃতি, কিন্তু কেমন যেন কেমন করে মনে রয়ে গেছে।

আত্মারামের ঠাকুরদা, ঠাকুমা দুজনেই অনেক শোক পেয়েছিলেন জীবনে। আত্মারামের বাবার মৃত্যুর পরে তাঁরা ভেঙে পড়লেন, বুড়ো-বুড়ির বুড়ি বছর খানেকের মাথায় মারা গেলেন, ঠাকুরদা আরও চার-পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন।

সুখের বিষয় আত্মারামের নিজের ভাইবোন কেউ ছিল না। আত্মারাম এ নিয়ে ভেবেছে, তা হলে তাকেও অনেক শোক পেতে হত। আত্মারামের আরো একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল এবং এখনো আছে যে বাবা-কাকাদের মতো সেও একদিন বেঘোরে দুর্ঘটনায় মারা পড়বে।

এইখানে আত্মারামদের বাড়ির কথা তাড়াতাড়ি শেষ করার আগে একটা কথা লিখে না রাখলে অন্যায় হবে।

পনেরো বছর আগে মৃত হারুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে সেই যে সরকার মশায় একদিন সকালে ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যে হারু তাকে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করেছিল সে কিন্তু হারু বা কাকাবাবু নয়। সেদিন সকালবেলা, ভট্টাচার্য বাড়ির সকলে গিয়েছিলো কী একটা উপলক্ষে কালী মন্দিরে পুজো দিতে। বাড়িতে একা আত্মারামের বাবা ছিলেন দোতলায়। তখন তাঁর আঠারো-উনিশ বছর বয়েস, তিনিই সরকারমশায়ের পায়ের শব্দ শুনে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন, পরে সরকারমশায়কে তাড়াতাড়ি চলে যেতে দেখে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আত্মারামের বাবা অল্প বয়েসেই নরহরি সরকার এ পাড়া ছেড়ে চলে যান, সরকারমশায়কে তাঁর চেনা ছিল না। কিন্তু সরকারমশায় ভট্টাচার্য-বাড়ির অন্য প্রজন্মের আঠারো বছরের জীবিত যুবককে দেখে, যার সঙ্গে ওই বয়সে মৃত হারুর আদলের যথেষ্ট মিল থাকা স্বাভাবিক, ভূত বলে ভয় পেয়েছিলেন।

আত্মারামের মা মারা গেলেন তার বি এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর মাস দুয়েক পরে। আত্মারামের বাবা মারা যাওয়ার সময়ে আত্মারামের উপনয়ন হয় নি। একমাত্র ছেলের উপনয়ন ভালোভাবে ঘটা করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আত্মারামের

মা-বাবার। পরের বৈশাখে একটা তারিখও মনে মনে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু তার প্রয়োজন হল না, ওই বাবার শ্রাদ্ধের দিনেই তাকে উপনয়ন সংস্কার করিয়ে গলায় পৈতে দিয়ে তারপর বাবার শ্রাদ্ধ করানো হল।

মায়ের মৃত্যুর পরে হাসপাতাল থেকে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মাকে নিয়ে কেওড়াতলায় পুড়িয়ে সে ঠিক করেছিল এবার কেটে পড়বে এই শহর থেকে। অন্য কোথায় গিয়ে নতুন করে জীবনের সন্ধান করবে।

কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। তার জন্যে কিছুটা দায়ী কাকাবাবু আর অনেকটাই মনোরমা।

আগে মনোরমার কথা এতটা ভাবত না। উচিত ছিল যত দিন যাবে, মনোরমা মন থেকে মুছে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। মনোরমা তাদের এ বাড়িতে কখনো আসে নি বটে তবে বাড়িটা ভালোভাবেই চিনত। সে হয়তো আর আসবে না কোনদিনই কিন্তু বাড়িটা তার চেনা। ইচ্ছে করলে আসতেও পারে।

আগে এমন হতনা, আজকাল হাজরার মোড়ে গেলে আশুতোষ কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে, কালীঘাট পার্কের পাশ দিয়ে গেলে কেন যেন অকারণে বারবার মনোরমার কথা মনে পড়ে। বারবার মনে করার চেষ্টা করে চোদ্দ বছর আগের দু-একটা টুকরো টুকরো কথা, চোদ্দ-বছর আগের শ্যামলী মেয়েটির মুখের আদল। কেমন অস্পষ্ট, মুছে যাওয়া ছবির মতো, ডাক বাক্সে বৃষ্টিতে ভেজা চিঠির মতো—এখন যদি রাস্তায় দেখে মনোরমাকে সে কি চিনতে পারবে?

মনোরমা চিনতে পারবে তাকে?

॥ সাত ॥

দুই আত্মারাম

'কূর্মলোম জটাচ্ছন্ন শশশৃঙ্গ ধনুর্দ্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্প কৃতশেখরঃ॥'
'পরিধানে কচ্ছপের লোমের বসন,
হাতে খরগোশের সিং দিয়ে তৈরি ধনুক।
ঐ যাচ্ছে বন্ধ্যা রমণীর পুত্র,
মাথায় তার আকাশ কুসুমের মালা॥'

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

উঠোনের বেলগাছটা পড়ে যাওয়ার পরে, একদিন আস্তে আস্তে বেদীটাও ভেঙে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কাকাবাবুর বাটিটা।

প্রথম প্রথম আত্মারাম রাতে শোয়ার আগে একটা রুটি কী একটা পাঁউরুটির টুকরো কাকাবাবুর উদ্দেশ্যে উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে দিত। যেভাবে বাড়ির পোষা কুকুরকে লোকে খাবার দেয়। কিন্তু একদিন তার নিজেরই খেয়াল হল, হতে পারে ভূত, হতে পারে অশরীরী তাই বলে কী নিজের পূর্বপুরুষকে এইভাবে অবহেলা করা উচিত।

পরের মাসের প্রথমে টিউশনির মাইনে পেয়ে কালীঘাট মন্দিরের সামনের একটা ফুটপাথের দোকান থেকে একটা কানা উঁচু অ্যালুমিনিয়ামের বাটি কিনে আনল কাকাবাবুর জন্যে সে।

আত্মারাম জীবনে প্রায় সবদিক থেকেই অসফল। বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির পিছনের অংশটুকুতে তারা সরে যায়। সামনের পুরোনো একতলা অংশটুকু তার জন্মের বহুকাল আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। মধ্যের অংশটুকুও বেচে দিতে হল কলেজে পড়ার সময়। বাড়িতে ভূত আছে বলে ভালো খরিদ্দার পাওয়া গেল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা কিনল তারাও কেন যেন আর এল না। মধ্যের অংশটা তারপর থেকে তালা বন্ধই পড়ে থাকল।

নিচে দুখানা ঘর, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় একটা চিলেকোঠা ঘরের মতো এইটুকু অংশে এসে আত্মারামের সময়ে ভট্টাচার্য-বাড়ি পৌঁছল। দোতলায় চিলেকোঠা ঘরে কেউ উঠত না। ওই সিঁড়ি দিয়ে ছাদে বহুকাল কেউ ওঠেনি। ধুলোয়, ময়লায় মাকড়সার জালে ভর্তি সে সিঁড়ি চিলেকোঠা ঘর চামচিকেয় ভর্তি। সেখানেই কাকাবাবু নিরিবিলিতে থাকেন।

একতলায় দুখানা ঘরের একখানায় ঠাকুরদা-ঠাকুমা, পরে ঠাকুরদা একা আর অন্যখানায় আত্মারামের মা আর সে থাকত। এখন পুরোটাই তার।

কিন্তু এই ভাঙা বাড়ির হাত থেকে তার অব্যাহতি চাই। কাকাবাবুকে ফেলে যাওয়া চলবে না। তবু কাকাবাবু কি এই বাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে অন্য কোথাও যেতে রাজি হবে? কাকাবাবুর কি অনুমতি পাওয়া যাবে এই বাড়ি বিক্রি করার জন্যে? কাকাবাবুর বিনা অনুমতিতে সে কি করে এই বাড়ি বেচবে, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?

দ্বিধাগ্রস্ত আত্মারাম সবশেষে কাকাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা মনস্থ করল। উঠোনের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে খাবার দিয়ে একদিন সারারাত বারান্দায় জলচৌকি টেনে নিয়ে না ঘুমিয়ে বসে রইল। কাকাবাবু যখন খেতে আসবেন, ধরবে। কিন্তু কাকাবাবু এলেন না। অনেকরাতে দুটো ধেড়ে ইঁদুর এসে সেদিনের দেওয়া পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে হুটোপুটি শুরু করে দিল।

আরেকদিন দুপুরবেলায় দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে চিলেকোঠার ঘরে গেল আত্মারাম।

বোধহয় গত তিরিশ বছর এই সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামা ওঠা করেনি। ধুলো ময়লার, মাকড়সার জাল, ইঁদুর-আরশোলার রাজত্ব পেরিয়ে দোতলার ভাঙা দরজা জানালা বন্ধ শূন্য ঘরে পৌঁছাল আত্মারাম। বহুদিন পরে এঘরে কোনো মানুষের প্রবেশে চামচিকেরা বিচলিত বোধ করল। তারা চিঁচিঁ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আত্মারাম বেরিয়ে এসে শূন্য ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে মুখ করে বলল, 'কাকাবাবু, একটা কথা আছে। আমরা আর এ বাড়িতে থাকব না। আমরা অন্য কোথাও যাব। আপনি আমার স ঙ্গ চলুন। আপনি অনুমতি দিন। আমি এ বাড়ি বেচে দিই।'

আত্মারামের অনুনয়ে কোনো কাজ হল না। কাকাবাবু কোনো উত্তর দিলেন না।

দিনেরবেলায় কাকাবাবুর হয়তো প্রকাশিত হতে সঙ্কোচ বা অসুবিধে হচ্ছে এই ভেবে আত্মারাম একদিন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে রাতেরবেলায় দোতলায় উঠল। কিন্তু কাকাবাবুর উত্তর পাওয়া গেল না।

এ অবস্থায় আর কী করা যাবে। অবশেষে আত্মারাম ঠিক করল কাকা-বাবুকে সুদ্ধই বাড়ি বেচে দেবে। আজকাল সে কাগজে দেখে অনেক পুরোনো বাড়ির বিক্রির বিজ্ঞাপন বের হয়। 'ভাড়াটেসহ বাড়ি বিক্রয়।' সে ঠিক করল কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে 'ভূতসহ বাড়ি বিক্রয়।' যে কিনবে তার সঙ্গে চুক্তি হবে, চিলেকোঠার ঘর তোমার নয়, ওটা কাকাবাবু যতদিন থাকবে ততদিন কাকাবাবুর।

এসব পরিকল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু খবরের কাগজে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাড়ি বেচে গুটিয়ে চলে যেতে যে উদ্যোগের দরকার তা কোনোদিনই আত্মারামের নেই।

এই সময়ে একদিন রাতে আত্মারাম স্বপ্ন দেখল, খুব পুরনো স্বপ্ন, কিন্তু একটু আলাদা। ওষুধের গন্ধে ভরা একটা হাসপাতালের বিশাল লম্বা চওড়া উঁচুছাদ হল ঘরের মতো ওয়ার্ড। স্বপ্নের মধ্যে আস্তে আস্তে হলঘরটা বড়ো হতে লাগল। ময়দানের মতো বড়ো হয়ে গেল। সেই হল ঘরে হাজার হাজার লোহার খাটে হাজার হাজার রোগীর মধ্যে সে আর কাকাবাবু পাশাপাশি খাটে শুয়ে রয়েছে। কাকাবাবু চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন, তাঁর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখলেও কোনো সুবিধে নেই কারণ আত্মারাম কাকাবাবুকে কখনো দেখেনি চিনতে পারবে না। তবুও ঘুমের মধ্যে আত্মারাম বুঝতে পারল এইই কাকাবাবু, ফিনাইলের গন্ধে ভেজা চাদরমোড়া কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কাকাবাবুর, 'আর নয়। চলো আত্মারাম অন্য কোথাও চলে যাই।'

ঘুম ভাঙতেই আত্মারাম বুঝতে পারল কাকাবাবুর অনুমতি পাওয়া গেছে। কাকাবাবুও তার সঙ্গেই বাড়ি ছাড়বেন।

আর বাধা রইল না। এখন বাধা শুধু মনোরমা। যদি কোনোদিন মনোরমা মিত্র নামে সেই শ্যামলী, কাজল দিঘির অতল চোখের মেয়েটি, (মনোরমা কি এখনো মিত্র আছে?), কলকাতায় এসে তার খোঁজ করে। যদি এই ভাঙা বাড়ির দরজা থেকে ফিরে যায়? আত্মারামের কেন যেন অনেকদিন আগে ছোটোবেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া মধ্য নিশীথের সূর্যের কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগের কালীঘাট পার্কের প্রথম সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কয়েকটি অমোঘ, অসংলগ্ন পংক্তি,

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা
মাঠের উপরে
বলিলাম—'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি—
আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।'

অনেক কবিতা, অনেক স্বপ্ন, অনেক চিন্তার অবসানে আত্মারাম সিদ্ধান্ত করল এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে একবার মনোরমাকে জানিয়ে যেতে হবে। সে যদি সত্যিই কখনো আসে, যেন ফিরে না যায়।

কয়েকদিন ধরে উথালপাথাল বৃষ্টি হচ্ছে। শ্রাবণের শেষ কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। বৃষ্টি পড়ছে স্বর্গ থেকে, শূন্য থেকে, আকাশ থেকে, মেঘ থেকে আত্মারামের ভাঙা বাড়ির ছাদ থেকে, দেয়াল থেকে।

প্রথমে কয়েকদিন ভেজা গদিতে শুয়ে তারপর খাটের নিচে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে শুয়ে আত্মারামের শরীরটা খারাপ হল। একটু সর্দি, একটু কাশি, একটু নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, অল্প অল্প জ্বর।

এরই মধ্যে এইদিন সকালবেলা, খুব সকালবেলা জ্বরজ্বর শরীরে আত্মারাম ঘুম থেকে উঠে অনেকদিন পরে দাড়ি কামাল। মাথাটা একটু দপদপ করছে। কয়দিন স্নান করা হয়নি, একটু জল দিয়ে মাথাটা ধুয়ে নিল।

আজ সকালে বৃষ্টি নেই। আত্মারামের উঠোন থেকে যতটুকু আকাশ দেখা যায় সবটুকু নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই।

আজ আত্মারাম খড়্গপুর যাবে মনোরমার খোঁজে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকেট কিনে খড়্গপুর পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা এগারোটা।

খড়্গপুরে রেলের অফিসের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে ঠিক কোন অফিসে মনোরমার বাবা কাজ করেন মনোরমারা রেলকলোনির ঠিক কোন পাড়ায় থাকে কিছুই

আত্মারামের জানা নেই। মনোরমার বাবার নামটাও এই চোদ্দো বছর পরে কিছুতেই মনে করতে পারছে না সে, এখন তার সম্বল মনোরমার বাবা মিস্টার মিত্র। শুধু এইটুকু সঙ্কেত।

তিনটে অফিসে পাঁচজন মিস্টার মিত্রের সঙ্গে দেখা হল আত্মারামের, কিন্তু তার কেউ মনোরমা মিত্র নাম্নী মায়াবি তরুণীর বাবা নয়। অনেক ঘুরে ঘুরে কয়েক কাপ চা খেয়ে ক্লান্ত, অসুস্থ আত্মারাম অবশেষে একটা সঠিক অফিসে পৌঁছল। সে অফিসে অনেকদিন আগে মিষ্টার .মিত্র ছিলেন। অফিসের লোকেরা অবশ্য মিস্টার মিত্র বলল না, বলল মিত্রবাবু।

কিন্তু মিত্রবাবু তো বহুকাল আগে এখান থেকে বিলাসপুরে বদলি হয়ে যান। আর এতদিনে নিশ্চয়ই রিটায়ার করে গেছেন। একজন মোটা মতন ভারিক্কি চেহারার লোক আত্মারামকে দুবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে চেঁচিয়ে ডাকলেন তিন টেবিল ওপারে আরেকজনকে, 'ও নরেশদা, ডেসপাচ সেকশনের বড়োবাবু, ওই যে মিত্রবাবু বিলাসপুর বদলি হয়ে গিয়েছিলেন এখান থেকে, তিনি রিটায়ার করেন নি এতদিনে?'

নরেশদা একটা বোঁটায় লাগানো চুন নিয়ে মুখের পান কষে কষে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিলেন, 'অন্তত পাঁচ বছর।'। তারপর পাশের জানলা দিয়ে অবহেলা ভরে একটু রক্তিম পিক ছুড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে জানতে চাইছে?'

আত্মারাম বিনীত ভাবে নরেশদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সারাদিন অসুস্থ শরীরে খালি পেটে চা খেয়ে খেয়ে তখন তার গা গোলাচ্ছে। সে খুব নরম ভাবে বলল, 'আজ্ঞে আমি ওঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, খড়্গপুর এসেছিলাম ভাবলাম একটু খোঁজ করে যাই।'

নরেশদা বললেন, 'ওই তো বললাম, এখান থেকে বিলাসপুর গিয়েছিল। তারপর রিটায়ার করে কোথায় গেছে বলতে পারব না। বোধ হয় কলকাতায়ই ফিরে গেছে।'

কপালের দুপাশে দুটো শিরা দপদপ করে জ্বলছে আত্মারামের। লজ্জার মাথা খেয়ে চোখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আত্মারাম বলল, 'আচ্ছা ওঁর যে বড়ো মেয়ে মনোরমা সে কোথায় আছ কিছু জানেন।'

আত্মারাম যা ভেবেছিল তা নয়, নরেশদা প্রশ্নটাকে তেমন খারাপভাবে নিলেন না। উল্টোদিকের টেবিলে বসা অন্য এক প্রবীণ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন; 'আচ্ছা, বড়দা, মিত্রবাবু এখান থেকে যাওয়ার আগে বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন না, কোথায় যেন বিয়ে হল মেয়েটার!'

বড়দা অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক মনে পড়ছে না। পাত্র বোধহয় কলকাতারই হবে। আজকাল সব পাত্রই তো কলকাতার।'

আত্মারাম আর দাঁড়াল না নিঃশব্দে রেলের অফিস থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে স্টেশনে চলে এল। গাড়িতে উঠে সে সন্ধ্যার পর যখন কলকাতায় সে পৌঁছল তখন তুমুল বৃষ্টি, কলকাতার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। স্টেশনে বাস-ট্রাম কিছুই নেই। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট জলের নিচে ডুবে গেছে।

আত্মারাম বিন্দুমাত্র চিন্তা করল না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, বাদল হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে কখনো হাঁটুজল, কখনো কোমর জল ভেঙে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। অবশেষে এক সময় তার বাড়িতে তার ঘরে এসে পৌঁছল।

তখন অনেক রাত। তখনো বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। শুধু আকাশ থেকে সরাসরি নয়। আত্মারামের ভাঙা বাড়ির ছাদ থেকে তার শোয়ার ঘরের মধ্যে অঘোরে জল পড়ছে।

এরই মধ্যে ঘরের একপ্রান্তে সে তার ক্লান্ত দেহ গুটিয়ে নিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ, কত ঘণ্টা, কতদিন আত্মারাম এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে তা জানে না। তার কোনো হিসেব নেই। শুধু এক শেষরাতে, তখন গুরুবর্ষণ স্তব্ধ, তার তন্দ্রা, তার আচ্ছন্নতা, তার ঘুম ভাঙল।

কে যেন ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে?

কোনোদিন তাঁকে দেখেনি, তবু পায়ের শব্দে চোখ মেলে আত্মারাম দেখে বুঝতে পারল কাকাবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন তার ঘরের দরজায়। এর আগে কাকাবাবুর সঙ্গে কখনোই দেখা হয়নি আত্মারামের। তবু একবার তাকিয়ে দেখেই সে কাকাবাবুকে চিনতে পারল।

এই মুখের আদল, এই চেহারা তার বহুদিনের চেনা। আঠারো-উনিশ বছরে প্রথম বয়েসে আয়নায় দাড়ি কামাতে প্রত্যেকবার সে এই মুখের সামনে মুখোমুখি বসেছে। কাকাবাবুকে একবার দেখেই আত্মারাম সব বুঝতে পারল, এ তারই হারিয়ে যাওয়া উনিশ বছর বয়েস। কাকাবাবু তার সেই ভালোবাসার দিনগুলি তাকে ফিরিয়ে দিল। অনেকদিন পরে আত্মারাম যেন নিজেকে খুঁজে পেল।

আজ শেষরাতে আত্মারামের প্রথম যৌবন কাকাবাবুর চেহারায় মধ্য যৌবনের আত্মারামকে ডাকতে এসেছে। অনেকদিন আগে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বাড়িতেই কাকাবাবুর বয়েসি সে সময়ের আত্মারামের বাবাকে দেখে নরহরি সরকারমশায় অহেতুক ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু আত্মারামের ভয় হল না, নিজেকে দেখে কে ভয় পায়?

কাকাবাবু অর্থাৎ হারু অর্থাৎ প্রথম আত্মারাম দ্বিতীয় আত্মারামকে ডাকল, ‘এসো’, আত্মারাম ঘর থেকে বেরিয়ে এল পিছনে চৌত্রিশ বছরের আত্মারাম, সামনে উনিশ বছরের আত্মারাম, রুগ্‌ণ শ্রান্ত, অসফল আত্মারাম তরুণ কবি আত্মারাম, মনোরমার আত্মারামের পিছন পিছন উঠোনে এসে দাঁড়াল। সেখানে কাকাবাবুর অ্যালমিনিয়ামের বাটিটা বৃষ্টির জলে ভরে আছে। কতদিন কাকাবাবুকে খাবার দেওয়া হয়নি, কে জানে?

চারিদিক নিস্তব্ধ, এরই মধ্যে বাইরের রাস্তায় ·ার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুই আত্মারাম উঠোন পেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দিনের আলো এখনো ফোটেনি। রাস্তায় অনেক জল জমে আছে। একটু ঝিরঝিরে আলতো বৃষ্টি এখনো পড়ছে। পুব দিকে থেকে থেমে থেমে একটা হিমেল হাওয়া বইছে। এরই মধ্যে জল ছপ ছপ করে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভেজা, মাথায় চুলে বৃষ্টির গুঁড়ো লেগে রয়েছে, কে একজন যে ভট্টাচার্য বাড়ির দরজার দিকে আসছে। শ্যামলী, দোহারা চেহারার একটি মেয়ে, খুব চেনা-চেনা, বড়ো আত্মারাম আর ছোটো আত্মারাম দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে। মনোরমা অবাক হয়ে গেছে, একজন সেই যাকে সে রেখে গিয়েছিল চোদ্দো বছর আগে। আর অন্যজন সেও সেই আত্মারাম শুধু চোদ্দো বছর বয়েস বেড়ে গেছে তার। মনোরমা এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না। দুই আত্মারাম জীর্ণ, সিক্ত ভট্টাচার্য বাইরের দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আত্মারাম আর দ্বিতীয় আত্মারাম, বড়ো আত্মারাম আর ছোটো আত্মারামের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মনোরমা, তারপর ভিজে ঠোঁট হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে বৃষ্টিভেজা গলায় বলল, ‘আজ আমি তোমাদের বাড়িতে প্রথম এলাম।’

আনুমানু

আমার নাম আনুমানু। আমি হলাম গিয়ে জয়ন্তী দিদিমণির সবচেয়ে আহ্লাদি বেড়াল। জয়ন্তী দিদিমণিকে তোমরা কি চেনো? শ্রীযুক্তা জয়ন্তী রায়চৌধুরী। বি. এ. বি. টি., স্যার হরনাথ গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারি বিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস। অবশ্য আজ চার বছর ধরে, আগের বড়ো দিদিমণি সরমা চক্রবর্তী হঠাৎ কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে জয়ন্তী দিদিমণিই ইস্কুলটা চালাচ্ছেন। কিন্তু কেন যেন তাঁকে কিছুতেই হেড মিস্ট্রেস করছে না। জয়ন্তী দিদিমণিই একা একা খালি বাড়িতে এই নিয়ে কেবলই গজগজ করেন। অথচ অন্য কেউ যদি তাঁকে এ নিয়ে কিছু বলে অমনি বলেন, না বাবা বাজে কাজ। বড়ো ঝমেলা, যত তাড়াতাড়ি নতুন লোক আসে তত ভালো! আমার বয়সে এত খাটাখাটুনি পোষাবে না, আমার দরকার নেই হেড মিস্ট্রেস হয়ে।

যাকগে এসব কথা বেশি বলে লাভ নেই। জয়ন্তী দিদিমণি জানতে পারলে আমার ওপর খেপে যাবেন অনেকদিন ইস্কুল মাস্টারি করে ওঁর আবার মাথা খুব গরম। এক এক সময় এমন রেগে যান। এই তো সেদিন ওঁর ন্যাওটা বেড়াল ময়নামতী ওঁর খাটের নিচটা নোংরা করে রেখেছিল, ইস্কুল থেকে বাসায় ফিরে জয়ন্তী দিদিমণি ওই নোংরামি দেখে একেবারে ঝাঁটাপেটা করে আমাদের সাতজনকেই বাড়ি থেকে তাড়ালেন। এই অবশ্য প্রথম নয়। আমরা জানি একটু পরেই ওঁর রাগ পড়ে যাবে, আমরা আনাচে-কানাচে লুকিয়ে রইলাম। কিন্তু ওঁর রাগ কমতে অনেক রাত হয়ে গেল, তখন লোডশেডিং, দেখি জয়ন্তী দিদিমণি টর্চ হাতে নিয়ে রান্নাঘরের ছাদে, কার্নিশের নিচে, পাশের বাড়ির প্যাসেজে আমাদের আয় আয়, মিউ মিউ, আয় এই রকম ডেকে ডেকে খুঁজছেন।

ওঁর ডাক শুনে আমাদের কেমন মায়া হল, তাছাড়া খিদেও পেয়েছিল, বিকেলে প্রত্যেকের এক বাটি করে দুধভাত 'বরাদ্দ' যেটা আজ খাওয়া হয়নি; সবাই সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকলাম। শুধু দুষ্টু অলক্ষ্মীটা কোথায় লুকিয়ে রইল।

একে লোডশেডিং-এর অন্ধকার, তার ওপরে অলক্ষ্মীটা একেবারে মিশমিশে কালো, পায়ের থাবায়, লেজে এমনকি গোঁফের কাছে পর্যন্ত একবিন্দু সাদা নেই। উল্টো দিকের বাড়ির আলসের আড়ালে শয়তানি করে লুকিয়ে রইল সে।

সবাই বলে কালো বেড়াল নাকি অলক্ষ্মী। আমার একটা কালো ভাই ছিল,

অমঙ্গল বলে আমার মায়ের বাড়ির লোকেরা তাকে চোখ ফোটার আগেই কোথায় ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

জয়ন্তী দিদিমণি নিজে থেকে অলক্ষ্মীকে এ বাড়িতে আনেননি। একদিন ভোরবেলা মিউ মিউ করে কাঁদতে কাঁদতে কোথা থেকে এল। বেড়ালছানার কান্না শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে জয়ন্তী দিদিমণি আপনমনে কথা বলতে বলতে উঠলেন, 'আরেকটা আপদ জুটল মনে হচ্ছে।' তারপর বেরিয়ে গিয়ে দেখেন কালো, রোগা বেড়ালছানা পাঁচিলের ওপর বসে ক'দছে। দেখেই রেগে গেলেন, 'ও মা, ছি ছি, কি অমঙ্গুলে কথা, এই সাতসকালে কে আমাদের বাড়িতে একটা কালো বেড়ালছানা ছেড়ে দিয়ে গেল?'

সেদিন ছিল শনিবার। জয়ন্তী দিদিমণি আড়াইটার সময় ইস্কুল থেকে ফিরলেন। তখনও কালো বেড়ালছানাটা পাঁচিলের উপর বসে কেঁদে চলেছে। জয়ন্তী দিদিমণি অধৈর্য হয়ে পড়লেন, 'শনিবারের বারবেলায় একি অমঙ্গুলে কান্না। খোকার চিঠি আসেনি দেড়মাস।'

খোকা হল জয়ন্তী দিদিমণির ছেলে, খোকা মানে শুভ্র রায়চৌধুরী। নাম করা ভালো ছাত্র, হায়ার সেকেণ্ডারিতে থার্ড হয়েছিল। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ল শিবপুরে। সেখানে একদম প্রথম। তারপর বৃত্তি পেয়ে গেল আমেরিকা। সেও প্রায় দশ বছর। আগে প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি দিত। লিখত সামনের বছরেই ফিরে আসছে। এখন আর ঠিকঠাক সময়মতো চিঠি আসে না। দেড়মাস-দুমাস পরে কোনোরকম দায়সারা গোছের একটা চিঠি আসে একটা পিকচার পোস্টকার্ডের উল্টোদিকে চার আঙুল সাদা জায়গায় খুব তাড়াতাড়িতে জড়ানো লেখা।

শ্রীচরণকমলেষু মা,

আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? এখানে খুব শীত পড়েছে। তুমি সাবধানে থাকবে। চিঠি দিয়ো। ইতি।

প্রণত খোকা।

চিঠি পেয়ে জয়ন্তী দিদিমণির মন ভরে না। কী রকম জড়ানো আবছা আবছা হাতের লেখা, এটাই কী খোকার হাতের লেখা? কী সুন্দর মুক্তোর মতো হাতের লেখা ছিল খোকার, সাধে কী অমন রেজাল্ট করেছিল?

খোকার চিঠিটা বারবার উল্টে-পাল্টে দেখেন জয়ন্তী দিদিমণি। পিকচার পোস্টকার্ডে কখনও একটা বিরাট উঁচু বাড়ির ছবি থাকে, কখনও পাহাড়, নদী, বড়ো রাস্তা। চশমা চোখে দিয়ে রঙিন ছবিগুলো খুব যত্ন করে দেখেন তিনি।

আমি অবশ্য খোকাকে দেখিনি। আমাদের সাতজনের মধ্যে কেউই খোকাকে

দেখেনি। শুধু কেষ্টা নামে যে মাথামোটা হুলোটা আছে সেটা বলে তার নাকি বারো বছর বয়েস, সে নাকি খোকাকে দেখেছে। আমার তো মনে হয় এটা বাজে কথা, ওই কেষ্টাটা মিথ্যে কথা বলায় ওস্তাদ। আসলে আমরা জয়ন্তী দিদিমণির সাতজন বেড়ালই খোকাকে না দেখলেও খুব ভালো করে চিনি। জয়ন্তী দিদিমণি তাঁর খোকার কত গল্প আমাদের সঙ্গে করেন।

সেই শনিবার দিন ইস্কুল থেকে ফিরে জয়ন্তী দিদিমণি কিন্তু বেড়ালছানাটার কান্নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রথমে একটা ছাতা নিয়ে হুস করে চেষ্টা করলেন বেড়ালছানাটাকে তাড়াতে। বেড়ালছানাটা কিন্তু দেওয়ালের ওপরে একটু সরে গিয়ে নির্বিকারভাবে একই রকম একঘেয়ে সুরে কাঁদতে লাগল। 'ধুত্তোরি' বলে জয়ন্তী দিদিমণি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলে ফিরে এসে দেখেন ডাকবাক্সে খোকার চিঠি। তখনও বেড়ালছানাটা দেওয়ালে বসে কাঁদছে। একটু পরে কী মনে করে ছানাটাকে দেওয়ালের ওপর থেকে নামিয়ে আনলেন, বললেন, আজ থাক, কালই তোকে ফেলে দিয়ে আসব। পরে যদিও একবার ব্যাগের মধ্যে ওকে ভরে বেরিয়েছেন মাছের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আসবেন বলে, কিন্তু দুপা গিয়ে ফিরে এসেছেন। কালো বেড়ালছানাটা রয়ে গেল, তবে এখনও রাগ বা দুঃখ হলে দিদিমণি কালো বেড়ালটাকে (এখন আর ছানা নয় সে) বলেন, এই অলক্ষ্মীর জন্যেই যতসব, কালই এটাকে তাড়িয়ে দেব।

অলক্ষ্মীকে অবশ্য এখনও পর্যন্ত আর তাড়ানো হয়নি। বরং উল্টে আজকাল পালিয়ে যেতে চায় জয়ন্তী দিদিমণিকে অস্থির করে তোলার জন্য। আমরা সবাই জানি এটা অলক্ষ্মীর বদমায়েসি, কিন্তু জয়ন্তী দিদিমণি কিছুতেই বোঝেন না, ভাবেন রাগ করে বুঝি চলে গেল। তাই এখনো টর্চ ফেলে ফেলে আনাচে-কানাচে খুঁজছেন আর খুঁজছেন, আয় আয় মিউ মিউ আয় আয়। পাড়ার লোকেরা হাসাহাসি করবে এই ভয়ে রাস্তায় বা বাড়ির বাইরে বেড়ালগুলোকে নাম ধরে ডাকেন না, শুধু বারবার বলেন, 'আয়-আয়-মিউ-আয়-আয়।'

অনেকক্ষণ ডেকে ডেকে জয়ন্তী দিদিমণি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। যদি ইচ্ছে করে চলে না আসে, তাহলে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে লোডশেডিং-এর কলকাতার চাপা গলিতে কালো কুচকুচে বেড়াল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। অনেক ডাকাডাকি, সাধ্যসাধনা করে অবশেষে বিরক্ত হয়ে জয়ন্তী দিদিমণি ঘরে ফিরে এলেন।

জয়ন্তী দিদিমণি বুঝতে পারেননি কিন্তু আমরা সকলেই টের পেয়েছিলাম অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে এক সময় কার্নিশের পাশ দিয়ে দিয়ে জানলা গলিয়ে অলক্ষ্মী চুপিচুপি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই তো এখন শয়তান অলক্ষ্মীটা ঘরের এক কোণে লোহার আলমারির মাথায় বসে আছে। আমি

দিদিমণিকে দুবার মিউ মিউ করে বোঝাতে গেলাম, অলক্ষ্মীর জন্যে চিন্তা করবেন না, দেখুন অলক্ষ্মী ফিরে এসেছে, আলমারির উপরে ঝিম মেরে বসে রয়েছে। কিন্তু আমার কোনো কথাই তো তিনি বুঝতে পারেন না। আমার মিউ মিউ শুনে তিনি খুব রেগে বললেন, 'এটা আবার জ্বালাচ্ছে কেন? একেকটা একেক জাতের শত্রু জুটেছে আমার।'

এরপর একা একাই জয়ন্তী দিদিমণি সওয়াল করতে লাগলেন, 'যতই মিউ মিউ করে কাঁদো, আলো না জ্বললে এই অন্ধকারে আমি তোদের কাউকে খেতে দিতে পারব না, তার চেয়ে কান্নাকাটি বন্ধ করে অলক্ষ্মীকে খুঁজে নিয়ে এসো।'

আমার দিদিমণির কোনো কথাই বুঝতে অসুবিধে হয় না। দিদিমণির কথা শুনে আমি তাঁর মাথার কাছে লাফ দিয়ে উঠে বলতে গেলাম, 'অলক্ষ্মী ফিরে এসেছে, ঘরের মধ্যেই রয়েছে,' কিন্তু তিনি কিছু বুঝতে না পেরে মানুষেরা যাকে বলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আমরা বেড়ালেরা আবার বেগুন জিনিসটা দুচোখে দেখতে পারি না, তাই আমরা ওরকম রেগে ওঠাকে বলি তেলে কইমাছ জ্বলে ওঠা। সে যা হোক জয়ন্তী দিদিমণি তাঁর পুরোনো খাটের উপর শুয়ে ছিলেন, আমি উঠে বসেছিলাম তাঁর মাথার কাছে। তিনি আমার ঘাড়টা খপ করে ধরে মেঝেয় ফেলে দিলেন। সাধারণত এরকমটা করেন না বরং কখনও কেউ আমাদের কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তিনি দুঃখিত হন, চটেও যান সেই ব্যক্তিটির উপর।

এই সময় আবার ঝুপ করে বিদ্যুতের আলো ফিরে এল। আলো আসতেই দিদিমণি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন, পাখার স্পিডটা বাড়াতে গিয়ে দেওয়ালের দিকে রেগুলেটারে হাত বাড়ালেন। এই সময় তাঁর চোখে পড়ল লোহার আলমারির মাথায় অলক্ষ্মী খুবই অমায়িক ও শান্তভাবে বসে রয়েছে।

জয়ন্তী দিদিমণি খুব খুশি হলেন, 'ওমা তুই কখন ফিরে এসেছিস। বুঝতেই পারিনি।' আলমারির ওপর থেকে এক লাফে নেমে এসে অলক্ষ্মী গা ঘষতে লাগল আর গরর-গরর করতে লাগল। নাম অলক্ষ্মী হলে কী হবে, অলক্ষ্মীটা আসলে হলো বেড়াল। আর এই হলো বেড়ালগুলো শয়তান হলে কী হবে ভীষণ আহ্লাদে হয়।

তখনই বোধহয় আমার কথা মনে পড়ল জয়ন্তী দিদিমণির। মেঝে থেকে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। একটু আগে খাট থেকে ফেলে দেওয়ায় অপমানে ও অভিমানে আমি মুখ ঘুরিয়ে মাথা নিচু করে বসে সব দেখছিলাম। কিন্তু দিদিমণির কোলে উঠে আর রাগ থাকে না। সেই কবে ছোটোবেলায় চোখ ফোটার পরে পরেই ওঁর কোলে চড়ে এ বাড়িতে এসেছি, তারপর ওঁর কোলে কোলেই বড়ো হয়েছি, বেড়াল হয়েছি। জয়ন্তী দিদিমণি ছাড়া আমার আর কে আছে।

জয়ন্তী দিদিমণি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, 'কিরে আনুমানু, রাগ করেছিস? একটু ঘড়র ঘড়র কর।' আমিও আহ্লাদে গলার রোঁয়া ফুলিয়ে ঘড়র ঘড়র করতে লাগলাম।

একটা আশ্চর্যের কথা, জয়ন্তী দিদিমণি আমাদের কারও কথা বুঝতে পারেন না কিন্তু মিউ মিউ ম্যাও ম্যাও শুনে বেশ ধরতে পারেন। অন্ধকারের মধ্যেও অথবা চোখের আড়াল থেকে চমৎকার বুঝতে পারেন আমরা কে কাঁদছি, কিংবা কিছু বলতে চাইছি। মাঝে মধ্যেই উনি ধমকে ওঠেন, 'এই ময়নামতী চুপ করবি কি না?' কিংবা, 'এই কেষ্টা, রাগ করিসনে, কাল তোকে মাছের মুড়োটা ঠিক দেব।'

আমাকে একটু আদর করে জয়ন্তী দিদিমণি আলগোছে মেঝেতে নামিয়ে দিলেন। তারপর পাখার রেগুলেটারটার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। দিদিমণি নিজে যে খুব ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া পছন্দ করেন তা নয়, কিন্তু ওঁর ধারণা আমাদের, বিশেষ করে কিসমিস আর পেস্তার কলকাতার গরমে খুবই কষ্ট হয়। তাই শীতের দু-এক মাস বাদ দিলে সারা বছর ধরেই যতক্ষণ লোডশেডিং থাকে না প্রায় সব সময়েই পাখাটা খুলে রাখেন। এমন কী বাড়িতে যখন থাকেন না, বাইরে থেকে তালা দিয়ে যান তখনও শোওয়ার ঘরের মধ্যে পাখাটা খুলে রেখে দিয়ে যান যাতে কিসমিস, পেস্তা এবং আমাদের আর সকলের গরমে কষ্ট না হয়। মাসের শেষে ইলেকট্রিক বিল আসে টাকার অঙ্কটা দেখে খুব খেপে যান, রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করে দেন, ইলেকট্রিক কোম্পানিকে চোর, ডাকাত, জোচ্চোর বলে গালাগাল করতে থাকেন। তারপর দু-চারদিন বেশ কৃপণতা করে পাখাটা খোলেন। কিন্তু আবার যে কে সেই, সারাদিন পাখাটা ঘুরছে তো ঘুরছেই।

আমাদের সবার কথাই আস্তে আস্তে বলব। কিন্তু প্রসঙ্গটা যখন উঠল কিসমিস আর পেস্তার কথাটা এইবেলা একটু বলে নিই।

২

কিসমিস আর পেস্তা হল ভাই আর বোন। ওরা হল কাবুলি বেড়াল। কিসমিস আর পেস্তা দুজনেই কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। ছোটোবেলায় এ বাড়িতে ওরা যখন প্রথম এসেছিল মনে হত দুটো দামি উলের বল বুঝি। একটা সাদা-কালো, আরেকটা খয়েরি-সোনালি। দুটোরই পায়ের থাবা থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত বাঘের মতো ডোরাকাটা। সাদা কালোটা হল হুলো বেড়াল, ওরই নাম কিসমিস আর খয়েরি সোনালিটা মেনি বেড়াল, ও হল আমাদের পেস্তা।

পেস্তা মেয়েটা খুবই নরম স্বভাবের, সব সময় বেশ একটা ডগমগ ডাগর ডাগর, ছোটোবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা একা খেলা করে কাটাত। সব

বেড়ালছানাই চমৎকার খেলা করে কিন্তু পেস্তার খেলা ছিল দেখার মতো। একবার একটা ফিকে নীল রঙের বাসের টিকিট, জয়ন্তী দিদিমণি ইস্কুল থেকে ফেরার টিকিটটা মেঝেতে পড়েছিল, পেস্তা সেই টিকিটটা নিয়ে কত রকম মজাই না করল। বাঁ পায়ের থাবা দিয়ে ডান পায়ের থাবায় তুলে নেয়, সেটাকে ঘিরে গোল হয়ে লাফায় আর বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে খেলা আর শেষ হয় না।

পেস্তা এখন বড়ো হয়েছে। ডাগর-ডোগর ফুলো ফুলো একটি সুন্দর বেড়াল, যে রকম বেড়ালের ছবি দোতলার চক্রবর্তীবাবুদের দেয়ালে টাঙানো আছে। পেস্তা যে দেখতেই সুন্দরী তাই নয়, তার ব্যবহারও খুবই ভালো।

কিসমিস কিন্তু একেবারে উল্টো। সেও দেখতে খুব সুন্দর, একথা কোনও মানুষ বা বেড়াল অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্রটি একেবারে পাজির পাঝাড়া। সেই যখন ছোটোটি ছিল, সেই তুলোর বলের যুগে সেই সময়ে একদিন বিনা কারণে আমার সামনের ডান পায়ের হাঁটুটায় হঠাৎ এমন কামড়ে দিয়েছিল যে এখনো শীতের দিনে খুব ঠাণ্ডা পড়লে হাঁটুটা কনকন করে।

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কিসমিস ঝগড়া, মারামারি করেছে। আমরা ইচ্ছে করলে ওকে দল বেঁধে মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি, কিন্তু দিদিমণি সেটা পছন্দ করেন না, তাই করি না।

কিন্তু কিসমিস আজকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মারামারি করে আসছে। পূর্ণ ঘোষের মিষ্টির দোকানের ডানকান ছেঁড়া যে গুণ্ডা হুলোটা, যার ভয়ে সব বেড়াল এমন কী কুকুরেরা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে, সেই গুণ্ডাটার সঙ্গে পরশুদিন শেষ রাতে উল্টো দিকের মিত্তিরদের বাড়ির রান্নাঘরের ছাদে কিসমিস কী লড়াইটা করল, দুজনের সে কী তর্জন গর্জন। সে কী মারামারি।

কিসমিসের কথা পরে বলছি, তার আগে যাই দুধভাতটা খেয়ে আসি। এই মাত্র জয়ন্তী দিদিমণি বারান্দায় সাতটা কাঁসার বাটিতে আমাদের সাতজনের দুধভাত দিয়েছেন, খুব খিদে লেগেছে, যাই খেয়ে আসি।

এখন আমরা সাতজনায় দুধ-ভাত খাচ্ছি। সাতজনায় না বলে আটজনায় বলা উচিত। কারণ জয়ন্তী দিদিমণি নিজেও রাতেরবেলা শুধু অল্প একটু দুধ-ভাত খান। তাছাড়া এমনিতে ওঁর নিজের খাওয়া-দাওয়া খুব কম।

জয়ন্তী দিদিমণি একটা কালো পাথরের বাটিতে দুধ-ভাত খাচ্ছেন মেঝের একপাশে একটা উলের আসনে বসে। সবচেয়ে মজার কথা ওই উলের আসনটাতে পর্যন্ত একটা নকশাকাটা বেড়ালের ছবি। বেড়ালটা খুব মজার দেখতে। এরকম বেড়াল আমরা জীবনে দেখি নি। নীল-লাল-কমলা-সবুজ চার রঙের চার পা। লেজটা কমলা আবার মাথাটা নীল, সেইসঙ্গে রঙের চারটে গোঁফ। বলা বাহুল্য,

এই চমৎকার বেড়ালটা জয়ন্তী দিদিমণির নিজের মনগড়া। দিদিমণি নিজের হাতে উল দিয়ে ওটা বুনেছেন। উনি যখন পশমের আসনটা বুনতেন, সে সময়ে অনবরতই কিসমিস ও পেস্তা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরত সামনের ডান পা-টা নীল হবে না লাল হবে, লেজটা আর লম্বা হতে পারে এই সব মজার ব্যাপার নিয়ে। দু-একদিন দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও হয়েছে এই মজার খেলা খেলতে গিয়ে।

জয়ন্তী দিদিমণি নিজে পাথরের বাটিতে খান কিন্তু আমরা সবাই, আমরা সাতজনাই খাই কাঁসার বাটিতে। আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বাটি। আর জয়ন্তী দিদিমণি আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন কিনা, আমার বাটিটাই সবচেয়ে বড়ো, একটা ভারি জামবাটি। এই জামবাটিটার গায়ে লেখা রয়েছে "হরিবালা"। বেশ গোটা অক্ষরে চারদিকে ফুল কেটে নাম লেখা। হরিবালা হল জয়ন্তী দিদিমণির শাশুড়ির নাম। অনেকদিনের পুরোনো বাসন এটা। জয়ন্তী দিদিমণির শাশুড়িকে আমরা তো দেখিইনি, জয়ন্তী দিদিমণি নিজেও দেখেননি। তাঁর বিয়ের আগেই সে মহিলা মারা গিয়েছিলেন। এই কাঁসার বাটিটা সংসারেই ছিল, এখন আমার দুধ খাওয়ার ভাগে পড়েছে।

আমার বাটিটা সব চেয়ে বড়ো বটে, জমকালোও খুব, কিন্তু আসল সুন্দর বাটিটা হল অলক্ষ্মীর। এই বাটিটা খুব বড় নয়, একেবারেই নিখুঁত পদ্মকাটা। আর কাঁসাটাও খুব ভালো একটু মাজলেই ঝকঝক করে।

এই পদ্মকাটা বাটিটা হল জয়ন্তী দিদিমণির ছেলে খোকার। খোকার অন্নপ্রাশনের বাটি এটা। খোকার অন্নপ্রাশন হয়েছিল অঘ্রান মাসে। সেই বছরেই পুজোর সময় বহরমপুরে বেড়াতে গিয়ে খাগড়ার একটা বাসনের দোকান থেকে জয়ন্তী দিদিমণির স্বামী এই বাটিটা কিনে আনেন। সেবার জয়ন্তী দিদিমণির বাইরে খাওয়া হয়নি। কারণ খোকা তখন খুব ছোটো। জয়ন্তী দিদিমণির বর খুব বেড়িয়ে মানুষ ছিলেন, সেবার পুজোয় একাই বেড়াতে গিয়েছিলেন।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন আমি জন্মাইনি। আমার মা-দিদিমাও জন্মায়নি। জয়ন্তী দিদিমণি একা ঘরে সারাক্ষণ আপন মনে বকবক করেন। সেই শুনে শুনে তাঁর সব ব্যাপার আমাদের সকলের আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তী দিদিমণির বর তো ওই বেড়াতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। সেই একবার কালীপুজোর আগের দিন দিল্লি থেকে কলকাতা আসছিল একটা ট্রেন, গয়ার কাছে একটা ব্রিজ ভেঙে চারটে কামরা নিচে পড়ে গিয়েছিল। কত লোক মারা গিয়েছিল তার কোনো হিসেব নেই। সেই কামরাতে জয়ন্তী দিদিমণির বর, জয়ন্তী দিদিমণির ছেলে খোকা আর তিনি নিজেও ছিলেন, খোকার এক কাকাও ছিল তাদের সঙ্গে সেই ট্রেনে।

সবাই মিলে জয়ন্তী দিদিমণিরা সেবার দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেবার শরৎকালে দিল্লি শহর খুব চমৎকার ছিল। খুব সুন্দর কেটেছিল পুজোর দিনগুলি দিল্লি কালীবাড়ির অতিথিশালায়। জয়ন্তী দিদিমণি মাঝে মাঝেই ওই দুর্ঘটনার কথাটা বলেন, আর বলেন "ওই সর্বনেশে কার্তিক মাসটা আমার শেষ আনন্দের সময়।"

ওই রেল দুর্ঘটনায় জয়ন্তী দিদিমণির স্বামী আর দেওর দুজনেই মারা গিয়েছিল। একদম থেঁতলে গিয়েছিল ওদের শরীর দুটো। শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। খুব আঘাত লেগেছিল জয়ন্তী দিদিমণিরও । এখনও উনি ভালো করে বাঁ হাতটা নাড়াচাড়া করতে পারেন না। কপালে যে লম্বা কাটা দাগটা কোনাকুনিভাবে কানের কাছে চলে গেছে সেটাও দুর্ঘটনার কীর্তি। গয়ার জেলা হাসপাতালে প্রায় এক মাস জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলেন।

আশ্চর্যের কথা খোকার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। ঘটনার সময় সে বাঙ্কের ওপর একটা বেডিং-এ ঘুমিয়ে ছিল। কামরার মধ্যে সেই বাঙ্কের মধ্যে আটকে পড়ে, কোথাও ছিটকে যায় নি। পরে রেলের আর পুলিশের লোকেরা জানলা কেটে খোকাকে সকলের সঙ্গে বের করে। তখন খোকার বয়স এগারো বছর। তার এই অলৌকিক রক্ষার কাহিনী সমস্ত কাগজে বেরিয়েছিল। দেড়মাস ধরে খোকা মায়ের মাথার কাছে হাসপাতালে টুলে বসে থাকত। কলকাতা থেকে আত্মীয়স্বজন ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু খোকা মাকে ফেলে আসতে চায়নি।

এসব দুঃখের কথা থাক।

এখন আমরা ঘুমোতে যাব। এইমাত্র জয়ন্তী দিদিমণি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জয়ন্তী দিদিমণি সারাদিন যতই বকবক করুন না কেন, ওঁর একটা বিশেষ সুবিধে আছে, উনি রাতে আলো নিভিয়ে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েন। আর পড়েছেন এটা সহজেই বোঝা যায় কারণ ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নামডাকা শুরু হয়। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়, দশ-পনেরো মিনিট, তারপর এক সময় নাকডাকা থেমে যায়, জয়ন্তী দিদিমণি ঘুমের অতলে ডুবে যান।

সারাদিন এত বকবক করেন বলেই বোধহয় দিদিমণির এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসে এবং ঘুমোলেই একেবারে রাত কাবার। ক্বচিৎ-কদাচিৎ রাতে ঘুম ভাঙে তাঁর।

দিদিমণির ঘুমিয়ে পড়ার পরে আমরা বেড়ালেরা কেউ কেউ কোনও কোনও দিন কিছু কিছু দুষ্টুমি খেলাধুলা করি। খুবই ছোটোখাটো ব্যাপার সব, হয়তো পেস্তা

আহ্লাদির কানে থাবা দিয়ে একটা চাপড় দিল কিংবা কিসমিস আমার লেজটা কামড়ে দিল, এইরকম আর কী। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে আমরাও যে যার মতো শুয়ে পড়ি।

আমাদের প্রত্যেকের যেমন আলাদা আলাদা খাওয়ার বাটি আছে, তেমনি প্রত্যেকের শোয়ার জায়গাও আলাদা।

আমি শুই জয়ন্তী দিদিমণির মাথার বালিশটার পিছনে। পেস্তা যখন ছোটো ছিল দিদিমণির কোলের কাছটায় শুতো, খুবই আহ্লাদি ছিল, কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে ঘড়র ঘড়র করত ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত। এখন পেস্তা একটু সেয়ানা হয়েছে। সবসময় দিদিমণির কোলের কাছে শুতে চায় না। ঘুমের মধ্যে জয়ন্তী দিদিমণি নিজের অজান্তেই হাত দিয়ে পেস্তাকে ধরে থাকেন, হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে গেলেই জয়ন্তী দিদিমণির ঘুম ভেঙে যায়, অমনি জোর করে ধরে আবার পেস্তাকে শুইয়ে দেন। তাই খুব ঠাণ্ডা না পড়লে বা হঠাৎ বৃষ্টিতে হিম হিম না হলে পেস্তা জয়ন্তী দিদিমণির কোল-ঘেঁষে শুতে চায় না, হাতের সীমানার বাইরে পায়ের কাছে গুটিসুটি দিয়ে পেস্তা শুয়ে থাকে, যাতে যখন ইচ্ছে উঠে পড়তে পারে।

অবশ্য পেস্তা যদি না ঘুমোয় জয়ন্তী দিদিমণির কোল খালি থাকে না। অলক্ষ্মী বলে বেড়ালটা দিদিমণিকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। একটা কথা হল এই যে প্রত্যেক দিনই শোয়ার আগে অলক্ষ্মী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে নেয় পেস্তা ওখানে শুচ্ছে কি না। পেস্তাকে ও খুব ভয় করে, কেন যেন!

শুধু পেস্তাকে নয়, কিসমিসকেও অলক্ষ্মী খুব ভয় করে। এই দুই কাবুলি ভাই-বোনকে আমরাও সবাই মনে মনে সমীহ করি কিন্তু অলক্ষ্মী সত্যিই রীতিমতো ডরায়।

একটা বিষয় এখন চুপচাপ জানিয়ে রাখি, আমাদের এই সাতজন বেড়ালের মধ্যে যেমন সবচেয়ে চালাক আমি, অলক্ষ্মী তেমনি সবচেয়ে বোকা। একবার পেস্তা পাশের বাড়ির কলতলা থেকে একটা বড়োমাছের কাঁটা নিয়ে এসেছিল। আমরা জয়ন্তী দিদিমণির কাছে ভরপেট দুবেলা খেতে পাই, তাই আমরা কেউ আশে পাশের বাড়িতে চুরি করতেও যাই না, এঁটোকাঁটার খোঁজেও যাই না। তবুও হাজার হোক, আমরা বেড়ালের জাত। আমাদের চামড়ার নিচে বইছে বেড়ালের রক্ত। মাছের গন্ধ পেলে আমরা একেবারে অস্থির হয়ে উঠি। গলির মধ্যে কোনো বাড়িতে যখনই কোনোদিন ইলিশমাছ ভাজা হয় অথবা শুঁটকি মাছের ঝাল, সেই ঘ্রাণে আমাদের রক্ত চনমন করে ওঠে। সেই গন্ধে আমরা কেউ কেউ হয়তো একটু ম্যাও ম্যাও করে কাঁদি কিন্তু তখনই অন্যের বাড়িতে মাছ চুরি করতে যাই না।

পেস্তা নিজেও আজকাল যায় না। কিন্তু তখন পেস্তা ছিল ছোটো। তখনও সে

শিক্ষিত হয়নি, ভদ্র হয়নি, আদব-কায়দা কিছুই শেখেনি। পাশের বাড়ির কলতলা থেকে এঁটো মাছের কাঁটা নিয়ে আসা যে কত বড়ো গর্হিত অপরাধ সে বোধ তখনও তার জন্মায়নি।

এদিকে অলক্ষ্মীও তখন বেশ বুনো রয়ে গেছে। পেস্তা যখন মাছের কাঁটাটা নিয়ে ঘরে ঢুকল, সে তখন ছুটল সেই কলতলায় আরও মাছের কাঁটা আছে কি না দেখবার জন্য। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, সে জায়গার এঁটো সমস্ত কাকেরা সাফ করে দিয়েছে। লোভী অলক্ষ্মী আশাহত হয়ে ঘরে ফিরে এল, তারপর কী ভেবে পেস্তাকে অল্পবয়েসি দেখেই বোধ হয় তার কাছ থেকে মাছের কাঁটাটা কেড়ে নিতে গেল।

এর পরে মুহূর্তের মধ্যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। অলক্ষ্মী পেস্তার মাছের কাঁটাটা তুলে নেবার জন্য যেই ডান পায়ের থাবাটা আলগোছে এগিয়ে দিয়েছে, ফ্যাঁস করে বিদ্যুৎ গতিতে সামনের দুটো পা তুলে মানুষের মতো পেস্তা উঠে দাঁড়াল। পেস্তার ভাই কিসমিস কাছেই আলনার পেছনে ঘুমিয়ে ছিল। বোনের ফ্যাঁস শুনে কিসমিস সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল। তখন ভাই-বোনে খুবই অন্তরঙ্গ। একসঙ্গে দুটো বাচ্চা বেড়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল অলক্ষ্মীর ওপরে।

কী হিংস্র চোখ-মুখ তাদের। কী তীব্রগতি। এই রকম আক্রমণের জন্যে অলক্ষ্মী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিসমিস, অলক্ষ্মীর একটা কান কামড়ে ধরল আর নাকের ওপর ধারাল নখ বসিয়ে দিল পেস্তা। এর মধ্যে আবার কেষ্টা নামে গোলমেলে বেড়ালটার অনেক দিন ধরেই কী কারণে যেন খুব রাগ ছিল অলক্ষ্মীর ওপর, সেও অতর্কিতে অলক্ষ্মীকে আক্রমণ করল।

ওদের চেঁচমেচি শুনে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে ছুটে এলেন জয়ন্তী দিদিমণি। অনেক চেষ্টা করে খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে ওদের ঝগড়া থামালেন। তখন অলক্ষ্মীর নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। অনেক রাগারাগি করে তারপর জয়ন্তী দিদিমণি অলক্ষ্মীর নাকে কী একটা লালমতো ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। তাতে অলক্ষ্মীর জ্বালা আরও বেড়ে গেল।

সেই থেকে অলক্ষ্মী পারতপক্ষে পেস্তাকে ঘাঁটায় না, যদি দেখে পেস্তা জয়ন্তী দিদিমণির কোলে শুয়ে রয়েছে ও বিছানার কোনো একপাশে শুয়ে থাকে।

আমরা এই তিনজন বিছানায় শুই। বাকিদের মধ্যে আহ্লাদি শোয় জয়ন্তী দিদিমণির চেয়ারে। অবশ্য চেয়ারে শোয়া নিয়ে কেষ্টার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার গোলমাল হয়। তখন সে শুয়ে থাকে খাটের নিচে দড়ির পাপোষে। কিসমিসের শুধু শোয়ার কোনো ঠিক জায়গা নেই। কখনও আলমারির মাথার ওপরে, কখনও আলনার পাশে, আর আজকালতো রাতে অনেক সময় বাড়িতেই থাকে না।

বাইরে বেরিয়ে যায় মারামারি করতে। একটু আগেই গুটিসুটি বেরিয়ে কোন চুলোয় লড়াই করতে গেল কে জানে?

এছাড়া আরও একজন আছে সে হল সাত নম্বর। সে হুবহু আমার মতো দেখতে। শুধু আমার ডান কানটা সাদা আর তার বাঁ কানটা, আর সব এক রকম। সেই ছোটোবেলা থেকে তাকে দেখে আসছি। আমি যখন খাই সে তখন খায়, আমারই মতো একটা বড়ো জামবাটিতে। আমি যখন ঘুমোই সেও তখন ঘুমোয়।

আমার নাম আনুমানু। আর আমি তার নাম দিয়েছি মানুআনু।

৩

আজ সকাল থেকে গোলমাল চলছে। কিসমিসকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আসলে কিসমিসকে যে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, তা নয়। কাল রাত থেকেই কিসমিস নিরুদ্দেশ। সেই রাতেরবেলা আলো বন্ধ করে জয়ন্তী দিদিমণি যেই শুয়ে পড়লেন অমনি অন্ধকারের মধ্যে আলমারির মাথা থেকে বাইরের জানলা গলে সে রাস্তায় চলে গেল।

অবশ্য এই প্রথম নয়। আগে কেষ্টা বেড়ালটাও খুব পালাত। আজকাল বুড়ো থুড়থুড়ে, যতক্ষণ পারে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কেষ্টা অধিকাংশ সময়ে একটু গরম মতো জায়গা বেছে নিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে।

কিন্তু কিসমিস তো বুড়ো নয়, কিসমিস হল একটা টগবগে তাজা কাবুলি হুলো বেড়াল। তার এখন রক্ত গরম। এই সেদিন। মাত্র বছর দুয়েক আগে দুটো বড়ো সাইজের কদম ফুলের মতো দুটো বেড়ালছানা এল। দুটোই এর মধ্যে বিরাট বড়ো হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার কিসমিস ছেলে বলেই বোধ হয়, খুবই প্রকাণ্ড হয়েছে। পেস্তা ততটা বাড়েনি। পেস্তা তবু চমৎকার একটা ফুলোফুলো মেনি বেড়াল হয়েছে। আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। আমাদের মধ্যে আকারে-আয়তনে কাউকে যদি বাঘের মাসি বলা চলে তাহলে সে হল পেস্তা। খয়েরি-সোনালি লোমের সঙ্গে সারা গায়ে বাঘের মতো ডোরাকাটা। সত্যি পেস্তা বাঘের মাসি।

আর বাঘের মামা হল কিসমিস। বোনের মতো সোনালি লোম সে পায়নি। সারা গায়ে সাদা কালো কিন্তু তাও বাঘের মতোই ডোরাকাটা, আর বাঘের মতোই সাহসী আর হিংস্র ভাব দেখায় সে। এক এক সময় তার ব্যবহার দেখে মনে হয় সে আমাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। শুধু কখনও যখন জয়ন্তী দিদিমণির আয়না লাগানো আলমারির সামনে দিয়ে যায় কেন যেন মানুআনুর ওপর খুব খেপে যায়। আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে মানুআনুর ওপর রাগে গরগর করতে থাকে। আমি কতবার বুঝিয়ে বলেছি কিসমিসকে, আয়নার মধ্যে মানুআনু আছে,

সে আমার খুব বন্ধু, খুব ভালো বেড়াল। কিন্তু কে কার কথা শোনে। আয়নার মধ্যে মানুআনুকে দেখলেই সে তেড়ে যায়।

কিসমিসের প্রধান বদমায়েশি হল বাড়ির বাইরে। পাড়া বেপাড়ায় যত সর্দার বেড়াল, হুলো বেড়াল আছে, তাদের সকলের সঙ্গেই তার ঝগড়া।

আর সে কী ঝগড়া। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি ব্যাপার। কিন্তু যাই করুক, কিসমিস কোনও দিন সারারাত বাইরে থাকেনি। ভোর হওয়ার আগেই প্রথম কাক-পক্ষীটি ডেকেছে কী ডাকেনি, রাস্তার শেষ প্রান্তে খাটালটায় যখন সবে মোষ দোয়ানো শুরু হয়েছে লণ্ঠন জ্বেলে, সেইরকম সময়ে কিসমিস নিঃশব্দে, সন্তর্পণে ফিরে আসে। এই তো পরশু দিন শেষ রাতে এল, সারা গায়ে মাছের আঁশটে গন্ধ। কাঁচা মাছের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম নিশ্চয়ই গড়িয়াহাটে মাছের বাজারের গুণ্ডা বেড়ালগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল।

সে তো খুব ভালো। সকাল হওয়ার মধ্যেই ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সকাল সাতটা বেজে গেল, আটটা-নটা, জয়ন্তী দিদিমণিরই স্কুলের সময় হয়ে এল, তবু কিসমিসের ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

জয়ন্তী দিদিমণি তো জানেন না যে কিসমিস প্রায় প্রত্যেক রাতেই বাইরে পালিয়ে যায়, তাঁর এখনও ধারণা তাঁর কিসমিস বুঝি সেই আলুথালু, গোলগাল, আপনভোলা বেড়ালছানাটিই রয়ে গেছে। সে যে এই দুবছরে কত বড়ো শয়তান, বদমাশ হয়েছে, তিনি জানবেন কি করে? তিনি তো সারারাত অঘোরে ঘুমোন, সেই সময়ই চলে কিসমিসের রাজত্ব, অবৈধ সব কীর্তিকলাপ।

অন্যান্য দিনের মতো আজকে সকালেও সকলকে আলাদা আলাদা বাটিতে খেতে দেওয়া হয়েছিল। রাতের মতো সকালেও আমরা দুধ খাই। তবে আমরা রাতে খাই দুধ ভাত, আর সকালবেলায় খাই দুধ মুড়ি। দুপুরবেলা অবশ্য আমাদের একটু মাছ দেওয়া হয়। ঠিক মাছ নয়, বাজার থেকে অল্প একটু মাছের কাঁটা নিয়ে আসে তারু নামে ছোটো কাজের ছেলেটা। সেই আলাদা করে একটা মাটির হাঁড়িতে চালের সঙ্গে সেটা সেদ্ধ করে দেয়, ছোটো একটা মাটির উনুনে। বারান্দায় একপাশে রান্না হয় সেটা। জয়ন্তী দিদিমণির নিরামিষ। তিনি খুব বিপদে না পড়লে এঁটোকাঁটা ছুঁতে চান না। তাই আমাদের মাছের ব্যাপারটা তারুই সব করে।

তা দুপুরবেলার খাওয়ার সময় আমাদের প্রায় হয়ে এল। জয়ন্তী দিদিমণির ইস্কুলে বেরনোর একটু পরেই তারু আমাদের বারান্দায় খেতে দেয়। মাছের ব্যাপার আছে তাই দুপুরবেলার খাওয়াটা বারান্দায় হয়, ঘরের ভিতরে করা হয় না। কিন্তু আজ দুপুরবেলার খাওয়া আমাদের মাথায় উঠেছে, জয়ন্তী দিদিমণির ইস্কুল যাওয়াও মাথায় উঠেছে।

ঠিক সকাল সাতটায় যখন ট্রাম রাস্তার ওপাশে পার্কটার গায়ে ছোটো প্রাইমারি ইস্কুলটায় বসার ঘন্টা বাজে তখনই আমাদের সকালবেলার দুধমুড়ি দেওয়া হয়, আজও হয়েছে। আজকে যখন দেখা গেল একটা বাটির দুধমুড়ি খাওয়ার বেড়াল নেই, তখনই খোঁজ খোঁজ। এবং তখনই জানা গেল কিসমিস বেপাত্তা। এরপর অনেক খোঁজ করা হয়েছে কিসমিসের। সামনে চারতলা বাড়ির চিলেকোঠার ওপরে উঠে চারিদিকের সমস্ত বাড়িঘর ছাদ-কার্নিশ আনাচ-কানাচ উঁকি দিয়ে খুঁজেছে তারু। জয়ন্তী দিদিমণি নিজেও দুবার ছোটো বেঁটে কালো ছাতাটা মাথায় বাড়ির সামনের রাস্তার দুদিকে দুই চৌমাথা পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন।

প্রত্যেকদিন সকালে এক ঘণ্টার জন্যে দুটো মেয়ে, দুজনেই এবার মাধ্যমিক দেবে, ইংরেজিতে কাঁচা, তারা জয়ন্তীদির কাছে ইংরেজি পড়তে আসে। সেই দুটো মেয়ে কল্যাণী তার জয়তী তাদেরও আজ পড়াশুনো হল না। তারা এগলি, সেগলি পাড়ার সর্বত্র তন্নতন্ন করে কিসমিসকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে বাড়ি ফিরে এল।

জয়ন্তী দিদিমণিও ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে শেষে কপালে হাত দিয়ে বিছানার উপর বসে পড়লেন। কী যেন বুঝে পেস্তাও কোলের ওপর গিয়ে বসল। পেস্তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়ন্তী দিদিমণি বার বার নরম গলায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'কিরে তোর দাদা কোথায় গেল? কোথায় গেল তোর দাদা?'

ঠিক এই সময় বাইরের দরজায় একটা সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল। কে যেন ভারি গলায় বলল, 'জয়ন্তী রায়চৌধুরীর টেলিগ্রাম।'

জয়ন্তী দিদিমণি এতক্ষণ ঝিম মেরে বসেছিলেন আর পেস্তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিড়বিড় করছিলেন। হঠাৎ 'টেলিগ্রাম' শুনে হকচকিয়ে ছুটে গিয়ে বাইরের দরজাটা খুললেন। তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে।

বাইরে একজন রোগামতোন লোক, বোধহয় তিনচার দিন দাড়ি কামায়নি, একটা সাইকেলের সিটে বসে আছে। একটা পা সামনের সিঁড়িটায় আটকে ধরে আছে বলে সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছে না। লোকটার গায়ে একটা ময়লা খাকি জামা, তার হাত ভরতি অনেকগুলো খাম। লোকটা নিশ্চয় জয়ন্তীদিকে চেনে, জয়ন্তীদি দরজা খুলতেই সে একটি খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদিমণি আপনার একটা টেলিগ্রাম।'

টেলিগ্রামটা নিয়ে সঙ্গে সই করার রসিদের কাগজটা, জয়ন্তীদি ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন চশমা আর কলম খুঁজতে। কলমটা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ছিল সেখানে পেয়ে গেলেন। চশমাটাও সাধারণত সেখানেই থাকে কিন্তু আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও চশমাটা কিছুতেই পেলেন না। রাস্তায় টেলিগ্রামের লোকটি একটু

দেরি হতেই অস্থির হয়ে সাইকেলের ঘণ্টা ক্রিংক্রিং করতে লাগল। রসিদের কাগজটা হাতে নিয়ে বাইরে গিয়ে জয়ন্তীদি বললেন, 'আমি যে আমার চশমাটা খুঁজে পাচ্ছিনে। সই করব কী করে?' ঘণ্টি বাজানো লোকটি রসিদের কাগজটি হাতে নিয়ে বলল, 'আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি সেখানে সই করুন। যা হয় একটু করলেই হল। আমি তো আপনাকে চিনি।'

জয়ন্তীদির নিজের কলমটা হাতেই রইল, ওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে লোকটার হাতের ভোঁতা পেন্সিলটা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কোনও রকমে একটা দায়সারা সই করে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে এলেন।

তখনও তাঁর হাত কাঁপছে। কাঁপা হাতেই টেলিগ্রামের খামটা খুব যত্ন করে খুললেন। কিন্তু তখন খেয়াল হল, পড়বেন কী করে, চশমাটাই যে খুঁজে পাচ্ছেন না।

জয়ন্তী দিদিমণি যে চোখে খুব কম দেখেন তা কিন্তু নয়। লেখাপড়া করা তাছাড়া অন্য কাজে তাঁর চশমা বিশেষ দরকার পড়ে না। কিন্তু আজ অহেতুক উত্তেজনার জন্যেই হোক অথবা অতিরিক্তি ক্লান্তির জন্যেই হোক তিনি একবারও ভাবতে পারছেন না যে চশমা ছাড়াই টেলিগ্রামটা পড়তে পারবেন।

জয়ন্তী দিদিমণি অনেকক্ষণ ঝাপসা চোখে খাম থেকে বার করা কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, আনুমানু এটা কি খোকার টেলিগ্রাম? খোকার কি কিছু হয়েছে?'

আমি আর কী করব জয়ন্তীদি যে আমার কথা বুঝতে পারবেন না, আমি শুধু দুবার মিউ মিউ করলাম।

জয়ন্তী দিদিমণি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, আনুমানু, কাগজে যে পড়লাম বিলেতে টেলিগ্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, আমেরিকাতে কি টেলিগ্রাম বন্ধ হয়নি?'

কিছুক্ষণ এইরকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে তারপর জয়ন্তী দিদিমণির ঠাণ্ডা বুদ্ধিটা ফিরে এল। এই এলোমেলো অবস্থার মধ্যে তারু মানে সেই বাচ্চা চাকরটা, কখন এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, তাকে জয়ন্তীদি বললেন, 'এই তারু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না ওপরে উঠে দ্যাখ ত দামু অফিস চলে গেছে কি না?'

আমাদের এই বাড়ির বাড়িওয়ালা নরেশবাবু দুতিন বছর আগে মারা গেছেন, তাঁর স্ত্রী এখন থাকেন একমাত্র মেয়ের কাছে পাটনায়। দোতলা ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে প্রায় একলা থাকে ললিতা, নরেশবাবুর ভাগিনেয়ী, রেলের অফিসে কাজ করে। তারই ডাক নাম দামু। কালো, লম্বা, হাসিখুশি, ঝলমলে মেয়েটি, তার

অনেক গুণ, কিন্তু একটা মারাত্মক দোষ আমাদের একদম সহ্য করতে পারে না, বেড়ালদের দেখলে ওর মাথা গরম হয়ে যায়। আমরা যে কেউই প্রায় কখনই দোতলায় উঠি না তার একটা কারণ দামু আমাদের দেখলেই গায়ে জল ছুঁড়ে দেয়। আর আমরা বেড়ালেরা গায়ে জল লাগাটা মোটেই পছন্দ করি না। আমাদের পছন্দ উনুন, আগুন, তাপ, উত্তাপ, ওম, গরম। জল, বরফ, ঠাণ্ডা, বৃষ্টি এসব আমাদের ধাতে একদম সয় না।

দামুর নাম শুনেই পেস্তা আর অলক্ষ্মী এক লাফে আলমারিটার মাথার উপরে উঠে আশ্রয় নিল। এমনকি অথর্ব বুড়ো কেষ্টাটা জানলা গলিয়ে সুট করে পালিয়ে রাস্তায় ফুটপাথে গিয়ে নামল। আমি অবশ্য এত সহজে ভয় পাওয়ার বেড়াল নই, কিন্তু বাকি যারা ঘরের মধ্যে রইল তারাও কেমন ভয়ে সিঁটকিয়ে গেল।

অবশ্য দামুর টেলিগ্রাম পড়তে আসার কোনো দরকারই ছিল না। পেস্তা যেই লাফ দিয়ে আলমারির মাথার উপরে উঠেছে তখনই দেখা গেল বিছানার মধ্যে পেস্তার শরীরের নিচে এতক্ষণ জয়ন্তীদির চশমাটা ঢাকা পড়েছিল। পেস্তা সরে যেতেই সোনালি ফ্রেমের চশমাটা আমি দেখতে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মিয়াঁও মিঁয়াও' করে জয়ন্তীদিকে জানালাম।

কিন্তু জয়ন্তীদি ঘুরেও তাকালেন না। তাঁর চোখ দোতলার সিঁড়ির দিকে, দামুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু দামু নেই। দামু অফিস চলে গেছে। তারু ফিরে এল, 'দামুদিদি অনেকক্ষণ অফিস চলে গেছে।'

আর কোনও উপায় না দেখে, জয়ন্তীদি বোধহয় টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এবার বাইরে যাচ্ছিলেন, অন্য কাউকে দিয়ে তারটা পড়িয়ে নিতে। সেই মুহূর্তে মাথা ঘোরাতে গিয়ে বিছানার ওপরে চশমাটা তাঁর নজরে এল। তাড়াতাড়ি তিনি চশমাটা তুলে নিয়ে চোখের উপরে গলিয়ে দিলেন, তারপর দ্রুতগতিতে তারটার ওপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!

আর ঠিক তখনই বারান্দায় শোনা গেল কর্কশ হুলো কণ্ঠের 'ম্যাও, ম্যাও ম্যাও'। আমরা সবাই বুঝলাম কিসমিস ফিরে এল।

জয়ন্তী দিদিমণি যে টেলিগ্রামটা পেয়েছেন সেটায় কী লেখা আছে আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু জয়ন্তী দিদিমণি টেলিগ্রামটা পেয়ে বেশ উত্তেজিত, একবার করে চশমা খুলছেন আবার পরক্ষণেই চোখে লাগিয়ে নিয়ে টেলিগ্রামটা আবার পড়ছে। বাচ্চা মেয়ের মতো এই রকম বারবার করতে লাগলেন, বারবার টেলিগ্রামটা পড়তে লাগলেন।

. জয়ন্তীদি খেয়ালই করলেন না তাঁর অতি সাধের কিসমিস, হারিয়ে যাওয়া

পলাতক কিসমিস, যাকে সকাল থেকে খুঁজে খুঁজে তিনি হয়রান হয়ে গিয়েছেন, সেই কিসমিস ইতিমধ্যে একা একাই ফিরে এসেছে, ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিসমিস বেশ বুঝতে পেরেছে যে সে বড়ো একটা অন্যায় করে ফেলেছে। তাই ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার অতি কর্কশ গলাটা যথাসাধ্য আলতো করে ম্যাও-ম্যাও করতে করতে এল। এই নিচু গলায় 'ম্যাও-ম্যাও' এর মানে হল দুরকম। এক আমি ফিরে এসেছি, দুই খুব খিদে পেয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে কিসমিস জয়ন্তীদির পায়ের কাছে গিয়ে মাথাটা ঘষতে লাগল।

রণক্লান্ত কিসমিসের চেহারা আজ দেখবার মতো। সারাগায়ে ছাই আর কালি মাখা। বোধহয় কোনো রান্নাঘরের পিছনে কয়লার উনুনের ছাইগাদায় খুব জাপটাজাপটি করে লড়াই করেছে আর একটা হুলোর সঙ্গে। সেই হুলোটার শরীরের ছেঁড়া ছেঁড়া হলুদ লোম ওর শরীরে লেগে রয়েছে। কিসমিসের গায়ের সাদা কালোর ডোরার ওপরে সেই লোমগুলো ঝকমক করছে। এদিকে ঠোঁটের বাঁ দিকটায় টাটকা আঁচড়ের দাগ আর পিঠে বুকে অন্তত তিন জায়গায় কামড়াকামড়িতে লোম উঠে গেছে, খিদেয় পেট পিঠের সঙ্গে লেগে রয়েছে।

প্রায় নির্জীব কণ্ঠে ম্যাও-মাও করতে করতে কিসমিস যখন অনেকক্ষণ জয়ন্তী দিদিমণির পায়ে মাথা ঘষছে তখন হঠাৎ জয়ন্তী দিদিমণির খেয়াল হল কিসমিস ফিরেছে। সে তাঁরই পায়ের নিচে আছে।

নোংরা ময়লা, বাড়ি-পালানো কিসমিসকে কোলে তুলে নিলেন জয়ন্তদি। তাঁর সাদা শাড়িতে কিসমিসের গায়ের ছাই, কালি লেগে গেল, তিনি আস্তে আস্তে কিসমিসের মোটা মাথাটা চাপড়াতে লাগলেন, 'বোকা পাগল কোথায় গিয়েছিলি? এতবড়ো সকালটায় কি খেলি?' এত আদরে কিসমিস গরগর করতে লাগল, ছোটোবেলায় যেমন আহ্লাদেপনা করত সেই রকম জয়ন্তী দিদিমণির কোলে শুয়ে ফুলঝাড়ুর মতো মোটা লেজটা ধীরে ধীরে নাচাতে লাগল।

এদিকে খিদেয় আমাদের সকলের পেট চোঁ-চোঁ করছে। বুড়ো বেড়ালটা, যে দামুর ভয়ে ফুটপাথে চলে গিয়েছিল সে তো ঘরে ফিরে এসে ছোটো বেড়ালছানার মতো ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

একদিকে টেলিগ্রাম অন্যদিকে কিসমিসের ফিরে আসা। জয়ন্তীদি কিছুক্ষণের জন্যে কেমন যেন ছাড়া ছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন, অল্পে অল্পে তাঁর বিহ্বল অবস্থাটা কাটল।

জয়ন্তদি তারুকে ডেকে বললেন, 'এই তারু এদের তো কারও দুপুরবেলা খাওয়া হয়নি। মাছও তো আনিস নি।' তারু জবাব দিল, 'আপনি সকাল থেকে

বেড়াল খোঁজা নিয়ে যা হন্যে হয়ে রইলেন, কখন আর বাজারে যাব। অনেকদিন ইস্কুল মাস্টারি করে মুখের উপরে কথাবলা জয়ন্তীদি একেবারে সহ্য করতে পারেন না। যদিও তারু সত্যি কথাই বলেছে, জয়ন্তীদি তাকে খেঁকিয়ে উঠলেন 'নে নে, খালি বাজে কথা।' তারপর একটু থেমে কী ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুই এখন এদের সবাইকে একটু করে দুধভাত দে। কিসমিসটা সকালে খায়নি ওর বাটিতে একটু বেশি দিস।'

জয়ন্তীদি ঠিক এই করেই কিসমিসটাকে নষ্ট করেছেন। সারা রাত, সারা সকাল কিসমিস বদমায়েশি করল, এখন কিসমিস জয়ন্তীদির কোলে উঠে আদর খাচ্ছে পরে দুধভাতও সবচেয়ে বেশি পাবে। এর জন্যে উচিত ছিল ওকে শাসন করা, চাবুক দিয়ে মারা, অন্তত জালের আলমারির মধ্যে একদিন তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা।

তারু অবশ্য এত সহজে খাবার দেওয়ার ছেলে নয়। সে একটা আপত্তি তুলল, এখন দুধ খেলে রাতে খাবে কি? দুধ তো আর বেশি নেই। তার চেয়ে ওদের শুধু ভাত দিই।'

তারুর এরকম কথা শুনলে আমাদের পিত্তি জ্বলে যায়, লেজের রক্ত মাথায় উঠে আসে। বেড়ালেরা কখনও শুধু ভাত খেয়েছে? জয়ন্তীদি অবশ্য তারুর কথায় পাত্তা দিলেন না। বললেন, 'তুমি, এখন যা বলছি করো, এদের দুধভাত দাও। রাতে বরং ওরা মাছ খাবে। বিকেলে বাজার থেকে একটু মাছ নিয়ে এসো তাহলেই হবে।'

৪

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে জয়ন্তীদি বিছনায় শুয়ে পড়লেন। তারপর হাত থেকে চশমাটা চোখে লাগিয়ে শুয়ে শুয়ে আগের মতোই বারবার টেলিগ্রামটা পড়তে লাগলেন। একটু পরে তাঁর চোখ বুজে এল, বিছানায় একটু কাত হয়ে গেলেন। চোখের উপর থেকে চশমাটা নাকের নিচে গড়িয়ে পড়ল, একটু একটু নাক ডাকতে লাগল। তখনও জয়ন্তীদির হাতের মধ্যে টেলিগ্রামটা ধরা রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে তারু আমাদের খেতে দিল। দুধভাতই দিল। কিন্তু জয়ন্তী দিদিমণি যে বলেছিলেন কিসমিসকে একটু বেশি করে দিতে, তারু তা দেয়নি। যেমন কিসমিস বদমাশ, তেমনি তারু পাজি। তবে একটা কথা, কিসমিস দুধভাতটুকু পুরোপুরি খেল না। প্লেট থেকে আলগা করে দুধটা চেটে চেটে কিছুটা খেল, কিন্তু ভাতের একটা দানাও খেল না। এদিকে কেষ্টাটা যত বুড়ো হচ্ছে তত তার লোভ বাড়ছে। নিজেরটা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখল কিসমিস দুধটা খেয়ে

ভাতটা ফেলে গেছে, একটু ঝিম মেরে বসে অপেক্ষা করল কখন কিসমিস সরে যায়। আসলে ও সত্যি সত্যি কিসমিসকে খুব ভয় করে কিনা তাই কিসমিসের ফেলে দেওয়া ভাতটা তার সামনে খাওয়ার ওর সাহস নেই।

কিসমিস কিন্তু আপনমনে সামান্য দুধটুকু খেয়ে দরজার পাশে পাপোষটার ওপরে গিয়ে নিজের পরিচর্যা করতে লাগল। আমরা বেড়ালেরা নিজের নিজের শরীরের খুবই যত্ন নিই। কিসমিসের বোন পেন্সা তো রাতদিন নিজেকে চেটে চেটে ঝকঝকে করে রাখছে। কিসমিস নিজে অবশ্য প্রসাধনে ততটা মনোযোগী নয়। কিন্তু কাল রাত থেকে আজ এতটা বেলা পর্যন্ত লড়াই ও মারামারিতে তার শরীরের ওপর দিয়ে যে ঝড়-ঝাপটা গেছে, এখন আপনমনে সে তার ক্ষতিপূরণে ব্যস্ত হল। গোলাপি জিব দিয়ে চেটে চেটে ডান থাবা দিয়ে নিজের মুখটা মুছে পরিষ্কার করতে লাগল।

এরমধ্যে আমরাও যে যার মতো এদিক-ওদিক শুয়ে পড়েছি। শুধ্ অলক্ষ্মী বাথরুম করতে পাশের বাড়ির ছাদে চলে গেছে। সেখানে বাড়ি-সারানোর জন্যে অনেকটা বালি ছাদের এক পাশে অনেকদিন হল রাখা আছে। আজ কিছুদিন হল আমরা প্রায় সবাই ওইখানে গিয়ে বাথরুম করি তারপর পা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে বাথরুমের জায়গাটা বালি চাপা দিয়ে আসি।

এক ফাঁকে সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে কেষ্টা গুটি গুটি এগিয়ে কিসমিসের ফেলে আসা ভাতটা খেতে গেছে এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

এমনিতো সাধারণত এ বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ থাকে না, শুধু দুপুরবেলা যখন সবাই অফিসে থাকে, মানে, কাজের দিনে, আর রাত দশটা এগারোটার পরে সামনের দরজাটা খিল দিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ সময় তারুই এটা করে, আজও জয়ন্তী দিদিমণি যখন ইস্কুল যাননি বাসাতেই আছেন, তবু তারু মাতব্বরি করে সদর দরজাটায় খিল দিয়ে দিয়েছে।

জয়ন্তীদির আজ স্নান হয়নি খাওয়া হয়নি। ইস্কুলে যাওয়া হয়নি। সেই যে টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লেন, দু-একবার তারু ডেকেছিল তিনি শুধু হুঁ হুঁ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিলেন। তারু আর ওঁকে বিরক্ত করেনি।

আমাদের খাওয়া দাওয়ার শেষে এইমাত্র তারু তার গামছাটা নিয়ে ফুটপাথের ওপারের চাপা কলটায় স্নান করতে যাচ্ছিল, এমন সময় কড়াটা বেজে উঠল।

কেষ্টা কিসমিসের ফেলা ভাতটা খাচ্ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব গবগব করে ভাতটা গিলতে লাগল। আর এদিকে তারু তো বেরুচ্ছিলই, সে গিয়ে সামনের দরজার খিলটা খুলে দিল।

আমি বারান্দার মাঝামাঝি এগিয়ে গেলাম, উঁকি দিয়ে দেখতে কে আসছে, আর সে আমাদেরই এখানে আসছে কি না।

তাকিয়ে দেখলাম, জয়ন্তী দিদিমণির সেই ফাজিল ভাইপো নাণ্টু আসছে। খুবই অবাক হলাম, কারণ নাণ্টু কখনই এরকম অসময়ে আসে না। কখনও কখনও ছুটির দিনের বা রবিবারের সকালে সন্ধ্যায় পিসিকে এসে একটু জ্বালিয়ে যায়, ব্যস এই পর্যন্ত।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এইমাত্র তারু প্যাসেজের দরজাটা খুলে দিয়েছে। তারুর গলার স্বর শোনা গেল, 'ও নাণ্টুদা, তোমার বড়োপিসি কিন্তু ঘুমিয়ে রয়েছে।' আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ফাজিল নাণ্টু একটা বড়ো সিগারেটে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্যাসেজের মধ্যে এল, তারপর একটা ধোঁয়ার আংটি তারুর দিকে ছুড়ে দিয়ে দুবার বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ।' এরপরে সিগারেটে জোরে আরও দুটো টান দিয়ে সেটা প্যাসেজে ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল। এবার পকেট থকে রুমাল বার করে মুখটা ভালো করে মুছে বাড়ির মধ্যের বারান্দা দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এল।

বারান্দা দিয়ে আসার সময় অবশ্য নাণ্টু একটা বাজে কাজ করল যা সে প্রায়ই করে থাকে। হঠাৎ জুতোর ডগা দিয়ে কিসমিসকে একটা খোঁচা দিয়ে বেড়ালের মতো মানে আমাদের মতো গলা করে বলল, 'ম্যাও।'

কিসমিস এ ধরনের ইয়ার্কি বরদাস্ত করার ছেলে নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে লেজ খাড়া করে সামনের থাবা দুটো উচিয়ে ফোঁস করে উঠল। নাণ্টু তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে না নিলে ঠিক আঁচড়ে দিত।

কিসমিসের আক্রমণ বাঁচিয়ে নাণ্টু কোনওমতে ঘরের মধ্যে এল। নাণ্টুর কড়া নাড়ায় কিংবা তারুর সঙ্গে কথাবার্তায় জয়ন্তীদির ঘুম ভাঙেনি কিন্তু কিসমিসের সামান্য ফোঁস শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি বিছানায় উঠে বসে দেখলেন, নাণ্টু এসেছে।

পিসিকে দেখে নাণ্টু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল, সেটা মনে হল একটা টেলিগ্রাম। তারপর সে দেখতে পেল তার পিসির হাতের কাছেও একটা টেলিগ্রাম রয়েছে। নাণ্টু বলল, 'ও তোমার কাছেও টেলিগ্রাম এসেছে। আমি টেলিগ্রামটা পেয়ে তোমার স্কুলে গিয়ে দেখি তুমি নেই। মেয়েরা, দিদিমণিরা তুমি আসনি দেখে ধেই ধেই করে আনন্দে নাচছে।'

জয়ন্তীদি নাণ্টুর হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একবার পড়লেন তারপর নিজের টেলিগ্রামটা একবার পড়লেন। শেষে কেমন অন্যমনস্কভাবে নাণ্টুর কথার খেই ধরে বললেন, 'আমি ইস্কুলে না যাওয়ায় সবাই বুঝি খুব খুশি।

৫

আমার নাম আনুমানু।

আমি হলাম গিয়ে জয়ন্তী দিদিমণির সবচেয়ে আহ্লাদি বেড়াল। ওঁর সাত বেড়ালের মধ্যে আমিই হলাম এক নম্বর।

এই গল্পটা বলা আরম্ভ করেছিলাম আমার কথা শোনাব বলে কিন্তু তখন থেকে কেবল জয়ন্তীদির কথাই হচ্ছে, আমার নিজের কথা আর কিছু বলাই হচ্ছে না।

তবে দোষটা তো আমারই। আমি নিজেই জট পাকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কী করব তোমরাই বল? একদিকে কিসমিসটা পালিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিল আর আরেক দিকে দু-দুটো টেলিগ্রাম এসে গেল।

সে যা হোক, জয়ন্তী দিদিমণি এখন তাঁর ভাইপো নাণ্টুর সঙ্গে কী সব জরুরি কথাবার্তা বলছেন এই সুযোগে নিজের কথাটা একটু বলে নিই।

আমার নাম আনুমানু।

আমি আসলে এ গলির বেড়াল নই। এই যে কল্যাণী নামে ফর্সা গোলগাল মেয়েটা প্রত্যেকদিন সকালবেলায় জয়ন্তীদির কাছে ইংরেজি শিখতে আসে আমি ওদের বাইরের ঘরে সোফার ওপরে জন্মেছিলাম।

জন্মানোর কথা আমার ঠিক মনে নেই, তবে চোখ ফোটার পর মনে আছে আমরা চার ভাই-বোন মিলে একটা বড়ো দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছিলাম। সেই ঘরটায় দুটো বড়ো বড়ো কাঠের র‍্যাক, তা বইয়ে ভর্তি আর অনেকগুলো মান্ধাতার আমলের অতিকায় সোফা। সেগুলোর অধিকাংশই ছেঁড়া, ফাটা। কোনওটার স্প্রিং ভেঙে রয়েছে, কোনওটার গদি ফেটে তুলো বেরিয়ে এসেছে ঘরটার মেঝেতে ছিল একটা মোটা, তুলো ভর্তি পুরোনো কার্পেট, সেই কার্পেটের ওপরে ছুটোছুটি করে আমরা ভাই-বোনেরা খেলা করতাম। কখনও কখনও আমাদের মা এসে আমাদের সঙ্গে খেলত। আমরা এ ওর লেজ টেনে দিয়ে কিংবা গালে থাবড়া দিয়ে বইয়ের র‍্যাকের পিছনে কিংবা সোফার আড়ালে লুকিয়ে পড়তাম, আবার কখনও সোফার পেছনটা দিয়ে বেয়ে বেয়ে সোফার পিঠটার ওপরে উঠে যেতাম। খুব হইহুল্লোড় করে খেলা হত আমাদের।

কল্যাণীদের বাড়িটা বিরাট। আগে নিশ্চয় ওবাড়িতে অনেক লোকজন থাকত। এখন লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। কল্যাণীর ঠাকুরদার আমলে নাকি এ বাড়ির খুব রমরমা ছিল। এখন দু-তিনজন কাজের লোক ছাড়া পুরো বাড়িতে দোতলায় থাকেন কল্যাণীর বাপ-মা আর কল্যাণী নিজে। তিনতলায় থাকেন কল্যাণীর বাবার এক কাকা, তিনি পাগল। এখন রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছেন।

সবসময়ে মুখে কী সব বিড় বিড় করেন। তাছাড়া আর কোনো গোলমাল নেই। সকালে কল্যাণীর মার কাছ থেকে দৈনিক বরাদ্দ একটা পাঁচ টাকার নোট তাঁর প্রাপ্য। প্রত্যেকদিন সকাল নটার সময় যখন সাইরেন বেজে ওঠে। তিনি কল্যাণীর মাকে বলেন, 'বৌমা আমার টাকাটা দাও।' পাগল হলে কী হবে, এই বয়েসেও খুড়শ্বশুরমশায়কে খুব শ্রদ্ধা করেন কল্যাণীর মা, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে বলেন,'এই যে কাকা' বলে পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দেন।

নোটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়ার সময় পাগলাদাদু প্রতিদিনই একতলায় বাইরের ঘরের দরজাটা অল্প ফাঁক করে আমাদের একটু দেখে নিতেন, দেখে বলতেন, 'গুড মর্নিং কিটেনগণ কবে তোমারা ক্যাট হইবে?'

দোতালায় তিনতলায় ওই তো সাকুল্যে তিন আর একে চারজন লোক আর একতলায় ওই বাইরের ঘরটা যেখানে আমরা জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, একেবারেই ব্যবহার করা হয় না। লোকজন কেউ বাড়িতে এলে দোতলায় বসবার ঘরে চলে যায়।

আমাদের ছোটোবেলাটা ভালোই কাটে ওই পুরনো অন্ধকার ঘরটায়। শুধু একটা অসুবিধে ছিল, এই বাইরের ঘরটার সামনের রাস্তার দিকে একটা ছোটো বারান্দা মতো ছিল। সেই বারান্দায় রাস্তার কয়েকটা কুকুর বসবাস করত। এই কুকুরগুলোর মধ্যে একটা ছিল দারুণ রাগী আর যাচ্ছেতাই পাজি। আমাদের মা যদি কখনও রাস্তার দিকে একটু সময়ের জন্যেও বের হত, ওই কুকুরটা, পাড়ার লোকেরা তাকে কী একটা কারণে গামবু বলে ডাকত, মাকে তাড়া করে যেত।

আমার মা অবশ্য ভয় পাওয়ার মেয়ে ছিল না, মা যখন রুখে দাঁড়াত, তখন তখন তার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে সকলে ভয় পেয়ে যেত। গামবু যত জোরেই তাড়া করে আসুক না কেন, মা ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র গামবু তিনহাত পিছিয়ে যেত

ওই গামবুর জন্যেই আমরা জীবনে কোনওদিন বাইরের বারান্দাটায় গিয়ে খেলাধুলা করতে পারিনি। ঠাণ্ডার দিনের সকালে কী চমৎকার রোদ্দুর আসত বারান্দাটায়। আমাদের খুব ইচ্ছে হত ওই রোদ্দুরে গিয়ে বসি কিন্তু আমরা ভাই-বোনেরা কেউই গামবুর ভয়ে সাহস পেতাম না ওই বারান্দাটায় যেতে। আমাদের একটা ভাই ছিল ধবধবে সাদা। সে ছিল ভারি চঞ্চল। সে মাঝে মাঝেই বাইরের জানলাটার ভাঙা খড়খড়ি দিয়ে বারান্দায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করত, একদিন গামবুর কাছে মারা পড়ার উপক্রম হয়েছিল তার। যেই ভাঙা-খড়খড়ি দিয়ে সে মাথা বের করেছে, গামবু ঘেউ ঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মাথাটা ঢুকিয়ে নেয় আমার সাদা ভাইটা, আর তাই বেঁচে যায়।

একদিন একটা ছোটো ছেলে কল্যাণীর সঙ্গে এসে আমাদের সঙ্গে খেলা করতে লাগল। মানুষদের সঙ্গে অল্পস্বল্প খেলতে আমাদের ভালোই লাগে কিন্তু বেশিক্ষণ হলেই বিরক্তি লেগে যায়।

এই ছোটো ছেলেটা কিছুক্ষণ খেলেটেলে তারপর কল্যাণীকে দোতলায় গিয়ে ডেকে আনল। ডেকে নিয়ে এসে আমাকে কোলে করে বলল, 'কল্যাণীদি এই বেড়ালছানাটা আমি নিচ্ছি।'

কল্যাণীদি আমাকে ওর কোলে দেখে বলল, 'না রে, বাচ্চু, এটা নিস না। এই ছানাটা আমি আমাদের বড়োদিদিমণিকে দেব। তুই অন্য যেটা ইচ্ছে না।'

বাচ্চু কিছুটা দুঃখিত মনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমার সাদা ভাইটাকে কোলে করে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের মা ফিরে এসে সাদাভাইটাকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ মিউ মিউ করে কাঁদল, আমরা মায়ের সঙ্গে একটু মিউ মিউ করলাম। ভাইটার জন্যে আমার নিজের মনটাও কেমন করতে লাগল। আমার সাদা ভাইটাকে যেদিন বাচ্চু নিয়ে গেল, তার পরের দিন সকালেই জয়ন্তী দিদিমণি এসে হাজির। আমি তখন অবশ্য জয়ন্তীদিকে চিনি না। সেটা ছিল বেশ শীতের দিন। উনি একটা মোটা বাদামি রঙের তুষের আলোয়ান গায়ে দিয়ে এলেন। পরে ওই তুষের আলোয়ানের মধ্যে জড়িয়ে আমাকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে। সেই মোটা তুষের চাদরের গন্ধ, গরম আর আরামটা আজও আমার লোমে লেগে রয়েছে।

কল্যাণীদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীদি কল্যাণীকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কল্যাণী বোধ হয় বাড়িতে ছিল না, আশপাশের কোনো বাড়িতে গিয়েছিল। জয়ন্তীদির গলা শুনে তিনতলা থেকে পাগলাদাদু নেমে এলেন। নেমে এসে জয়ন্তীদিকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'স্বাগতম, মিসেস রায়চৌধুরী, কিটেনগণ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে।' তারপর একটু থেমে একটু মিচকে হেসে বললেন, 'আপনার আদরের ছাত্রী কল্যাণী আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সর্বশ্রেষ্ঠ কিটেনটি শ্বেতশুভ্র মার্জার শাবকটি ইতিমধ্যে দান করিয়া দিয়াছে। তাই সেই কৃতঘ্নী পলায়ন করিয়াছে।'

এমন সময়ে কল্যাণী উল্টোদিকের বাড়ি থেকে এক দৌড়ে ছুটে এসেছে। এসেই পাগলাদাদুকে একটা মিষ্টি ধমক দিয়ে বলল, 'কিসব উল্টোপাল্টা বলছ দাদু। আসুন বড়দি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন।'

আমরা তিন ভাই-বোন জানলার খড়খড়ি বেয়ে ঝুলে ঝুলে খেলছিলাম। মা ঘরে ছিল না। কোথায় যে বেড়াতে গিয়েছিল, না কী খাবারটাবার জোগাড় করতে।

জয়ন্তী দিদিমণিকে নিয়ে কল্যাণী ঘরে এল। পেছনে পেছনে পাগলাদাদুও এলেন। আমরা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ওদের লক্ষ করছিলাম। ওরা ঘরে ঢুকতেই আমরা তিনজনে বইয়ের র‍্যাকের সবচেয়ে দুর্গম জায়গার পেছনে গিয়ে লুকোলাম।

কল্যাণী বড়দিকে বোঝাতে লাগল 'বলেছিলাম না, চারটে বাচ্চা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল খুব রোগা আর দুর্বল। সেটা তো আপনি নিতেন না, তাই সেটা আমার মামাতো ভাইকে দিয়ে দিয়েছি।'

আমাদের ঘরটা ছিল অন্ধকার। পাগলা দাদু ঘরে ঢুকে সোফার পিছন দিয়ে গিয়ে একটা বড়ো জানলা খুলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অত বড়ো হলঘরের মতো কামরাটা আলো আর রোদ্দুরে ভরে গেল। কল্যাণী বলল, 'এ ঘরটায় আজকাল আর ঢোকাই হয় না।'

রোদে ভরা ঘরটার চারপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে পাগলাদাদু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এই ঘরে একদিন অনেক হইহল্লা, হাসি গান, গল্প গুজব হইত। মিসেস রায়চৌধুরী আপনার কি তাহা মনে আছে?' বড়দিমণি ম্লান হেসে নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ', সব মনে আছে'। তারপর একটু থেমে নিজের মনেই যেন বললেন, 'মনে থাকবে না কেন?'

ততক্ষণে কল্যাণী র‍্যাকের নিচে উঁচু হয়ে বইয়ের আড়াল থেকে আমাদের দু'জনকে ধরে ফেলেছে। ধরা পড়ার সময় আমি বিশেষ কোনো আপত্তি করিনি। বাধাও দিইনি। কিন্তু প্রায় আমারই মতো দেখতে আমার সাদা-কালো ভাইটা কল্যাণীর হাতে তার নতুন ধারালো নখ দিয়ে একটু আঁচড়িয়ে দিয়েছিল।

এই ভাইটা যে একদম আমার মতো দেখতে, একথাটা মা আমাদের বলেছিল, 'দুটি বাচ্চা কী আশ্চর্য, দুটিই ওদের দিদিমার মতো দেখতে হয়েছে, একটুও আলাদা নয়, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। এইটুকু যা আলাদা বড়ো হলে দুজনে দেখতে দুরকম হয়ে যাবে।' মা আমাদের আদর করে চাটতে চাটতে এই সব মিউ মিউ করে বলত। মা আমাকে কোলের মধ্যে করে জিব দিয়ে লোমগুলো পরিষ্কার করে দিত। আর বলত 'আমার তিনটে হুলো, একটা মেনি। আমার মেনিটাই সবচেয়ে ভালো।' এই বলে মা তার সোনালি গোঁফটা আমার মুখে ঘষে দিত।

কল্যাণী আমাদের তিন নম্বর ভাইকে ধরতে পারেনি, সেটা র‍্যাকের পিছনেই লুকিয়ে রইল। সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দিয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

কল্যাণীর হাত থেকে জয়ন্তী দিদিমণি আমাকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাগলাদাদু সায় দিয়ে বললেন, 'ইয়েস ভেরি গুড চয়েস, দিস ইজ মোস্ট বিউটিফুল।' জয়ন্তীদি আমাকে চিৎ করে ধরে হাত আর পায়ের নখগুলা গুনতে লাগলেন। 'উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ। হ্যাঁ জোড়ে মিলে গেল। এটা চমৎকার।'

কল্যাণী অবাক হয়ে জয়ন্তীদির নখ গোনা দেখছিল। এবার বলল, 'জোড়ে মেলা কী বড়দি?'

বড়দি বললেন, 'নখের সংখ্যা যদি বিজোড় হয় তাহলে বিষ থাকে। আর জোড় মিলে গেলে থাকে না।'

পাগলাদাদু বাধা দিয়ে বললেন, 'হে রায়চৌধুরানী, মার্জার কি সর্প যে বিষ থাকিবে?'

বড়দিমণি সে কথায় কর্ণপাত না করে পাগলাদাদুকে একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই বললেন, 'বেড়ালটা হুলো না মেনি?'

পাগলাদাদু অট্টহাস্য করে বললেন, 'বিড়ালছানা হুলো না মেনি, ইহা কেহ জানে না। কেহ্ বলিতে পারিবে না। বিড়ালছানা নিজে পর্যন্ত জানে না। সে বড়ো হইতে হইতে ঠিক করে সে হুলো হইবে না মেনি হইবে।'

একথার কোনো উত্তর না দিয়ে জয়ন্তীদি কল্যাণীকে বললেন 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের সময় হয়ে এল। তোমারও তো স্নান খাওয়া আছে। আমি এটাকেই নিয়ে যাচ্ছি।'

পাগলাদাদু হেসে বললেন, 'ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি ইহার নামকরণ করিলাম আনুমানু। হুলো হইলেও চলিবে। মেনি হইলেও এ নাম চমৎকার হইবে।'

বড়দি আমাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। কল্যাণী ও পাগলাদাদু দরজার গোড়া পর্যন্ত এল। বড়দি যখন আমাকে কোলে করে একটু এগিয়েছেন, পাগলাদাদু তাঁর রোগা, লম্বা ডান হাতটা উঁচু করে চেঁচিয়ে বললেন, 'গুড নাইট, হেডমিস্ট্রেস।'

তখন শীতের দিনের সকালের রোদ্দুরে সারা রাস্তা বাড়িঘর ঝকঝক করছে। হঠাৎ দেখলাম সামনের দিকের ফুটপাথ দিয়ে আমার মা আসছে। মার গায়ের সাদা-কালো খয়েরি লোম রোদ্দুরে ঝকঝক করছে।

আমি জয়ন্তী দিদিমণির কোলে তুষের চাদরটার মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে মাকে দেখতে পেলাম। আমি ভাবলাম একবার মিউমিউ করে কেঁদে মাকে জানাই যে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তুষের আলোয়ানটার সঙ্গে জয়ন্তীদির শরীরের ওম মিশে এত ভালো লাগছিল শীতের দিনে সকালবেলার রোদে, আমি একটু মিউ মিউ করতে গেলাম কিন্তু আরামে আমার জিবটা জড়িয়ে গেল, একটা শব্দ বেরোল না।

মা কিন্তু আমাকে খেয়াল করেনি। আসলে চাদরে ঢাকা থাকায় আমার মুখটা ছাড়া আর কিছুই তো বেরিয়ে ছিল না, আর মা আসছিল খুব সতর্কভাবে রাস্তার চার দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনও কুকুর বিশেষভাবে গামবু তাড়া করে আসে কিনা সেটা মা রাস্তায় বেরোলে সদাসর্বদাই খেয়াল রাখে।

এদিকে হল কী, মা যেই আমাদের পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেছে, হঠাৎ কী ভেবে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর হাওয়ায় কী একটা শুঁকল। আমি ভাবলাম মা বুঝি কোনো কুকুর-টুকুরের আন্দাজ পেয়েছে, হয়তো পাশের প্যাসেজেই গামবু শুয়ে আছে। কিন্তু তা তো নয়। মা জয়ন্তীদির পায়ে পায়ে মিউ মিউ করে করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

মা আমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। মা বুঝতে পেরেছে তুষের চাদরের মধ্যে তার আদরের মেনিছানাটা একজনের কোলে উঠে যাচ্ছে।

পায়ের কাছে একটা বেড়াল মিউ মিউ করে কাঁদতে কাঁদতে আসছে, জয়ন্তীদি এটুকুতেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এই আনুমান, এটাই তোর মা না কিরে। তোর মাকে বল আরও দুটো ছানা তো রইল, কাঁদাকাটি যেন না করে।'

তারপর হঠাৎ রাস্তায় পায়ের কাছ থেকে জয়ন্তীদি খপ করে আমার মাকে কোলে তুলে নিলেন। অন্য কোনো বেড়াল হলে কী হত বলা যায় না। হয়তো আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিত জয়ন্তীদির হাতে। কিন্তু আমার মা যতই সাহসী আর তেজী হোক, স্বভাব বড় নরম আর ঠাণ্ডা, মা বোধ হয় কোনোদিনই কাউকে আঁচড়ে দেয়নি, চোখ ফোটার পর এই যে কটাদিন মাকে দেখলাম, আরশোলা পর্যন্ত ধরেনি। তিনতলার পাগলাদাদু তাই মাঝেমাঝেই কল্যাণীকে খেপিয়ে দিতেন, 'কল্যাণী নাতনি, তোমার পোষ্যটি দেখিতেছি, একেবারে বিড়ালকুলে প্রহ্লাদ।'

জয়ন্তীদি মাকে কোলে তুলে নিয়ে মার মাথাতেও আদর করে হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, 'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, তোমার ছানা আমার কাছে খুব ভালো থাকবে, খুব আদরে থাকবে। দুবেলা দুধভাত খাবে।' মা মিউ মিউ করে বলল, 'সবাই ওই রকম বলে তারপর দু-একদিন রেখে রাস্তায় ফেলে দেয়। আমার আগের বারের একটা বাচ্চা তো—ওই গলির মোড়ের বাড়িটায় গিয়েছিল, প্রথম দিনেই তো ও বাড়ির দুটো কুকুর মিলে আমার অত সুন্দর ছানাটা মেরে ফেলল।' মা গজর গজর করে কাঁদতে লাগল।

জয়ন্তীদি কিন্তু আমার মায়ের কথার একটি বিন্দু বিসর্গও ধরতে পারলেন না, শুধু এটুকু বুঝতে পারলেন বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে বলে বেড়ালের মার এত কাঁদাকাটি। মার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জয়ন্তীদি বললেন, 'বাচ্চা বড়ো হয়ে গেলে দূরে চলে তো যাবেই। এই তো আমার নিজের একটা মাত্র খোকা কতদূরে সে। কত বছর তাকে দেখিনি।'

মানুষেরা আমাদের বুঝতে পারে না, আমরা বেড়ালেরা কিন্তু মানুষদের সব কথা বুঝতে পারি। অনেককাল এক সঙ্গে আছি কিনা তাই।

মা যখন শুনল জয়ন্তীদির একটাই খোকা, আর সেও মায়ের কাছ ছাড়া অনেক কাল, মায়ের বোধহয় যেন একটু মায়া হয় জয়ন্তীদির ওপর, আমারও কেমন মায়া হল। যদিও সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমার জয়ন্তীদিকে খুব ভালো লাগছিল। ওঁর মুখের মধ্যে কেমন মায়া মাখানো, মমতায় টলমল করছে ওঁর কালো চোখ দুটো। আমার মনে হল, ওঁর বাড়িতে আমি ভালোই থাকব, ওঁর কাছে আমি ভালোই থাকব।

ঠিক এই সময়ে নটার সাইরেনটা বেজে উঠল। জয়ন্তীদি তাড়াতাড়ি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা খুব দেরি হয়ে গেল। ইস্কুল যাব কখন।' তারপর মাকে বললেন, 'যাও আনুমানুর মা, নিজের বাড়িতে ফিরে যাও। সেখানে তোমার আর দুটো বাচ্চা আছে, তারা তোমার জন্যে কাঁদছে।'

এই সব বলে জয়ন্তীদি মাকে শেষবার আদর করে কোল থেকে নামিয়ে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় পিছন থেকে পাগলাদাদু দেখি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছেন। একেবারে আমাদের সামনে এসে জয়ন্তীদির মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'হায়! হেডমিস্ট্রেস এত দেরি? আজ বিদ্যালয়ে যাওয়া হইবে না?'

হঠাৎ পিছন থেকে পাগলাদাদুর মোটা গলা শুনে জয়ন্তীদি যেন একটু চমকে উঠেছিলেন আসলে এই ঠিক নটা বাজার পরেই কল্যাণীর মার কাছে থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে পাগলাদাদুর বাইরে বেরোনোর সময়। ঘড়ি ধরে ঠিক দু'ঘণ্টা বাইরে থাকেন। অন্য বাড়িটার তিনতলায় আপন মনে বিড় বিড় করে একা-একা কাটিয়ে দেন। এই পাঁচ টাকা তাঁর বরাদ্দ, তার মধ্যে তিন টাকা নিজের জন্য চা-জলখাবার, ছোটো-খাটো জিনিস কিনে খরচ করেন। এই কেনাকাটা খুব মজার, কখনও একটা কাঠের ঘোড়া, লাল পাথরের মালা, ছোটো টিনের আয়না—ঠিক কার জন্যে কেন এসব কেনেন পাগলাদাদু সে কথা নিজেও জানেন না। পাগলাদাদুর আরেক মজা, বাকি যে টাকা ওঁর হাতে থাকে সেই টাকা দিয়ে বড়ো এক ঠোঙা মুড়ি কিনে ট্রামরাস্তার মোড়ে গিয়ে যত রাজ্যের কাক আর কুকুরকে 'আয় আয় আতু আতু' করে ডেকে খাওয়ান।

পাগলাদাদুর আকস্মিক আবির্ভাবে জয়ন্তীদি চমকে গেলেও সামলে নিয়েছিলেন কিন্তু ততক্ষণে পাগলাদাদু জয়ন্তীদির কোলে আমাকে আর বিশেষ

করে আমার মাকে একসঙ্গে দেখে ফেলেছে। তুষের চাদরের ভিতরে আমাদের দু-জনকে দেখে পাগলাদাদু হাসতে হাসতে বললেন, 'কি হইল? জননী ও শাবক একসঙ্গে চলিল?'

পাগলাদাদুর কথায় জয়ন্তী দিদিমণি যেন একটু লজ্জা পেলেন, ওঁর মুখ একটু লাল হয়ে গেল, একটু ইতস্তত করে বললেন, 'না তো বেড়ালের মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না। ওকে আমি রেখে যাচ্ছি, বাচ্চাটকে নিয়ে যাচ্ছি মা বেড়ালটা হঠাৎ তাই দেখে কাঁদছিল, তাই কোলে তুলে একটু শান্ত করছি।'

জয়ন্তীদির ব্যাখ্যা শুনে পাগলাদাদু খুব সুন্দর করে হাসলেন, এই হাসার ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আমরা বেড়ালরা কিছুতেই হাসতে পারি না। অথচ একেক সময় কত যে হাসতে ইচ্ছে করে। এই কাল দুপুরবেলাতেই আমারই মতো দেখতে আমার ভাইটা, সেটা আবার খুব চঞ্চল, করেছিল কী,—ই যে পুরোনো মোটা পর্দা আছে জানলার সামনে সেটা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল। অর্ধেক পথ গিয়ে আটকে গেল, সামনের বাঁ পায়ের দুটো নখ পর্দার মোটা কাপড়ের মধ্যে গেঁথে গেল। আর নামতেও পারে না, উঠতে পারে না। ওর এই জব্দ হওয়া দেখে আমার যে কী হাসি পেল, সে আর বলার কথা নয়। কিন্তু আমরা তো হাসতে পারি না, আমরা শুধু ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে পারি। আমার এখনও ঠিক মতো গোঁফ ওঠেনি, নরম, চিকন গোঁফের রোঁয়ার ভিতর দিয়ে আমি মৃদু ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে লাগলাম আমার ভাইটা তাই দেখে আরও খেপে গেল। কিন্তু করবে কী, পর্দার সঙ্গে এক পায়ে অসহায় ভাবে ঝুলতে ঝুলতে মিউউ মিউউ করে করুণস্বরে কাঁদতে লাগল আর মাঝে মাঝে আমার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচানিতে রেগে গিয়ে আমাকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

মা বাসায় ছিল না, কিংবা হয়তো তিনতলার ছাদে উঠে গিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। ভাইটার কান্না শুনতে পায়নি। তাহলে হয়তো ছুটে এসে একটা কিছু বন্দোবস্ত করত। সত্যিই তো ব্যাপারটা হাসার নয়। এক পায়ে কতক্ষণ ঝুলে থাকবে।

পাগলাদাদুর কান কিন্তু খুব সজাগ। সহজে তিনতলা ছেড়ে ওই সকাল নটার সময় নিচে নেমে আসে না; আজ কিন্তু ভাইটার কান্না শুনে ধুপ ধুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, 'কিটেন ইন ডেনজার। কী হইল, কোন কিটেন বিপদে পড়িয়াছে? তোমাদের মাতৃদেবী কী করিতেছে?' তখনই পর্দায় ঝুলন্ত ভাইটাকে দেখতে পেলেন একটু এগিয়ে গিয়ে ভাইটার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন জব্দ হইয়াছ? আর পর্দা বাহিয়া উঠিবে! অন্য বাড়িতে গিয়া এইরূপ করিলে তাহারা ঠেংরি ল্যাংড়া করিয়া দিবে।' হাসিমুখে একটু গজগজ করে, তারপর আবার বললেন, 'বিড়ালছানারা বিড়ালছানাই হইবে।

তোমাদের আর কী দোষ দিব' এই বলে ভাইটাকে খুব আলগোছে পর্দার থেকে খুলে নামিয়ে দিলেন।

৬

এসব গতকালের কথা। তখনও আমি পুরোপুরি কল্যাণীদের বাড়ির। কাল রাতে মা আমাদের যে মাছের কাঁটাটা এনে দিয়েছিল, তার একটা টুকরো আমি সোফার হাতলের কাছে ছেঁড়া জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন কী ভেবেছি আজই চলে যেতে হবে। ভাইয়েরা যদি কেউ খুঁজে পায় খাবে।

জয়ন্তীদি পাগলাদাদুকে মাকে শান্ত করার কথা বলতেই পাগলাদাদু কেমন চনমন করে উঠলেন, 'আমার খুব দেরি করাইয়া দিলে। আমার বায়স এবং সরমেয়গণ নিশ্চয় এতক্ষণ খুব অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে।' পাগলাদাদু হনহন করে বড়ো রাস্তার দিকে এগোলেন ওঁর পোষ্য কাক আর কুকুরদের মুড়ি খাওয়াতে।

পাগলাদাদু যে রাস্তার মোড়ে গিয়ে ঠোঙা ভর্তি মুড়ি ছিটিয়ে কাক আর কুকুরদের খাওয়ান, এ ব্যাপারটা নাতনি কল্যাণীর মোটেই পছন্দ নয়, মাঝে মাঝে দাদুকে বলে, 'ছোটোদাদু, তুমি আর রাস্তায় কাক আর কুকুরদের খাওয়াতে যেয়ো না। সবাই চেনে তোমাকে, ইস্কুলে মেয়েরা হাসাহাসি করে।' এ কথায় পাগলাদাদু নিজেও অনেকক্ষণ হাসেন, তারপর কল্যাণীর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'ইহাতে তাহাদের আপত্তি করিবার কারণ কী? ঠিক আছে, একদিন সব মেয়েদের ডাকিয়া লইয়া আইস। সারমেয়দের মুড়ি ভোজন করাই, তাহাদের ভুরিভোজন করাইব। গলা পর্যন্ত ভরিয়া দিব, তাহা হইলে আর হাসাহাসি করিবে না।'

পাগলাদাদু এখন রাস্তার দিকে চলে গেলেন। সেই দিকে জয়ন্তীদি একটু তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'চিরটা কাল এক রকম রয়ে গেল।' আমাকে আর মাকে কোলে নিয়ে আলোয়ানের মধ্যে ভালো করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেরি তো হয়েই গেছে। চল আনুমানু, তোকে শেষবার তোর মায়ের দুধ খাইয়ে নিয়ে যাই।'

জয়ন্তীদি আবার কল্যাণীদের বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। তারপর কল্যাণীকে ডাকলেন, কল্যাণী স্নান করতে যাচ্ছিল, ওকে বললেন, 'তুমি একটু তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া করে স্কুলে যাও। গিয়ে কেরানিবাবুকে বলবে আমার যেতে একটু দেরি হবে, উনি যেন নয়নদি এলে তাঁকে একটু দেখতে বলেন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।' এরপর একটু থেমে বললেন, 'আর এই বেড়ালছানা-টানার কথা কাউকে বলতে যেও না।'

আমাকে আর মাকে নিয়ে জয়ন্তীদি একতলায় আমাদের ঘরটায় ঢুকলেন

তারপর দুজনকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই আনুমানুর মা, আনুমানুকে একটু ভালো করে দুধ খাইয়ে দে।'

কল্যাণীদের বাইরের ঘরে পুরোনো ছেঁড়া কার্পেটের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে মা আমাকে দুধ দিতে লাগল। জয়ন্তীদি যা বলেছিলেন মা সবই বুঝেছিল। মা বুঝতে পারছিল আমাকে হয়তো আর জীবনে দেখতে পাবে না। দুধ দিতে দিতে মাথাটা তুলে নরম, ঠাণ্ডা জিবটা দিয়ে আমার চোখ মুখ বারবার করে চাটতে লাগল।

আমার অন্যভাই দুটো দুজনে জড়াজড়ি করে বড়ো সোফাটার ওপরে খুব আরামে ঘুমিয়ে ছিল। ঘুমের মধ্যেই বোধ হয় তারা মায়ের গন্ধ নাকে পেয়েছে। আস্তে আস্তে একটা একটা করে চোখ খুলে দুজনে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল মেঝেতে কার্পেটের উপরে মা আমাকে দুধ দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়মোড়া ভেঙে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। তারপর সোফা থেকে এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে দৌড়ে এসে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের দুজনের দুধ খাওয়ার জায়গা করে দিলাম। দুজনে মিউ মিউ করে ছুটে এসেছিল। ঘুম থেকে উঠে মায়ের গায়ের গন্ধ পেয়ে মাকে দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিল। এখন মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চনমন করে দুধ খেতে লাগল।

দুধ খাওয়া শেষ হলে ওরা দুজনে মায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুটোপাটি শুরু করে দিল।

মা কিন্তু শুধু আমাকেই আদর করছিল আমি চলে যাব বলে। মা আমাকে বারবার আদর করে যাচ্ছিল, আমার মুখ চাটছিল আর মা মা বলছিল। জয়ন্তীদি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এরমধ্যে দোতলার বারান্দা থেকে কল্যাণী গলা বাড়িয়ে বলল, 'বড়দি আমার স্নান হয়ে গেছে, খেতে বসছি। আপনি দোতলার ঘরে এসে বসুন না।' কল্যাণীর পিছন থেকে কল্যাণীর মা নিজেও বললেন, 'বড়দি আপনি ওপরে এসে বসুন।'

জয়ন্তীদি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন 'না আমি আর ওপরে উঠব না, এখনই যাচ্ছি। কল্যাণী তাড়াতাড়ি খেয়ে স্কুলে যাক। আমি পেছন পেছনে আসছি।' তারপর গলা নামিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'মা মেয়ে দুজনেই বলছে বড়দি, মাস্টারি করে এই হয়েছে হাল, সবারই বড়দি।'

এবারে জয়ন্তীদি ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে কার্পেট থেকে মাকে সুদ্ধু, আমার ভাই দুটো সুদ্ধু আমাকে কোলে তুলে নিলেন, কোলে ওঠবার আগেই ভাইদুটো তড়াক লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

জয়ন্তীদি মাকে খুব আদর করলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, মুখে চুমু খেলেন। মা নিজেও খুব আহ্লাদে গরগর করতে লাগল, যেন জয়ন্তীদি মার কতকালের চেনা লোক।

আমার দিকে তাকিয়ে মা মিয়াও মিউ করে বলল, 'নারে, বড়দিকে আমি খুব ভালো করে চিনি। অনেককাল ধরে দেখছি। খুব ভালো লোক।' মা একটু আগে রাস্তায় জয়ন্তীদিকে যা বলছিল এখন ঠিক তার উল্টো বলছে। আসলে জয়ন্তীদির আদরে আর ব্যবহারে মা খুব খুশি হয়েছে, এখন আর জয়ন্তীদির সঙ্গে আমাকে যেতে দিতে মার কোনও আপত্তিই নেই।

আমার শুধু একটা ব্যাপারে খুব মজা লাগল। আমার মা পর্যন্ত জয়ন্তীদিকে বড়দি বলছে। ভাগ্যিস জয়ন্তীদি বেড়ালের কথা বুঝতে পারেন না। পারলে এবারে আরও গজগজ করতেন, 'মা, মেয়ে, মেয়ের বেড়াল সবাই বড়দি বলছে, নিকুচি করেছে, বড়দির নিকুচি করেছে।'

মাকে খুব আলতো করে কোল থেকে নামিয়ে জয়ন্তীদি আমাকে আবার আলোয়ানে জড়িয়ে ঘর থেকে নেমে এলেন। বেরোনোর আগে তুষের আলোয়ানের ফাঁক দিয়ে আর একবার মাকে দেখে নিলাম। মা কার্পেটের ওপরে নরম হয়ে বসে দরজা দিয়ে আমাদের চলে যাওয়া দেখছে। মায়ের চোখে অনেকখানি মমতা, একটু আনন্দ। আনন্দ এই জন্যে যে বাচ্চা ছেড়ে যেতে যতই মন খারাপ হোক, বেড়ালের মায়েরা সব সময় চায় তাদের বাচ্চারা কোথাও ভালো একটা বাড়িতে ভালোভাবে আদরযত্নে থাক।

বেরোনোর মুখে ভাইদেরও আরেকবার খুঁজলাম চোখ ঘুরিয়ে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না, পর্দা বা সোফার আড়ালে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। কিন্তু কোথায় যাব, জয়ন্তীদির বাড়িটা এখান থেকে কত দূরে? যদি খুব দূরে না হয় তাহলে যখন বড়ো হব ওদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে কিংবা কোনও বাড়ির ছাদে আবার কখনও দেখা হয়ে যাবে। তখন চিনতে পারব কী আমি ওদের? ওদের গায়ে আমার মায়ের গায়ের গন্ধ খুঁজে পাব? ওরা কী আমাকে চিনতে পারবে, ওরা কী আমার গায়ে ওদের মায়ের গায়ের গন্ধ খুঁজে পাবে? একটা অন্ধকার ঘরে পুরোনো কার্পেটের ওপরে ছেঁড়া সোফার গর্তে আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতাম, লেজ নাচিয়ে, থাবা উঁচিয়ে হুটোপুটি করে করে খেলা করতাম, একসঙ্গে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাড়াকাড়ি করে দুধ খেতাম। আমাদের কী সব মনে থাকবে?

এতক্ষণে জয়ন্তীদি কল্যাণীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় নেমে এসেছেন। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছেন।

আসার মুখে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কল্যাণীকে বলে এসেছেন, 'কল্যাণী, দেরি করবে না কিন্তু, স্কুলে গিয়ে খবরটা দিতে ভুলবে না।'

জয়ন্তীদির বাড়িটা খুব দূরে নয়। একটু পরেই একটা গলি পার হয়ে তারপর বড়োরাস্তা ধরে আর একটা গলি, সেই গলির মাঝামাঝি তিন-কোনাচে রাস্তার ওপরে বসানো একটা পুরোনো দোতলা বাড়ির একতলায় জয়ন্তীদি থাকেন। বাড়ির দরজায় এসে আমাকে একটু চুমু খেয়ে বললেন, 'আনুমানু এখন এইটা তোর নিজের বাড়ি।'

তারপর বাড়ির প্যাসেজ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই! কিছু ভয় পাবি না। কোথাও পালাতে যাবি না। তোরা বেড়ালের জাত, তোদের কিছুতেই বিশ্বাস নেই।'

আমি কিছুই বললাম না, চুপ করে থাকলাম। জয়ন্তীদির বাড়িটা, মানে আমার বাড়িটা আমার ভালোই লাগছে।

জয়ন্তীদির বাড়িতে আমি বেশ মানিয়ে গেলাম। আমি যখন এলাম তখন কিসমিস, পেস্তা কিংবা অলক্ষ্মী আসেনি, তবে ময়নামতী আর কেষ্টা ছিল। এখন যে মাথামোটা, বুড়ো অথর্ব কেষ্টাকে দেখা যায়, যার দুটো কানই ছেঁড়া, দুটো চোখই চালশে তখনকার কেষ্টার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তখন কেষ্টা ঘোলাটে ছিল ছিপছিপে ঝকঝকে সাহসী ও তরুণ। দু একটা কাবুলি বেড়াল বাদ দিলে আমাদের তল্লাটে ওর মতো সুন্দর বেড়াল তখন একটিও ছিল না।

তবে কেষ্টা যেমন আজকাল তেমনিই সেই সময়েও একই রকম মিথ্যাবাদী ছিল। যখন তখন এদিকে ওদিকে চক্কর দিয়ে এসে বলত, আজ একটা আমার থেকেও বড় ছুঁচো মেরেছি। আবার কখনও বলত, 'বদমাইশ বাঘা কুকুরটার নাকটা এমন আঁচড়ে দিয়ে এলাম যে এখনও কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে আর জিব দিয়ে নাকের রক্ত চাটছে যেমন পাজি তেমন শিক্ষা দিয়েছি; রাস্তায় বেরোলেই তাড়া করবে। আজকে তাড়া করার মজা দেখিয়ে দিয়েছি।'

এসব অবশ্য সবই বানানো কথা। আমি ছোটো ছিলাম তো তাই আমার কাছে বাহবা নেওয়ার চেষ্টা। আমিও ছোটো বয়সের সাদা মনে সবই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু পরে দেখেছি। কেষ্টাটা বেশ ভিতু। দু-একটা ছোটোখাটো ইঁদুর কখন সখন মেরেছে বটে কিন্তু ছুঁচো মারার ক্ষমতা তার নেই। আর ওই যে বাঘা তাকে সে ভীষণ ভয় পেত। সে কুকুরটা এখন অবশ্য মারা গেছে, মোড়ের মাথায় পূর্ণ ঘোষের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িটায় শুয়ে থাকত আর সারা পাড়া দাপিয়ে বেড়াত। এর এক নম্বরের শত্রু ছিল বেড়াল আর দুই নম্বর মোটর সাইকেল। বিড়াল কিংবা

মোটর সাইকেল দেখলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঘা তাড়া করে যেত। আমি বড়ো হয়ে নিজের চোখে জয়ন্তীদির শোবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখেছি কেষ্টা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে ঘুরে ঢুকল আর ঠিক পিছনে বাঘা গর্জন করে জানলার উপর লাফিয়ে পড়ল। শেষে অবশ্য বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই বাঘা মারা যায়। একটা মোটর সাইকেলওলাকে তাড়া করতে গিয়ে পিছন থেকে আসা একটা ট্যাক্সির নিচে পড়ে বাঘা মারা যায়। কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! আমি জানলা দিয়ে দেখেছিলাম, পুরো রাস্তাটা রক্তারক্তি হয়ে গেছ কেষ্টা অবশ্য বলেছিল, 'যাক মারা গেছে, আপদ চুকেছে।'

বাঘার মরে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগেনি। বেশ ছিল কুকুরটা, পুরো পাড়াটা দিনরাত মাতিয়ে রাখত আর ভরা গলায় ঘেউ ঘেউ ডাকে ভরে থাকত চারপাশ। এত বার এত বেড়ালকে তাড়া করেছে, মোটর সাইকেল আক্রমণ করেছে, এমন কী পুরোনো খবরের কাগজ বিক্রিওলাদের ধাওয়া করেছে কিন্তু কখনও শেষ পর্যন্ত কাউকে কামড়ায়নি। শেষমুহূর্তে যখন শত্রুকে একেবারে বাগে পেয়ে গেছে, তখন বাঘার মাথায় কী একটি সুবুদ্ধি ফিরে আসত, হঠাৎ ঘেউ ঘেউ আর দাঁত খেঁচানো বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা ঘুরিয়ে একা একাই ফিরে আসত, যেন কিছুই হয়নি। তখন তার মুখ দেখে কে বলবে এইমাত্র এই কুকরটা পাগলের মতো করছিল।

আমার মায়ের মনের মতোই আমার মনটাও খুব নরম। বাঘা মরে গেলে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। বাঘা বেড়ালদের তাড়া করত বলে জয়ন্তী দিদিমণির তার ওপরে বেশ চটে ছিলেন, কিন্তু সেদিন দেখলাম তাঁরও মন খুব খারাপ, রাতে শোবার সময় আমরা যখন সবাই ওঁর কোলের কাছে, পায়ের কাছে এসে বসেছি, জয়ন্তীদি আমাদের বললেন, 'দেখলি তো বাঘা কেমন অপঘাতে মারা গেল, আহা, অমন তাজা জোয়ান কুকুরটা, তোরা কিন্তু কেউ রাস্তায় যাবি না।' তারপর আমার গলার নিচটা আঙুল দিয়ে চুলকিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই আনুমানুটা ভালো, একদম লক্ষ্মী, সব সময়ে ঘরে থাকে।' তার পর কেষ্টার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই কেষ্টাটার বড়ো বাড় হয়েছে একদিন ঠিক বিপদে পড়বে। আর ময়নামতীটাকে সেদিন দেখলাম মিত্তিরদের বাড়ির দেয়ালটার উপর দিয়ে হাঁটছে বলে হাঁটুর কাছে ময়নামতী গরর গরর করে আদর খাচ্ছিল তাকে একটা আলতো করে চড় মারলেন।

এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা। আমি যখন জয়ন্তীদির বাড়িতে এসেছি তখন কেষ্টা আর ময়নামতী ছিল, আর ছিল বুলবুল নামে ধবধবে সাদা একটা বেড়াল। আমি প্রথম প্রথম বুলবুলকে খুব ভয় পেতাম। বিরাট চেহারা ছিল তার,

তখন অবশ্য বুড়ো হয়ে গেছে খুব বেশি নড়াচড়া করে না কিন্তু আমি সামনে গেলেই এমন কুৎসিত করে মুখটা ভেংচিয়ে ম্যাও করে গর্জে উঠত আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। আসলে বয়েস হয়ে ও বদমেজাজি হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া, বাচ্চা বেড়ালদের ও একদম পছন্দ করত না। আর ওর চোখে আমি, ময়নামতী আর কেষ্টা তিনজনেই ছিলাম ছোটো আর বাচ্চা। আসলে কিন্তু আমার থেকে কেষ্টা অনেক বড়ো আর ময়নামতীও প্রায় কেষ্টার সমান বয়েসিই হবে। হয়তো দু-চার সপ্তাহের ছোটো। তবে বেড়ালদের বেলায় সেটা কিছু কম নয় কেষ্টার যখন চোখ ফুটেছে, চলছে, ফিরছে, খেলছে সেই সময় হয়তো অন্য এক বেড়াল-মায়ের পেটের মধ্যে ময়নামতী বাড়ছে কিংবা দুটো চোখ বোজা, একটা নরম, অথচ সদ্য জন্মানো বেড়াল শিশু।

সকলের কথাই বলা হচ্ছে কিন্তু ময়নামতীর কথা বারবার বাদ পড়ে যাচ্ছে. ময়নামতীর দোষগুণ কোনওটাই তেমন কম বেশি নেই, ময়নামতী শুধুই বেড়াল, আর কিছু নয়। তাই তার বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখার মতো নেই। শুধু একটা কথা বলে রাখি, ও ভীষণ কুঁড়ে আর আলসে। একেক সময় এমন করে, ঘর থেকে বেরোতে চায় না, ঘরের মধ্যে বাথরুম করে নোংরা করে রাখে। ওর জন্যে আমরা সকলে অকারণ গালাগাল খাই।

আর বুলবুল। বুলবুলের ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। আমি জয়ন্তীদিদের বাড়িতে গেলাম শীতকালে। তখনও বুলবুল বুড়ো হলেও বেশ সজীবই ছিল। চলাফেরা একটু আধটু করত। কিন্তু গরম আসতেই যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল। প্রায়ই খায় দায় না। বিছানার একপাশে জয়ন্তীদির বালিশের পিছনে রাতদিন ঘুমোয়। শেষে একবার প্রায় দুতিনদিন কিছু খেল না। জয়ন্তীদি বুলবুলকে কোলে করে কত চেষ্টা করলেন চামচে দিয়ে দুধ খাওয়াতে কিন্তু বুলবুল বারবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

আগের দিন রবিবার ছিল। সেদিনও বুলবুল কিছু খায়নি। সোমবার সকালেও কিছু খেল না। সকাল থেকে কেমন যেন চঞ্চল, একবার খাট থেকে নেমে বারান্দাটায় ঘুরে এল। জয়ন্তীদি দেখে খুব খুশি হলেন। এক বাটি দুধ রেখে দিলেন বুলবুলের কাছে, বললেন, 'আস্তে আস্তে খেয়ে নিস। আমি স্কুল থেকে ফিরে তোকে আবার দুধ দেব।'

জয়ন্তীদি স্কুলে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বুলবুল হঠাৎ সারা ঘরটা ঘুরে খুব করুণভাবে ম্যাও ম্যাও করে কয়েকবার কাঁদল। তারপর বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল।

কোথায় যে গেল বুলবুল! তারপর কতদিন চলে গেল। জয়ন্তীদি ইস্কুল থেকে

ফিরে সেদিন বিকেলে, সন্ধ্যায় অনেক রাত ধরে বুলবুলকে খুঁজলেন। তার পরের দিন, তার পরের দিন কত খোঁজা হল বুলবুলকে। কিন্তু কেউ আর তাকে কোথায়ও দেখতে পায়নি।

বুলবুল চলে যাওয়ার পর আমাদের কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। জয়ন্তীদি নিজেও কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ওপরে ওঁর স্নেহ আরও বেড়ে গেল, কিন্তু একেক সময় আপন মনে 'চু চু আয় আয়' করে বুলবুলকে ডাকতেন।

যদিও গরম পড়ে গেছে, তখনও শেষ রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। একটা হিমেল হাওয়া বয়। জয়ন্তীদি মাথার কাছের জানলা বন্ধ করেই শুতেন। ওঁর আবার খুব ঠাণ্ডার ধাত। অল্পেই চোখ মুখ ফুলে নাক দিয়ে জল পড়ে, মাঝে মাঝেই সর্দিজ্বর হয়। এই জন্য সর্বদাই খুব সাবধানে থাকেন। ঠাণ্ডা লাগত, বৃষ্টিতে ভিজতে এমন কী বেশি রোদ লাগাতে ভয় পান, কিন্তু বুলবুল চলে যাওয়ার পর জয়ন্তীদি তাঁর মাথার কাছের জানলাটা খুলে রাখতে লাগলেন। যদি বুলবুল ফিরে আসে কোনও দিন অনেক রাতে। এসে যদি জানলাটা খোলা না পায়।

৭

এই করে জয়ন্তীদি জ্বর বাধিয়ে ফেললেন। রীতিমতো জ্বর, প্রথম দিন জয়ন্তীদি বিশেষ পাত্তা দিলেন না জ্বরটাকে। উঠে একটু নড়াচড়া করলেন, তবে ইস্কুলে যেতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন জ্বরটা খুবই বাড়াবাড়ি হল। সারাদিন বিছানায় অঘোরে পড়ে রইলেন। আমিও সারাদিন ওঁর কোলের কাছে শুয়ে রইলাম। উনি সারাক্ষণ ওঁর হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রইলেন। ময়নামতী আর কেষ্টা ওরাও দুজনে মনমরা হয়ে পড়ে রইল জয়ন্তীদির কাছে, বিছানার পাশে।

সকালবেলা তারু চাকরটি এককাপ চা দিয়েছিল জয়ন্তীদিকে। সেটা একটু খেয়েছিলেন, তারপর সারাবেলা কিছুই খাননি। দুপুরে তারু আমাদের খেতে দিল। আমাদের কারুরই খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও একটু খেলাম। জয়ন্তীদি কিন্তু কিছু খেলেন না। তারু একবার এক পেয়ালা দুধ নিয়ে এসে ডাকাডাকি করল। জয়ন্তীদি চোখটা একটু খুলে তারুর হাতে দুধের পেয়ালাটা দেখে হাত দিয়ে ইশারা করলেন দুধের পেয়ালাটা ফেরত নিয়ে যেতে।

তখন আমি কত ছোটো। কিছুই বুঝতাম না। তবু আমি একা কেন, ময়নামতী কেষ্টা আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কী জানি জয়ন্তীদির কী হবে?

জয়ন্তীদি দুদিন ইস্কুলে যাননি। বিকেলে ইস্কুলে ছুটির পর তিনজন বন্ধুর সঙ্গে বই হাতে কল্যাণী জয়ন্তীদির খোঁজ নিতে এল। তখন তো কল্যাণী ইস্কুলের উঁচু

ক্লাসে ওঠেনি, জয়ন্তীদির কাছে নিয়মিত পড়তে আসত না। কিন্তু পাগলাদাদু অনেকদিন আগে জয়ন্তীদি অথবা জয়ন্তীদির বরের বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদেই কল্যাণীরা সময় অসময়ে জয়ন্তীদির খবরাখবর নিত, আর সেই সুতো ধরেই কল্যাণীদের বাড়ি থেকে জয়ন্তী দিদিমণির বাড়িতে আমি এসেছিলাম।

কল্যাণীকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল। আমি খাট থেকে নেমে গিয়ে তার পায়ে পরা ইস্কুলে সাদা মোজায় আমার পিঠটা ঘুরে ঘুরে ঘষতে লাগলাম আর মিঁউ মিঁউ করতে লাগলাম। মিঁউ মিঁউ মানে, আমার মা কেমন আছে, আমার ভাইয়েরা তোমাদের বাড়িতেই আছে, না অন্য কোথাও গেছে, তারা কেমন বড়ো হয়েছে এইসব আর কী।

তারপর একটু সরে গিয়ে কল্যাণী আর তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দুবার জোরে জোরে ম্যাও ম্যাও করলাম। এর মানে হল, জয়ন্তীদির কী হয়েছে, আমাদের খুব ভয় করছে।

পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে কল্যাণী আমাকে বলল, 'আরে তুই তো আমাদের বেড়ালছানা। কত বড়ো হয়েছিস! পাগলদাদু রোজ তোর কথা বলে, আনুমানু নিশ্চয়ই বড়ো হয়েছে, যা একবার দেখে আয়।'

আস্তে আস্তে আমাকে কোল থেকে বিছানায় নামিয়ে কল্যাণী জয়ন্তীদির কপালে হাত দিল। কপালে কল্যাণীর হাতের ছোঁয়া পেয়ে জয়ন্তীদি চোখ মেলে তাকালেন, জবাফুলের মতো রাঙা চোখ দুটো জয়ন্তীদির, কেমন একটা আচ্ছন্নভাব, চোখ একবার খুলেই বন্ধ করে বললেন, 'কে কল্যাণী, খোকা এল, বুলবুল এল?'

কপাল থেকে হাত তুলে নিয়ে কল্যাণী তার বান্ধবীদের বলল, 'শরীর তো ভীষণ গরম মনে হচ্ছে, খুব জ্বর হয়েছে।' তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে তারুকে ডাকল। বেশ পাকা গিন্নির মতো তারুকে এক ধমক লাগাল, 'দিদির এত শরীর খারাপ হয়েছে, কাউকে একটা খবর দিতে পারনি ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?'

তারু ফস করে একটা মিথ্যে কথা বলল, 'আমি বেরোলে বেড়ালগুলো পালিয়ে যাবে তাই বেরোইনি।' কল্যাণী অবশ্য তারুকে বেশ ভালো চেনে, এক ধমক দিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা বল না। বেড়াল তিনটে তো জয়ন্তীদির কাছেই বসে আছে, আর কিছু না হোক তুমি মোড়ের ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিতে পারতে। দোতলায় দিদিমণিকে জানাতে পারতে, আমরা এখন এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়িতে ছুটে গিয়ে আমার মাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।' তারু ব্যাজার মুখে প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তারু ফিরল, তারুর সঙ্গে এসেছে কল্যাণীর মা নয়. কল্যাণীর ছোটো ঠাকুর্দা পাগলদাদু।

পাগলাদাদু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'কি হইল, হেড মিসট্রেস সিরিয়াসলি ইল? তারু গিয়া খবর দিল, কেন আনুমানু যাইতে পারিল না?' বলে আমাদের বেড়ালদের দিকে তাকালেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কে আমি সেটা ঠাহর করে নিয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও, আমি বলাই ডাক্তারকে ধরিয়া আনিতেছি।'

পাগলাদাদুর কোলে উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, জয়ন্তীদি আবার বিড়বিড় করছেন, 'কে খোকা? কে বুলবুল?'

প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলল। জয়ন্তীদির বুকে জল জমে নিউমোনিয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। মধ্যে দু-তিনদিন তো বেশ খারাপ অবস্থা, গেছে। সারাদিন ঝিম ধরে অজ্ঞানের মতো পড়ে থেকেছেন। আর মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকেছেন। আমি তো জয়ন্তীদির কোলের কাছেই সারাক্ষণ থাকতাম। এক সময় জ্বরের ঘোরে আমাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'কে বুলবুল, আবার ছোটো হয়ে গেলি?' আবার কখনও চোখ মেলে ঘরের মধ্যে কী যেন খুঁজতেন কাকে যেন খুঁজতেন, বলতেন, 'খোকা ফিরেছে?'

আমি তো খোকাকে দেখিনি। খোকার কথা শুনে ভেবেছি হয়তো বুলবুলের মতো আগের একটা বেড়াল। তখন যে আমি ছোটো, আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু পরে অবশ্য জেনেছি, খোকা হল জয়ন্তীদির একমাত্র ছেলে শুভ্র রায়চৌধুরী, যে এখন বিদেশে আছে, যে কখনও কখনও রঙিন পোস্টকার্ডে মাকে চিঠি দেয়।

আমাদের এ বাড়ির দোতলার দামুদিদি একদম বেড়াল পছন্দ করেন না। আমরাও তাঁকে পছন্দ করি না। কিন্তু এই কাঠখোট্টা দামুদিদি জয়ন্তীদির অসুখে খুব করলেন। অফিস কামাই করে নাওয়া নেই খাওয়া নেই রাতদিন জয়ন্তীদির কাছে পড়ে রইলেন। এই গা মুছিয়ে দিচ্ছেন, বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, চামচে করে খাবার খাইয়ে দিচ্ছেন—সেবাশুশ্রূষা যতটুকু করা সম্ভব করলেন।

আমাদের অবশ্য একটু অসুবিধে হয়েছিল। দামুদিদি আমাদের বেড়ালদের বিছানায় উঠতে দিতেন না, চোখ পাকিয়ে, হাতে একটা হাতপাখা নিয়ে বলতেন, 'অসুখের বিছানায় বেড়াল, যা ভাগ সব, না হলে ঠেঙিয়ে পা ভেঙে দেব।' আমরা ভয়ে ভয়ে খাটের নিচে গিয়ে লুকোতাম। আর দামুদিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা যে যার মতো লাফ দিয়ে খাটে উঠে জয়ন্তীদির কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়তাম। অবশ্য এতে, অসুবিধা ছিল, দামুদিদি হঠাৎ ঘরে ফিরে এলে আমরা পালাতে পথ পেতাম না। একদিন তো ময়নামতী ঘুমিয়ে ছিল, দামুদিদি ঘরে

এসেছে টেরই পায়নি, দামুদিদি এসে হাতপাখার বাঁট দিয়ে ময়নামতীকে একটা কঠিন ঘা লাগালেন, ময়নামতী একটা ম্যাও করে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

ময়নামতী ভীষণ আদুরে বেড়াল। মারধর খাওয়া, অপমান হওয়া তার সাতজন্মে নেই। দামুদিদির কাছে মার খেয়ে সে কী অপমানিত বোধ করল, তা আর বলার নয়। তিন-চারদিন বারান্দায় বসে রইল, আর ঘরের মধ্যেই এল না। তারপর যখন জয়ন্তীদি একটু ভালো হয়ে উঠলেন, প্রথমেই আমাদের খোঁজ করলেন, 'দামু আমার বেড়ালগুলো সব কোথায় গেল?'

জয়ন্তীদির গলা শুনে দামুদিদির উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি, ময়নামতী আর গদাই দৌড়ে জয়ন্তীদির কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শীর্ণ, দুর্বল হাতে জয়ন্তীদি আমাদের আদর করতে লাগলেন, আমরা আহ্লাদে ঘড়ঘড় করতে লাগলাম। দামুদিদি এসে জয়ন্তীদিকে বললেন, 'জয়ন্তীদি আপনি এই অসুখের মধ্যে বেড়ালগুলো ঘাঁটবেন না।' জয়ন্তীদি দুর্বল গলায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, থাকুক না একটু আমার কাছে,' বলে আমাদের আরও জড়িয়ে ধরলেন।

এখানে একটা কথা বলে নিই। কেষ্টা আর গদাই আসলে একই বেড়াল। গদাই ছিল পাশের বাড়ির বেড়াল, তারা ওকে কেষ্টা বলে ডাকত। পাশের বাড়ির ভাড়াটেরা চলে যাওয়ায় কেষ্টা এসে জয়ন্তীদির এখানে বাসা বেঁধেছে। আগেও মাঝেমধ্যে দিনেরাতে পাঁচ-সাতবার ঘুরে যেত, এখন পাকাপাকি ভাবে থাকছে। কিন্তু মজার কথা হল যে জয়ন্তীদি ওকে কেষ্টা বলে ডাকেন না, জয়ন্তীদির শ্বশুরমশায়ের নাম নাকি ছিল কৃষ্ণচন্দ্র তাই ওই নামে ডাকতে পারেন না। কেষ্টাকে ডাকেন গদাই বলে।

কেষ্টা ওরফে গদাইয়ের কথা আস্তে আস্তে বলব। তার আগে অসুখের সময়টার কথা শেষ করে নিই।

শুধু ওপরতলার দামুদিদি নয় কল্যাণীরা জয়ন্তীদির অসুখের সময় খুবই করেছে। কল্যাণী তো দু-বেলাই এসে দেখে যেত। কখনও চারটে কমলালেবু নিয়ে আসত, কখনও দুটো আপেল বা এক ঠোঙা আঙুর।

কল্যাণীর পাগলাদাদু আসতেন প্রত্যেকদিন সকালে ন-টার ভোঁ বাজার দশ মিনিটের মধ্যে। প্রত্যেকদিন নিয়ম করে পাগলাদাদু আমাদের তিনজনের তিনটে বরফি সন্দেশ নিয়ে আসতেন। জয়ন্তীদির শরীর খারাপ, জয়ন্তীদি কিছু খাচ্ছে না, আমাদেরও কিছুই খেতে ইচ্ছে করত না। তাছাড়া তারু ছোঁড়াও আমাদের খাবার টাবার ঠিকমতো দিত না। তবু পাগলাদাদুর সন্দেশটা আমরা তিনজনেই খেতাম। আমাদের প্রায় জোর করেই মুখের কাছে ধরে ভেঙে ভেঙে সন্দেশ খাইয়ে দিতেন, আর বলতেন, 'প্রিয় মার্জারবৃন্দ অকারণে উপবাস করিয়া কৃশ হইও না। তোমাদের

হেডমিস্ট্রেস শীঘ্রই ভালো হইতে যাইতেছে।' পাগলাদাদু আমাদের খাইয়ে, প্রত্যেকদিন তারুকে বিনা কারণে পঁচিশ পয়সা বকশিস দিয়ে, দামুদিদিকে তাঁর সেবাপরায়ণতার জন্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তারপর জয়ন্তীদির দিকে একবার তাকিয়ে ম্লান হেসে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যেতেন।

কল্যাণীর মা-বাবাও মধ্যে মধ্যে এসে দেখে গেছেন, ডাক্তার-ওষুধের খোঁজ নিয়েছেন, দামুদিদির কাছে টাকাপয়সার কী অবস্থা. অসুবিধে হচ্ছে কি না জানতে চেয়েছেন, 'না না, এই ড্রয়ারের মধ্যে অনেক টাকা রয়েছে, আর ফুরিয়ে গেলে আমার কাছে তো আছেই।'

জয়ন্তীদি যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন তখন এক দুপুরবেলা কল্যাণীর মা এলেন, এসে জয়ন্তীদিকে বললেন, 'আপনার খোকাকে আমরা অনেক চেষ্টা করে কাল ফোনে ধরতে পেরেছি। অতদূরে আমেরিকা থেকে কথা বলল, মনে হল যেন পাশের ঘর থেকে কথা বলছে।'

জয়ন্তীদি ধরা গলায় বললেন, 'খোকার গলার স্বর কি একই রকম আছে?' কল্যাণীর মা একটু চিন্তা করে বললেন,'একই রকম তো মনে হল। আমি খোকাকে বললাম আপনার শরীর খারাপের কথা। খোকা বলল, সে খুব চেষ্টা করবে দু-একসপ্তাহের জন্যে আসতে। কিন্তু কলকাতায় এখন খুব গরম পড়েছে। গরমের পরে আসবে কি না তাই ভাবছে।

জয়ন্তীদি কেমন আনমনা হয়ে গেলেন, 'কই, তেমন গরম তো কিছু পড়েনি।'

কল্যাণীর মা কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন। জয়ন্তীদি বিছানার দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বসে ময়নামতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমাকে বললেন, 'এই আনুমানু, গরম কী এবার তাড়াতাড়ি পড়ে গেল।' আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। আমার মাত্র চার মাস বয়েস। তার পুরোটাই কাটল শীতের মধ্যে, গরমের দিন কেমন, তা আমি কিছুই জানি না।

ধীরে ধীরে গরমের দিন এসে গেল। ঠিক ধীরে ধীরে বলা বোধ হয় উচিত হবে না। হঠাৎই যেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গরম খুব বেশি পড়ে গেল।

সেবার সত্যই খুব গরম পড়েছিল এই শহরে। বেলা এগারোটা বারোটা নাগাদ জানলার বাইরে তাকালে রোদ্দুরের হলকায় চোখ ঝিমঝিম করত।

আমাদের বেড়ালদের রোদ্দুরে আর গরমে খুব কষ্ট। নাক ঘেমে যায়। গলা শুকিয়ে যায়, সমস্ত গা জ্বালা করে। গদাইয়ের একটু বয়েস হয়েছে, ওর শরীর থেকে লোম উঠতে লাগল। গরমে গদাই একেবারে কাহিল হয়ে গেল। একটু-আধটু কার্নিশে অথবা রাস্তায় বেড়িয়ে এসে শরীর ভালো থাকে, কিন্তু গদাই তাও করল না। সারাদিন বাইরে যখন তাপ আর হলকা, গদাই খাটের নিচে একেবারে

অন্ধকার কোণে গিয়ে মড়ার মতো জিব বার করে শুয়ে থাকত। অনেকদিন খেতেও বেরোত না। জয়ন্তীদি কিংবা তারু ডাকাডাকি করলে একটু মাথা উঁচু করে দেখে আবার কাদা হয়ে শুয়ে পড়ত।

আমি আর ময়নামতী অবশ্য অতটা কাহিল হইনি। তবে পারতপক্ষে দিনের বেলায় বাইরে বেরোতাম না। আর কড়া রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করা বেড়ালদের স্বভাবও নয়। শীতের দিনের রোদ যেমন আমাদের খুব পছন্দ তেমনিই অসহ্য গরমের দিনের রোদ।

তবে তখন আমি বড়ো হয়েছি, প্রায় একটা পুরোপুরি বেড়াল হয়ে উঠেছি। সন্ধ্যার দিকে যখন দক্ষিণের হাওয়া উঠত তখন জয়ন্তীদিদের বাড়ির পেছনে পাঁচিলটা টপকে যেখানে একটা ফাঁকা জায়গা মতোন আছে সেখানটা ঘুরতে যেতাম। আমার খুব ভালো লাগে এই টুকরো জায়গাটা, গাছের পাতা চার পাশে ছিটিয়ে রয়েছে। এপাশে-ওপাশে দু—একটা লতাগাছ, ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, পাশের একটা ছাইগাদার উপরে উঠে বসে থাকতাম।

কখনও দক্ষিণ দিকের বাড়িটার পাঁচিল ধরে, তারপর একটা দেওয়াল টপকিয়ে আরও একটা পাঁচিল ধরে, এটা আবার খুব বড়ো বাড়ির পাঁচিল, খুব লম্বা, একেবারে পেছনের রাস্তার মোড়ে পৌঁছে যেতাম। এই মোড়টা একটু নির্জন ও ছোটো। তবু কত রকম লোকজন, দোকান পাট, গাড়ি-ঘোড়া, আমি পাঁচিলের ওপর থেকে একটু দেখেই বাড়ি ফিরে আসতাম।

আমাদের বাইরে ঘোরার সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল কুকুরেরা। কুকুরেরা আমাদের চিরশত্রু। দেখলেই তাড়া করে আসে যেন তাদের পাকা ধানে আমরা বেড়ালরা মই দিয়েছি। আমরা কিন্তু কখনও কুকুরদের নিজের থেকে কিছু বলি না। শুধু আক্রমণ করলে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে মুখ ভেংচিয়ে একটু জোরে 'ফ্যাঁস' করে দিই, তাতেই কুকুরেরা বেশ ভয় পেয়ে যায়।

তবে সব কুকুরই বেড়ালদের শত্রু তা বোধহয় নয়। ওদিককার একটা একতলা বাড়িতে একটা সোনালি রঙের নাদুসনুদুস গোলগাল বেড়াল আছে। আমরা আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে তাকে দেখতে পাই। তাকে তার বাড়ির লোকেরা ডাকে কুটুস বলে। ওই বাড়িতে কাটুস বলে একটা কুকুরও আছে, বিরাট বাঘের মতো একটা বড়ো কুকুর। যখন গর্জন করে কোনও কারণে, পুরো পাড়াটা যেন থমকে থমকে কাঁপতে থাকে। সেই কাটুসের সঙ্গে কুটুসের কিন্তু খুব ভাব। আমি ছাদের রেলিং-এ বসে দেখেছি, কুটুস কাটুসের সঙ্গে লেজ নাচিয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে এমন কী কাটুসের কোলে শুয়ে পিঠে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার খুব

ইচ্ছে একদিন গিয়ে কুটুসের সঙ্গে গল্পগুজব করি। কাটুস কুটুসকে কিছু বলে না কিন্তু আমাকে কিছু বলবে না তার কী ঠিক আছে।

আমাদের এ বাড়ির বেড়ালদের আরেক শত্রু তারু। আমাদের খেতে দেয় বটে কিন্তু জয়ন্তীদি সামনে না থাকলে তার মধ্যেও চালাকি করে। আর অনেক সময় আমাদের সঙ্গে খুব বদমায়েশিও করে।

এই তো সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ির পেছনের ছাইগাদার ওপরে বসেছিলাম, চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মন খুব ভালো লাগছিল, ভাবছিলাম, গান গাই। অবশ্য তখন ওখানে বসে গান গাইতাম না। আমাদের বেড়ালদের গান গাইবার প্রিয় জায়গা রান্নাঘরের ছাদ কিংবা বারান্দার কার্নিশ। আর গান গাইলে অনেক সময় আমাদের সঙ্গী-সাথী জুটে যায়। তবে মানুষেরা এ ব্যাপারটা কেন যেন একদম পছন্দ করে না।। তাই সাধারণত আমরা অনেক রাতে মানুষজন ঘুমিয়ে পড়লে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গান গাই।

সেদিন কিন্তু গান টান কিছু গাইনি। ওই ছাইগাদার ওপরে নরম হয়ে বসেছিলাম। পেছনের রাস্তা দিয়ে বাজারের থলে হাতে হেঁড়ে গলায় নিজেই উল্টোপাল্টা গান গাইতে গাইতে তারু আসছিল, হঠাৎ রাস্তা থেকে আমাকে দেখে একটা ইটের টুকরো তুলে ছুঁড়ে মারল। দ্রুত একটু সরে গেলাম। তাই গায়ে লাগল না।

এরপর দৌড়ে পাঁচিলে উঠে দিয়ে একটু বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড। তারু জয়ন্তীদিকে বলেছে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, আমাকে নাকি সে আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে দেখেছে।

আমি জয়ন্তীদিকে যত বলি আঁস্তাকুড়ে নয়, আমি বসেছিলাম ছাইয়ের গাদায়, কে কার কথা বোঝে। জয়ন্তীদি জোর করে ধরে সেই রাতের বেলা আমাকে দু-ঘটি জল ঢেলে স্নান করালেন। আমার ফোলা ফোলা লোম, মোটা লেজ সব নেতিয়ে পড়ল, আমি একেবারে ভেজা বেড়াল হয়ে গেলাম।

জয়ন্তীদি অসুখের জন্যে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অসুখ সারার পর মাস দেড়েক ছুটি নিয়ে তারপরে ছুটির শেষে একেবারে ইস্কুলে গেলেন যখন বৃষ্টি এসে গেছে। গরম চলে গেছে, তা নয়। তবু বৃষ্টিতে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হচ্ছে।

সেই গরম শেষ হয়ে গেল, বর্ষাকালও গেল, তারপরে আবার শীত এল আবার গরম আবার বর্ষা। আমি সম্পূর্ণ বড়োসড়ো হয়ে গেলাম। জয়ন্তীদি আরও একটু বুড়িয়ে গেলেন।

জয়ন্তীদির ছেলে খোকা কিন্তু এল না। শুধু হঠাৎ মাঝে মাঝে ছবির পোস্টকার্ড আসে খুব তাড়াতাড়িতে লেখা দু লাইন সামান্য চিঠি।

তুমি কেমন আছ? আমি ভালো।

ইতি ঃ খোকা।

দিন যায়, জয়ন্তী দিদিমণি স্কুলে যান, স্কুল থেকে ফেরেন। আবার একেক সময় একদিন, দুদিন কখনও পাঁচ-সাতদিন বা মাসখানেক ছুটি থাকে, জয়ন্তীদি বাসায় বসে বসে বই পড়েন খবরের কাগজ পড়েন, স্কুলের খাতা-পত্র দেখেন, কখনও কখনও একটু আধটু ভুল দেখলেই জয়ন্তীদি অল্পেই বড়ো রেগে যান।

শীত-গরম-বর্ষা এ সব ছাড়াও জয়ন্তীদির বাড়িতে থেকে আমরা আরও দুটো জিনিস বুঝে গেছি। তা হল হাফ ইয়ারলি আর অ্যানুয়াল। তখন খুব সকাল-সকাল জয়ন্তীদি বেরিয়ে যান, ফেরেন সন্ধ্যার পরে। কখনও কখনও খাতার বাণ্ডিল নিয়ে রিকশা চড়ে।

আমি কখনও রিকশায় চড়িনি। আমার খুব রিকশায় চড়তে ইচ্ছে করে। গত বছর শীতের সময় একদিন দুপুরের রাস্তায় কুকুরগুলো ছিল না। রিকশা-ওয়ালাটা রোদ্দুরে. রিকশাটা দাঁড় করিয়ে ফুটপাথের রোদ্দুরে গামছা পেতে ঘুমোচ্ছিল। আমি আলগোছে গিয়ে রিকশাটার গদির ওপরে খুব আরাম করে শুয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল করিনি। হঠাৎ দোলানি লেগে দেখলাম রিকশাটা নিয়ে রিকশাওয়ালা উঠে দাঁড়িয়েছে, চলাও শুরু করে দিয়েছে। ভাগ্যে-জেগে গিয়েছিলাম, না হলে কোথায় চলে যেতাম কে জানে। এক লাফে পালিয়ে এলাম।

জয়ন্তীদি যখন খাতার বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আসতেন তখন কোনও কোনও সময় মেয়েরা দল বেঁধে আবার কেউ একা-একা জয়ন্তীদির কাছে আসত। কেউ কেউ কেন যেন কান্নাকাটি করত। অনেক সময় কারও কারও বাবা-মাও আসত, এসে অনুনয় বিনয় করত। এবারের মতো ছেড়ে দিন, ঠিক পরীক্ষার আগেই ওর মামার বিয়ে পড়ে গেল, দেখবেন, সামনের বার খুব ভালো ফল করবে। আমি কথা দিচ্ছি নিজে দেখাশোনা করব।

ওরা বলে যাওয়ার পরে জয়ন্তীদি গজগজ করতেন, ধরাধরিতে আর পারা যায় না কবে যে নতুন বড়দিমণি আসবে, যত ঝামেলা আমার ঘাড়ে। তারপর হয়তো আমাকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কী রে কী বলিস, ছেড়ে দেব এবারের মতো? মেয়েটা তো খুব খারাপ নয় কিন্তু ওর বাবা ওকে কী পড়াবে? তার কথাবার্তা শুনে মনে হল সে নিজেই একটা আকাট মূর্খ। মেয়েকে পড়াতে গেলে সে আরও ক্ষতি করবে।'

এই রকম ভাবেই পরের বছর অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে। সেটাও একটা নরম শীতের দিন। হঠাৎ এক সকালবেলায় ওই নটা বাজার একটু পরে পাগলাদাদু দুই-

হাতের দুই কোলে ছোট্ট পেস্তা আর কিসমিসকে নিয়ে জয়ন্তীদির ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। জয়ন্তীদি তখন বিছানায় বসে মন দিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছেন, পাগলাদাদু ছানা দুটোকে বিছানার ওপরে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হেডমিস্ট্রেস মহাশয়া, আপনার জন্যে ঘুষ আনিলাম।' জয়ন্তীদি ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই বিছানার ওপরে ছাড়া পেয়ে পেস্তা আর কিসমিস ছুটে জয়ন্তীদির আঁচলের পেছনের দিকে গিয়ে লুকোলো।

শুধু জয়ন্তীদি নয় পেস্তা আর কিসমিসকে দেখে আমরাও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বেড়ালছানা এত সুন্দর হতে পারে তা ভাবা যায় না। গায়ে কোনও হাড়-মাংস আছে তা মনে হয় না। শুধু রঙিন উলের মতো লোম, খোকার পাঠানো পিকচার পোস্টকার্ডের আকাশের মতো নীল চোখ আর গোলাপি রঙের নাক আর থাবা।

তবু জয়ন্তীদি ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন, 'আমি তিনজনকে নিয়েই সামাল দিতে পারছি না। আবার এ দুটো?'

পাগলাদাদু দরজার দিকে পা বাড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'লইতেই হইবে, ইহা উপহার নহে, ইহা ঘুষ। ইহা গ্রহণ করা পবিত্র কর্তব্য।' তারপর হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তমালী সেন ক্লাস সেভেন সি আঠারো নম্বর রোল সে যেন প্রমোশন প্রাপ্ত হয়।'

'ক্লাস সেভেনের লিস্ট তো হয়ে গেছে। দেখি আমার কাছেই আছে।' জয়ন্তীদি টেবিল থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে এক তাড়া কাগজ বের করলেন। তার পরে চোখের চশমাটা শক্ত করে নাকের ওপর চেপে একটা ফর্ম ভালো করে দেখে, হেসে বললেন, 'তমালী সেন তো ভালোই করেছে? এক ডাকে প্রমোশন পাবে। তার জন্যে বেড়ালছানা দিতে হবে না।'

পাগলাদাদু খুশি হয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, 'চমৎকার হইল। তমালীদের মার্জার শাবকদ্বয় ভালো থাকিবার জায়গা পাইল। তমালী পাস করিল। পবিত্র হেডমিস্ট্রস ঠাকুরানীকে অসাধু কার্য করিতে হইল না। ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।'

এই বলে পাগলাদাদু ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন, জয়ন্তীদি কী যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, করা হল না।

কিন্তু একটু পরেই পাগলাদাদু আবার ফিরলেন। পূর্ণ ঘোষের দোকান থেকে কয়েকটা সন্দেশ নিয়ে এসেছেন, বললেন, 'মিস তমালী সেনের পাসের মিষ্টি।' বলে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে ছোটো সন্দেশ দিয়ে দুটো সন্দেশ টেবিলের ওপর রাখলেন।

জয়ন্তীদি একবার জিজ্ঞাসা করলেন 'তমালী মেয়েটা কে?' পাগলাদাদু বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'তমালী খুব ভালো মেয়ে। ট্রাম রাস্তার মোড়ে বাড়ি। সকালে আমি যে কুকুরদের মুড়ি খাওয়াই, রাত্রে সে তাহাদের ভাত দেয়।'

পাগলাদাদু চলে গেলেন। জয়ন্তীদি সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যত সব কাণ্ড।'

ততক্ষণে পেস্তা আর কিসমিস, তখনও তাদের অবশ্য ওই নাম দেওয়া হয়নি। তাদের দেওয়া পাগলাদাদুর সন্দেশ দুটো না খেয়ে সে দুটো নিয়ে খাটের ওপরে ফুটবল খেলা শুরু করে দিয়েছে।

৮

আমার নাম মানুআনু। জয়ন্তী দিদিমণির শখের বেড়াল আনুমানু আমি আর সে একই। আমি হলাম আনুমানুর ছায়া। আনুমানুর ডান দিকটা আমার বাঁদিক, আর আনুমানুর বাঁ দিকটা আমার ডানদিক।

কিন্তু আনমানু যখন হাই তোলে আমিও তখন হাই তুলি। আনুমানু যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা আড়মোড়া ভাঙে তখন আমিও তাই করি। সেই যে আনুমানু ছোটোবেলায় এ বাড়িতে এল তখন থেকেই আমি তার সঙ্গে আছি যতক্ষণ সে আয়নার সামনে থাকে। আর আয়নার সামনে থেকে গেলে আমিও নিঃশব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই।

এই আয়নাটা যার মধ্যে আমি থাকি, এটা খুব ভালো কাচের। জয়ন্তী দিদিমণির বিয়ের স্টিলের আলমারির গায়ে লাগানো লম্বা এক পাল্লা বেলজিয়াম কাচ, এটা এখনও ঘষলে মুছলে ঝকঝক করে।

এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আগে জয়ন্তীদি এত সাজগোজ করেছেন, এখন তো দিনের মধ্যে একবারও দাঁড়ান না, এমন কী মাথা আঁচড়ানোর সময়ও না। জয়ন্তীদির বর খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে চুলের সিঁথি জামার কলার অনেকক্ষণ ধরে আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিকঠিক করতেন। জয়ন্তীদির ছেলে খোকা, শুভ্র রায়চৌধুরী যে এখন কোথায় দূরে চলে গিয়েছে যার কথা জয়ন্তীদি রাতদিন বকবক করেন সেই খোকা এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়িয়ে স্কুলে যেত, কলেজে যেত। ছোটোবেলায় নতুন জামাকাপড় কিনলে সেটা পরে এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত। যেদিন বিদেশে গেল, সেদিনও আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা টাই খুব কসরত করে গলায় বাঁধল। তারপর একটু পরে কিছুটা টানাটানি করে বোকার মতো

আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থেকে মাকে বলল 'মা টাইটা পরে আমার একদম ভালো লাগছে না। কেমন অস্বস্তি দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে।' জয়ন্তীদি খোকার সুটকেসটা হাত দিয়ে উঁচু করে দেখছিলেন কতটা ভারি। খোকার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ভালোই তো দেখাচ্ছে। দেখবি আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে।'

আমি আনুমানুর ছায়া মানুআনু। কিন্তু আমি আরও সকলেরই ছায়া। পেস্তা, কিসমিস, জয়ন্তীদি, খোকা, তারু। যেই আয়নাটার সামনে আসে আমি তারই ছায়া।

তবু আনুমানুর সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। সেই ছোটোবেলায় প্রথম এসে আয়নায় আমাকে প্রথম দেখে ও ভেবেছিল আমি আর একটা বেড়ালছানা। তারপর যত দিন গেছে আমি আনুমানুর সঙ্গে বড়ো হয়েছি কিন্তু আনুমানু এখনও ভাবে আমি অন্য একটা বেড়াল। সে জানেই না আমি তার ছায়া। এখনও আমার সঙ্গে সে খেলা করতে আসে। কাচ ধরে এগিয়ে এগিয়ে আলমারির পেছনে গিয়ে আমাকে খোঁজে, কিন্তু তখন আমি কোথায়? আয়নার সামনে থেকে সে যেই সরে যায় আমিও সরে যাই।

অন্য বেড়ালরা কেউ কেউ ছোটোবেলায় আনুমানুর মতোই আমাকে আলাদা ভেবেছে। বড় হয়ে তারা সেয়ানা হয়ে গেছে, আমার দিকে আর ফিরেও তাকায়নি।

কিন্তু আনুমানু বড় সরল, বড় নরম। কত বড়ো হল কিন্তু সেই বেড়ালছানা ভাবটা এখনও গেল না।

আনুমানু ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নেই। মারামারির মধ্যে নেই কোনও কোনও বেড়াল খুব লোভী হয়, যেমন অলক্ষ্মী, যেমন ময়নামতী। ময়নামতী যে কত লোকের বাড়ির মাছ দুধ চুরি করে খেয়েছে তার হিসেব করা যাবে না। কেউ হয়তো রান্নাঘরে শিকল দিতে ভুলে গেছে, কেউ ভুল করে জালের আলমারিটা আটকায়নি, সঙ্গে সঙ্গে ময়নামতী সেখানে হাজির।

আর অলক্ষ্মীটাও দারুণ চতুর ও লোভী। আজকাল লোডশেডিং-এর জন্যে অনেক সময় লোকেরা ফ্রিজের দরজা খুলে রাখে যাতে খাবার দাবার পচে না যায়। এই তো পরশুদিন অলক্ষ্মী উল্টোদিকের বাড়ির দোতলায় খোলা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে এক বাটি মাছ ভাজা ছিল সব খেয়ে নিয়েছে চুপিসাড়ে। তারপর কী হইচই, চেঁচামেচি 'ওই কালো বেড়ালটা আমাদের সব মাছ খেয়ে নিয়েছে চুপিসাড়ে।' ওদের বাড়ির ঝি এসে জয়ন্তীদির কাছে কত খারাপ খারাপ নালিশ করে গেল 'ওই কালো শয়তান, অমঙ্গুলে বেড়াল। ওটাকে আমরা ধরতে পারলে পিটিয়ে মেরে ফেলব। জয়ন্তীদি নিঝুম, বসে বসে গালাগাল খেলেন।

পেস্তা বা কিসমিস ঠিক লোভী নয়। তবে বড়ো বেশি মনমেজাজি। আজ সকালেই পেস্তা দোতলায় দামুদের একটা মাদার ডেয়ারির দুধের প্যাকেট নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, সারা দোতলা দুধে ভাসাভাসি। তারপরেই পেস্তা পালিয়ে এসেছে কিন্তু দুধের গন্ধ পেয়ে ওপরের বারান্দায় বোকা ময়নামতী দুধ চাটতে গিয়ে দামুর লেডিজছাতার এমন এক বাড়ি খেয়েছে যে এখনও বাঁকা হয়ে হাঁটছে।

আর আনুমানু বড় পরিচ্ছন্ন ফিটফাট। সেই ছোটোবেলা থেকে। সব সময় নিজেকে মেজে ঘষে চেটে-পুটে ঝকঝকে করে রাখে। অল্প বয়েসে একটা দোষ ছিল কখন-সখন। ছাইগাদায় আঁস্তাকুড়ে ঘুরতে যেত, আজকাল তাও যায় বলে মনে হয় না। সকালে বিকালে দু-একবার ছাদের বা পাঁচিলের ওপর থেকে ঘুরে আসে। কখনও জানলার পাশে চুপ করে বসে থাকে, চারদিক দেখে আর আকাশ -পাতাল ভাবে।

আমি মানুআনু, আনুমানুর ছায়া। কেউ হয়তো বলতে পারে আমি আনুমানুর প্রশংসা করবই। কিন্তু আমি তো আর সবার ছায়ার প্রশংসা করছি না। এই তো চমৎকার বেড়াল ছিল কিসমিস, রাজপুত্রের মতো সুন্দর। কিন্তু আজকাল কী পাজি আর ধূর্ত হয়েছে সে। অমন সুন্দর বেড়ালছানা একটা অতি ঝগড়াটে হুলো বেড়ালে পরিণত হয়েছে। পেস্তাও পাজি হয়েছে, কিন্তু তার গাম্ভীর্য আছে, আত্মসম্মান বোধ আছে। বাউণ্ডুলে নয় ভাইয়ের মতো, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় না।

তাছাড়া পেস্তার ওপরে সকলেরই একটু মায়া আছে। পেস্তার দুবার সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু দুবারই কিসমিস এসে ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলোকে জন্মানোর পরই তখনও চোখটোখ তাদের ফোটেনি, মেরে খেয়ে ফেলেছিল। দুবারই কিসমিস এটা করেছিল পেস্তা যেই একটু ঘরের বাইরে গেছে সেই মুহূর্তে এসে। বোধহয় ঘরের বাইরে কোথাও মোক্ষম মুহূর্তের জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল। ফিরে এসে বাচ্চাগুলোকে না পেয়ে পেস্তার সে কী আকুলি বিকুলি, সে কি কান্না।

জয়ন্তীদি বুঝতে পেরেছিলেন পেস্তার বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু তার পরে কী হয়েছিল সেটা ধরতে পারেননি। তিনি শুধু পেস্তাকে বলেছেন, 'বাচ্চাগুলোকে বাসায় না দিয়ে, অন্য কোথায় দিয়ে দিলি?' কখনও কখনও পেস্তাকে ধমক দিতেন 'এই বোকা যা বাচ্চাগুলোকে দুধ দিয়ে আয়। সেগুলো তো না খেয়ে মারা যাবে।'

জয়ন্তীদির অবশ্য এ সব কথা বলার একটা কারণ ছিল। এ বাড়ির যে অন্য

একটা মেনি বেড়াল ময়নামতী সে ওই কিসমিসের ভয়েই হোক আর যে জন্যেই হোক যখন ছানা হওয়ার সময় হোত আশেপাশের বাড়ির চিলেকোঠায় বা অন্ধকারে গিয়ে বাচ্চা দিত। অনেকবার লোকেরা এসে জয়ন্তীদিকে বলেছে, 'আপনার বেড়াল আমাদের বাড়িতে এসে বাচ্চা দিয়েছে।'

আবার দুদিন পরে দেখা যেত ছানাগুলোকে মুখে করে এ বাড়ির দেয়াল ধরে ও বাড়ির ছাদে লুকোতে নিয়ে যাচ্ছে।

আনুমানু কিন্তু হুলো বেড়াল। সে কখনও বাচ্চা দেয়নি। হুলো বলেই কিসমিস কখনও কখনও আনুমানুকে দেখে গজরাতো। কিন্তু আনুমানু এতই শান্ত আর নিরীহ যে কোনওদিন কারও সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করেনি। ছেলেবেলা থেকেই তার একটাই খেলা, সেটা তার নিজের লেজ নিয়ে। মেঝেতে শুয়ে শুয়ে দুই পায়ের থাবার মধ্যে লেজটাকে রেখে উল্টে যাওয়া। আরও একটা খেলা আছে তার, সেটা ঠিক খেলা নয়। আয়নার মধ্যে আমাকে খোঁজা, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা।

গদাই মানে কেষ্টা বলে যে বেড়ালটা আছে সে একবার কিসমিসের কাছে মার খেয়ে হঠাৎ বিনা দোষে ও আনুমানুকে আক্রমণ করেছিল। আনুমানু ঠিক মতো রুখে দাঁড়ালে গদাই নিজেই বিপদে পড়ত। কিন্তু আনুমানু নেহাতই ভদ্রলোক বলে গদাইকে কিছু বলেনি, শুধু পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল।

বেড়ালদের কথা আনুমানু কিছু বলেছে, আমিও কিছু বললাম। আনুমানু জয়ন্তীদির কথার যে জায়গায় এসে থেমে গিয়েছিল, সেই টেলিগ্রাম আসার জায়গায় এবার আমরা ফিরব।

এখন আর আনুমানু কিছু বলবে না, কারণ সে সবটা জানে না, দেখেওনি। বাকিটুকু আমি অর্থাৎ জয়ন্তীদির পুরোনো আয়না, পুরনো আয়নায় আনুমানুর ছায়া মানুআনু বলছি। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে, কারও কারও হয়তো ঘুলিয়ে যেতে পারে তাই পরিষ্কার করে রাখলাম।

সেই যে টেলিগ্রাম এসেছিল জয়ন্তীদির কাছে, জয়ন্তীদির ভাইপো নান্টুর কাছে তাতে খবর এল যে খোকা, মানে শুভ্র রায়চৌধুরী জয়ন্তী দিদিমণির একমাত্র ছেলে এতদিন পরে একমাসের জন্যে আমেরিকা থেকে আসছে মায়ের কাছে।

তার পেয়ে জয়ন্তীদি হাসবেন না কাঁদবেন কিছু ঠিক করে উঠতে পারেন না। খোকা যে আর কোনওদিন ফিরে আসবে, আবার তাকে তিনি দেখতে পাবেন সে কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। মুখে তিনি যাই বলুন, মাসে দুমাসে ছেলের এক আধটা সংক্ষিপ্ত পোস্টকার্ড পেয়ে তার আশা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন।

একটু ধাতস্থ হওয়ার পরে জয়ন্তীদির প্রথম চিন্তা হল তাঁর ঘর দোর নিয়ে।

এই বাড়িতেই খোকা বড়ো হয়েছে, এ বাড়ি থেকেই খোকা টাই পরে চামড়ার সুটকেস হাতে করে বাড়ির সামনে থেকে ট্যাক্সিতে উঠল বিদেশ যাওয়ার জন্যে, ট্যাক্সিতে খোকার দুই বন্ধুর সঙ্গে দোতলার দামুদিদিকে নিয়ে জয়ন্তীদি উঠলেন খোকাকে দমদম পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। খোকা ক্ষীণ আপত্তি জানিয়েছিল, 'ন মাসের মধ্যেই তো ফিরছি এত অস্থির হচ্ছ কেন? তারপর দামুকে বলেছিল, 'তুমি মাকে নিয়ে দমদম থেকে একা ফিরতে পারবে?' দামু মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'খোকাদা, আমাকে আর অত ছোটো ভাববেন না। আপনার মতো আমেরিকা গেলেও আমি একা ফিরতে পারব।'

সেই খোকাকে নিয়ে এখন চিন্তা জয়ন্তীদির। পাশের ঘরটা যেটায় খোকা থাকত সেটাতো খালিই রয়েছে। কিন্তু এতদিন পরে, আমেরিকায় অত ভালো ভালো ঘর-বাড়িতে থাকার পরে এই ঘরদোরে কী সে থাকতে পারবে? তার নোংরা লাগবে না, অন্ধকার লাগবে না, মশা লোডশেডিং-এ কষ্ট হবে না? তাঁর ইস্কুলের এক শিক্ষয়িত্রীর ভাইপো বিলেত থেকে আড়াই বছর পরে ফিরে এসে হোটেলে উঠেছিল, বাসায় থাকেনি—সে কথাটাও জয়ন্তীদির মনে পড়ল।

তাছাড়া এই বেড়ালগুলো। এ গুলোকে খোকা তো দেখে যায়নি।

যতদিন খোকা ছিল, এ বাড়িতে একটাও বেড়াল ছিল না। এই যে জয়ন্তী দিদিমণি। যাকে আড়ালে আবডালে পাড়ার লোকেরা, এমন কী তাঁর ইস্কুলের মেয়েরা পর্যন্ত বেড়াল দিদিমণি বলে, আট দশবছর আগে তিনি নিজেই জানতেন না এতগুলো বেড়াল একদিন তাঁর সব সময়ের সঙ্গী হবে।

জয়ন্তী দিদিমণি যে ইস্কুলে আছেন, সেই ইস্কুল, স্যার হরনাথ গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারি বিদ্যালয়ের বাংলার টিচার রমলাদি জয়ন্তীদির অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু। জয়ন্তীদি একটু ভারিক্কি ধরনের লোক, নরম মনের মানুষ। কিন্তু শোকে-তাপে তারপর অনেকদিন মাস্টারি করে কেমন যেন গম্ভীর প্রকৃতি হয়ে গেছে তাঁর, আদতে এমন কিন্তু ছিলেন না। বেশ হাসি খুশি ঝলমলে লোক ছিলেন। আমার এই আয়নার মধ্যে তাঁর সেই রঙিন দিনের অনেক ছায়া রয়ে গেছে।

রমলাদি আগে জয়ন্তীদিকে নাম ধরেই ডাকতেন, তারপরে জয়ন্তীদি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের হলেন, হেডমিস্ট্রেসের কাজ দেখতে লাগলেন তখন আর সরাসরি নাম ধরে না ডেকে মিসেস রায়চৌধুরী বলতে লাগলেন। কিন্তু যখন দুজনে মুখোমুখি কথা বলেন তখন রমলাদি জয়ন্তীদিকে আজকাল একটু হালকা করে বলেন বেড়াল ঠাকুরঝি।

ওই রমলাদি আর পাগলাদাদু, তাছাড়া ফাজিল ভাইপো নাণ্টু ছাড়া আর কারও সঙ্গে জয়ন্তীদির এখন আর রসিকতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু জয়ন্তীদি কী আমুদে ছিলেন, এই ঘর একদিন হাসিঠাট্টা, আড্ডায় গমগম করত। জয়ন্তীদি হেসে গড়িয়ে পড়ে যেতেন, হাসতে হাসতে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যেত। ছোটোছোটো সামান্য ব্যাপারে মজা পেতেন। একবার খোকা ইস্কুলের ভূগোলের খাতায় আফ্রিকার তিনটি জন্তুর-নাম লেখার প্রশ্নে উত্তর লিখেছিল তিনটি সিংহ। কোথায় রাগ করবেন, জয়ন্তীদি সেই খাতা দেখে এত হেসেছিলেন। আরেকবার খোকার বাবা মাথায় চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনি ভেঙে ফেলেছিলেন, এই সামান্য কারণে জয়ন্তীদির সে কী হাসি।

সে সময়ে মাঝে মাঝে পাগলাদাদু আসতেন, উদ্ভট সব কথা বলতেন। একবার বলেছিলেন, আগের রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছেন, একটা কুমড়ো কাটার মেশিন বেরিয়েছে। তার মধ্যে কুমড়ো ঢুকিয়ে দিলেই আড়াইশো গ্রামের একটা ফালি বেরিয়ে আসে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য সে মেশিন চালাতো পেট্রোল, বিদ্যুৎ কিছুই লাগে না, কুমড়োর বিচিতেই সেই মেশিন চলে।

সেই সব দিনে এই বেড়ালেরা কোথায়?

জয়ন্তীদি অবশ্য চিরদিনই বেড়ালের ভক্ত। খুব ছোটোবেলায় তাঁর বাপের বাড়িতে দু একটা বেড়াল ছিল। যেমন সব গৃহস্থ বাড়িতেই থাকে। কারও ঠিক পোযা নয়, একা একাই এসে যায়, একা একাই থেকে যায়। কখনও মাছ দুধ চুরি করে গালাগাল খায়, কখনও কেউ একটু কোলে তুলে আদর করে।

বিয়ের পর এ বাড়িতেও ওরকম দু চারটি বেড়াল কখনও কখনও এসেছে। জয়ন্তীদি কখনও তাদের কোলে তুলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। কখনও তারা জয়ন্তীদির পায়ে গা লাগিয়ে যেত, আসত, মিউ মিউ করত। জয়ন্তীদি হয়তো কাউকে এক টুকরো মাছের কাঁটা, এক ফোঁটা দুধ দিতেন। খোকার বাবা খুব পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'বেড়ালের লোমে বড়ো পেট খারাপ হয়।'

খোকার বাবা মারা গেলেন যে দুর্ঘটনায়, তার অনেক বছর পরে খোকা বিদেশ চলে গেল। তখন ফাঁকা বাড়ি শুধু ইস্কুল থেকে ফাঁকা বাড়ি, ফাঁকা বাড়ি থেকে ইস্কুল। কেমন একটা ধূ ধূ শূন্যতা। বাইরে রাস্তাঘাট, মানুষজন, রিকশার টুংটাং, দ্রুত মোটরগাড়ির শব্দ। ছেলেরা খেলা করছে রাস্তায়, লোকেরা বাজারে যাচ্ছে, অফিস করছে। কখনও বন্ধুত্ব করছে, মারামারি করছে, উঠোনে কলতলায় ঠিকে ঝি বাসন মাজছে। ইস্কুলের মেয়েরা হইচই করছে, পাশ করছে, ফেল করছে, সবই হচ্ছে, ঠিকঠাক যেমন হয় হওয়া উচিত। সব কিছুর মধ্যেই জয়ন্তীদির নিজেকে

কেন নির্জন নিঃসঙ্গ মনে হয়, মনে হয় তার নিজের যেন সব কাজ সারা হয়ে গেছে।

সারা সকাল, সারা সন্ধ্যা, আর ছুটির দিনগুলো যেন কিছু করার নেই। আত্মীয়-স্বজন কেউ কখনও হঠাৎ আসে, জয়ন্তীদিও কদাচিৎ কোথাও যান। মাঝে মধ্যে কোনও কোনও সকালবেলায় পাগলাদাদু ক্ষণিকের জন্যে দরজায় দাঁড়িয়ে একটা আধটা মজার কথা বলে চলে যান। খোকার বাবার বন্ধু, জয়ন্তীদিরও পুরোনো বন্ধু। পুরনো দিনের ওই একটাই শেষ সোনালি সুতো।

তখনই একদিন কল্যাণীকে নিয়ে এসেছিলেন পাগলাদাদু। তখন কল্যাণীর সাত আট বছর বয়েস। লাল ফ্রক পরা টুকটুকে মেয়ে। পাগলাদাদু কল্যাণীকে দেখিয়ে জয়ন্তীদিকে বললেন, 'এই ভদ্রমহিলা আগামী বৎসরে হরনাথ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইতে আগ্রহী।'

আরেকদিন পাগলাদাদু এলেন। তাঁর কোলে ধবধবে সাদা বেড়ালছানা। জয়ন্তীদি টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। তাঁর টেবিলের ওপরে বেড়ালছানাটি নামিয়ে দিয়ে পাগলাদাদু বললেন, 'নির্জন গৃহে একজন অভিভাবক দিয়া যাইলাম। 'তারপর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তরতর করে রাস্তায় নেমে গেলেন।

শ্রীযুক্তা জয়ন্তী রায়চৌধুরীর সেই প্রথম নিজের বেড়াল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল বুলবুল। বুলবুলের কথা আনুমানু আগে কিছুটা বলেছে। আমি মানুআনু। আনুমানুর ছায়া জয়ন্তীদির আয়না। বাকিটুকু বলার দায় আমার।

জয়ন্তীদির বেড়ালপোষা বুলবুলকে দিয়ে শুরু হয়েছিল। সেই বুলবুল বড়ো হল, বুড়ো হল। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। জয়ন্তীদি তাকে অনেক খুঁজেছিলেন। এমনকি নিজে বেড়াল হয়েও আনুমানুর ধারণা বুলবুল কী করে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল।

আসল ঘটনাটা হল, বেড়ালরা তাদের রক্তের মধ্যে তাদের মৃত্যুর খবর পেয়ে যায়। সে তখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বেদনাহীন তন্দ্রায় অবসন্ন হয়ে তিলে তিলে তারা হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। তার পরিচিত আবাস ছেড়ে যতদূরে পারে চলে যায়। কখনও সে নিজের বাড়িতে মরতে চায় না। সে তার চেনা জায়গা প্রিয় প্রভু পরিচিত সঙ্গীদের ছেড়ে মৃত্যুর অচেনা পৃথিবীতে একা একা প্রবেশ করার জন্যে চলে যায়। সে কোনওদিনই তার মৃতদেহ তার প্রভুকে দেখতে দিতে চায় না।

বুলবুলও তাই করেছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে সে যত দূরে পারে চলে গিয়েছিল জয়ন্তীদিরা আর তাকে খুঁজে পাননি

সেই বুলবুল থেকে আরম্ভ হয়ে অনেক বেড়াল এল। বেড়ালছানা খুব সুন্দর

জিনিস। একবার বাড়িতে জন্মালে বা এসে গেলে তার ওপর মায়া পড়ে যায়। তখন তাকে ফেলা যায় না। অনেকেরই মন চায় না শখের বেড়ালছানা রাস্তায় ফেলে দিত। তারা চেষ্টা করে কাউকে বেড়ালছানাটা গছিয়ে দিতে, যার কাছে ছানাটা একটু আদরযত্নে থাকবে।

এইভাবে বুলবুলের পর একের পর এক গদাই ওরফে কেষ্টা, ময়নামতী এরা সব এসেছে। আনুমানুকে জয়ন্তীদি নিজে গিয়েই নিয়ে এসেছিলেন। অলক্ষ্মী তো একা একা জোর করে এসেছিল। পেস্তা কিসমিসের কথাও আনুমানু বলেছে।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জয়ন্তী দিদিমণির বাড়িতে এখন ছয় ছয়টা বেড়াল। পাগলদাদু তো জয়ন্তদির বাড়িতে এলে বাড়ি ফিরে গিয়ে কল্যাণীর মাকে বলেন, 'বৌমা অদ্য মার্জার সদনে গিয়াছিলাম তাই বিলম্ব হইল।'

জয়ন্তীদিও সুখে-দুঃখে একা একা আপনমনে এই বেড়ালগুলোকে ভালোবেসে ফেলেছেন।

বেড়ালগুলোর মধ্যে কোনওটা দেখতে খুব ভালো, যেমন পেস্তা। আবার কোনওটা অলক্ষ্মীর মতো কালো কুৎসিত দেখতে। আনুমানুর মতো শান্তশিষ্ট বেড়াল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পাজি কিসমিস। কিন্তু জয়ন্তীদির কাছে এদের কোনরকম তারতম্য নেই। এদের সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। এই বেড়ালগুলো তাঁর জীবনের অসীম শূন্যতাকে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণ করে রেখেছে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে গেছেন।

কিন্তু খোকা আসছে। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকা এতদিন পরে আসছে। সে তো এই বেড়ালগুলোকে দেখে যায়নি। সে কি পছন্দ করবে? সে তো জানেই না যে তার মা এখন এতগুলো বেড়ালের সঙ্গে বসবাস করেন। আর এসব কথা তো চিঠিপত্রে জানায় না।

সাড়ে আট বছর সময়ও কিছু কম নয়। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তীদি মনে মনে হিসেব করলেন, খোকার আসতে আর দু-সপ্তাহও নেই। হু-হু করে কেটে যাবে এই দু-সপ্তাহ। যেমন কেটে গেছে গত সাড়ে আট বছর। সাড়ে আট বছর মানে কম কথা নয়, একশো মাসের বেশি, চার—পাঁচশো সপ্তাহ।

সত্যিই দিন কী তাড়াতাড়ি যায়। টেবিলের নিচে পায়ের কাছে আনুমানু জয়ন্তীদির পায়ের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। জয়ন্তীদি একটু নিচু হয়ে আনুমানুকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে কী যেন মনে করে অনেকদিন পরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আমার সামনে মানে আয়নার সামনে। আমি হলাম আয়না, আমি আনুমানুর ছায়া মানুআনু, আমি জয়ন্তীদিরও ছায়া। যে আমার সামনে দাঁড়ায় আমি তারই ছায়া।

কতকাল জয়ন্তীদি আমার সামনে এসে দাঁড়াননি। কোনও রকমে চুল আঁচড়ে নিয়ে শাড়ি পরে স্কুলে চলে গিয়েছেন। কখনও কাজেকর্মে বাইরে বেরিয়েছেন কিন্তু আমার সামনে তাঁর আসার প্রয়োজন পড়েনি।

আনুমানুকে কোলে নিয়ে জয়ন্তীদি আনমনাভাবেই আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। আয়নার মধ্যে আমাকেও জয়ন্তীদির কোলে দেখে আনুমানু অবাক হয়ে গেল। ও কোনওদিনই জয়ন্তীদির কোলে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ায়নি। আনুমানু মিউ মিউ করে আমাকে বলল, 'কিরে মানুআনু তুইও দিদিমণির কোলে উঠেছিস?' আমি তো আলাদা কেউ নই, আনুমানুরই প্রতিবিম্ব, আমিও ওই এক কথা বললাম, 'কিরে মানুআনু, তুইও দিদিমণির কোলে উঠেছিস?'

আনুমানু রীতিমতো হকচকিয়ে গেল আমার ব্যাপারে, থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি মানুআনু না তুই মানুআনু?'

আমারও একই কথা, 'আমি মানুআনু না তুই মানুআনু?'

আয়নার মধ্যে ছায়া উলটিয়ে যায় আনুমানুর ডানদিক হল আমার বাঁদিক। কিন্তু কথা তো উলটোয় না। আনুমানু যা বলে, আমি মানুআনুও তাই বলি।

সেই যে আয়নায় আনুমানুর ছায়া মানুআনুর সঙ্গে, আনুমানুর নিজের কিন্তু গোলমাল বেধে গেল। তারপর থেকে আমার হয়েছে বিপদ। এ ওকে বলে, 'আমি মানুআনু না তুই মানুআনু? আয়নার মধ্যে বলে আমাকে দেখে আনুমানু যা যা বলতে লাগল আমিও সেই রকম বলে যেতে লাগলাম। আনুমানু তো আয়নার ব্যাপারটা মোটেই বোঝে না। রকম সকম দেখে সে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবাক হয়ে সে আমাকে দেখতে গেল।

জয়ন্তীদি কিন্তু এসব কিছু খেয়াল করলেন না। আজ অনেকদিন পরে তিনি আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভুরু কুঁচকিয়ে দেখলেন। মাথার সামনের লম্বা চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে নিচের দিকে সাদা হয়ে নরম কোঁকড়ানো চুলগুলি যত্ন করে অনেকদিন পরে লক্ষ করলেন। কপালে দু-একটা চিকন দাগ পড়েছে, চোখের নিচে একটু কালি জমেছে। সেগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আপন মনে একটু করুণ হেসে আনুমানুকে উঁচু করে মুখের কাছে তুলে ধরে বললেন, 'কিরে আনুমান আমি একদম বুড়ো হয়ে গেলাম।' আনুমানু এ কথার কোনও অর্থ বুঝল না, ও চিরদিনই সাদাসিধে

সরল প্রকৃতির বেড়াল, ও শুধু খুব খুশি হয়ে জয়ন্তীদির হাতের মধ্যে গরর গরর করতে করতে দুবার নরম করে বলল 'মি আও মি আও।'

ওই একই রকম অন্যমনস্কভাবে একটু পরে জয়ন্তীদি আনুমানুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে টেবিলের ড্রয়ারগুলো ঘাঁটতে লাগলেন। টেবিলের নিচের ড্রয়ার দুটো আজ বহু বছর খোলা হয়নি। এ ঘরে এতগুলো বেড়াল থাকে তাই ইঁদুর আরশোলার উৎপাত নেই, না হলে ওই বন্ধ দেরাজদুটো এতদিনে ইঁদুর আরশোলার রাজধানী হয়ে যেত।

জয়ন্তীদির ওই দেরাজদুটোয় ঠাসা পুরোনো চিঠি কাগজপত্র, কত ফটো, ছবি এমন কী ভাঙা খেলনা। অনেক পুরোনো দিনের জিনিস এসব। খোকার ফটো, খোকার বাবার ফটো, বন্ধুদের আত্মীয়দের কত মজার কত আনন্দের ছবি সব; জয়ন্তীদির অল্প বয়সের ফটো রয়েছে একটা। সেটার দিকে জয়ন্তীদি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। খোকার অন্নপ্রাশনের ছবি। তারপরে বড়ো বয়েসের খোকা। এ বাড়ির বাইরের দরজার চৌকাঠের উপরে দাঁড়িয়ে খোকার একটা ছবি তুলেছিল দামু বিদেশে যাওয়ার দু-একদিন আগে, সে ছবিটাও রয়েছে।

খোকার ছোটো বয়েসের দু-একটা বই, দু-একটা খেলনা, খোকার হাতে আঁকা দুই-একটা ছবি যেগুলো সে ইস্কুলের নিচু ক্লাসে রঙিন প্যাস্টেল দিয়ে এঁকেছিল তাও এখানে রয়েছে। এই তো একটা ছেঁড়া কালিমাখা সহজপাঠ। মলাটের পরের পাতায় ছোটোবেলার খোকার হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা।

শুভ্র রায়চৌধুরী
প্রথম শ্রেণী, ক শাখা
শিশুসদন।

বইটাকে হাতে নিয়ে বহুকাল ধরে জয়ন্তীদির খোকার সেই প্রথম ইস্কুল শিশুসদনের ছোটো একতলা বাড়িটার কথা মনে পড়ল, উঠোনওলা লাল বাড়িটা, সামনে কয়েকটা বুড়ো জবাফুলের গাছ, বাইরের ভাঙা দেওয়ালে শ্যাওলা। ইস্কুলটা কবে উঠে গেল, বাড়িটা ভাঙা হল, সেখানে একটা বিরাট বারো তলা বাড়ি উঠল একদিন। জয়ন্তীদি সেখান দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করেন, কোনওদিন শিশুসদনের কথা মনে পড়ে না। আজ সমস্ত মনে পড়ল। একবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শিশুসদনের বুড়ো জবাগাছটার নিচ দিয়ে সাত বছরের খোকা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ক্লাসে ঢুকে যাচ্ছে।

সহজপাঠের সঙ্গে আরও কয়েকটা বই খাতা। একপাশে একটা পা-ভাঙা কাঠের ঘোড়া, এই ঘোড়াটা নিয়ে আপনমনে খোকা দিনের পর দিন কত না খেলা খেলেছে। তখন সে বোধহয় আরেকটু ছোটো ছিল। ফটোর মধ্যে যে রকম দূরে

কাছের জিনিস সব এক সমতালে চলে এই দেরাজের জিনিসগুলো জয়ন্তীদির কাছে এক সমতলে। পুরোনো বহু চেনা। বহু গন্ধে ভরা, কিছু বহু গন্ধে ভরা, কিছু বহু দূরের, কিছু অল্প দূরের।

দেরাজের সব থেকে নিচুতে ছিল ছবিগুলো। খোকার হাতে আঁকা রেলগাড়ি, পাখি, বেলুনওলা। কুকুর খেলা করছে, ছাতা মাথায় লোকেরা বৃষ্টির মধ্যে যাচ্ছে, একটা ছোটো ফুলে বিরাট একটা লাল রঙের পাখি বসে আছে এই রকম সব ছবি।

এই সব ছবির মধ্যেই বেরোল আর একটা ছবি, একটা বড়োসড়ো লাল বেগুনি লেজফোলা নীল চোখ চমৎকার খোঁচা খোঁচা গোঁফওলা একটা বেড়াল। তার নিচে ছেলেমানুষি হরফে লেখা ঃ

I LOVE MY CAT

ছবিটা দেখে খুব খুশি হলেন জয়ন্তীদি। তার মুখ হাসিতে ছেয়ে গেল। এই ছবিটাই যেন এতক্ষণ খুঁজছিলেন তিনি।

৯

আমার নাম আনুমানু। আমার বন্ধু মানুআনু আমার বিষয় অনেক কথা বলেছে; এবার আবার আমার নিজের কথা আমি নিজেই বলছি।

আমাদের এই জয়ন্তীদির বাড়িতে যেখানে আমরা এতগুলো বেড়াল একসঙ্গে নিরিবিলিতে চুপচাপ বাস করি সেখানে আজ দুদিন হল খুব হই-চই, আনন্দ উত্তেজনা।

পরশু দিন রাতে জয়ন্তীদির ছেলে খোকা সাড়ে আট বছর পরে দেশে ফিরেছে। আমরা অবশ্য খোকাকে আগে দেখিনি। খোকা বিদেশে যাওয়ার পরে আমরা এ বাড়িতে এসেছি। কিন্তু খোকাকে আমরা মনে মনে চিনি। জয়ন্তীদি তার অনেক কথা আমাদের বলেছে।

জয়ন্তীদি, পাগলাদাদু, কল্যাণী, দামু আর নাণ্টু এই পাঁচজনে মিলে পরশুদিন বিকেলে দমদমে গিয়েছিল খোকাকে আনতে। ওদের ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা হয়ে গিয়েছিল।

অত রাতে হই-চই শুনে আমরা সব জেগে উঠে খোকাকে দেখলাম। খোকা যখন গিয়েছিল তখন সে নাকি খুব লিকলিকে ছিল। এখন তো সুন্দর গড়াপেটা শরীর হয়েছে তার, জয়ন্তীদি এয়ারপোর্টে তাকে দেখে প্রথম প্রায় চিনতেই পারেননি।

তবে বাড়ি ঢুকে প্রথমেই খোকা জয়ন্তীদির একটা সংশয় দূর করে দিয়েছিল। আমাদের দেখে খোকা খুব খুশি, টেবিলের উপরে ময়নামতী

বসেছিল, তাকে খপ করে তুলে কোলে নিয়ে খোকা বলল, 'মা চমৎকার তো বেড়ালগুলো। এগুলো কি সবই আমাদের।' জয়ন্তীদি যেন একটু লজ্জিতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ আমাদেরই। তুই চলে যাওয়ার পরে সব আস্তে আস্তে একে একে এসে জুটেছে।' একবার ও আমাদের সকলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে খোকা প্রশ্ন করল, 'তাহলে সবসুদ্ধ কটা বেড়াল হয়েছে আমি যাওয়ার পরে?' জয়ন্তীদি বললেন, 'এখন আছে ছটা।' খোকা একটু মুচকি হেসে বলল, 'আমি হলাম ছটা বেড়ালের সমান। এখন আমাকে নিয়ে তোমার এই বাড়িতে হল মোট বারোটা বেড়াল।'

রাত অনেক হয়েছে। পাগলাদাদু, কল্যাণী, দামু ওরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। নাণ্টু আর তারু এর মধ্যে দুটো ট্যাক্সি থেকে খোকার জিনিসপত্র নামানো শেষ করেছে। পাগলাদাদু হঠাৎ মাথার থেকে একটা অদৃশ্য টুপি উত্তোলনের ভঙ্গিতে বললেন, 'শুভ রাত্রি। মাতাপুত্রে বিশ্রম্ভালাপ চলুক। এবার আমরা যাই, কল্য প্রভাতে দেখা হইবে।'

সকলেই চলে গেলে জয়ন্তীদি আমাদের খেতে দিলেন। আজ অনিয়ম হয়েছিল, আমাদের সকলেরই খুব খিদে লেগেছিল। আমরা যে যার মতো খেতে লাগলাম, খোকা বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গেল।

তারপর মা আর ছেলে খেতে বসল। জয়ন্তীদি প্রায় কিছুই খেলেন না, শুধু একটু দুধ খই। খোকার জন্যে অনেক কিছু করেছিলেন জয়ন্তীদি, এঁচোড়ের ডালনা, ছোলার ডাল, খেজুরের চাটনি। খোকা প্রায় কিছুই খেল না, বলল 'প্লেনে প্রচণ্ড খেতে দিয়েছিল। এখনও পেট ভরে আছে।' জয়ন্তীদি বললেন, 'নিরামিষ বলে তোর অসুবিধে হচ্ছে না তো। কাল মাছ করব।' খোকা বলল, 'না কোনও অসুবিধেই নেই, বরং এসব খেতেই অনেক ভালো লাগছে।'

রাতে শুতে শুতে প্রায় তিনটে। অনেক কথা, অনেক প্রশ্ন। সবই ছাড়া-ছাড়া কিন্তু সাড়ে আট বছর পরে মা আর ছেলের কথার কোনও শেষ নেই। অনেক দ্বিধার পরে জয়ন্তীদি বলেন, 'খোকা তুই এতদিন পরে এসে মাত্র একমাস পরেই ফিরে যাবি। এখানে পাকাপাকি ভাবে চলে আয়।' খোকা বলল, 'না এবার ফিরতেই হবে। মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ছুটি পেয়েছি। এর পরের বার একেবারে গোছগাছ করে চিরকালের মতো ফিরে আসব।' তারপর একটু থেমে খোকা বলল, 'তবে এবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।' খোকার গলার স্বরে বেশ জোর। জয়ন্তীদি বুঝলেন খোকা তাঁকে চট করে ছাড়বে না। যাওয়ার জন্যে খুব জোর করবে। 'এই সব ফেলে আমি যাব কী করে' জয়ন্তীদি বললেন। 'এইসব মানে তো ইস্কুল আর কটা বেড়াল। ইস্কুলের কাজটা এবার ছেড়ে দাও আর বেড়ালগুলো

কারও কারও কাছে জমা দিয়ে যাও।' তবু জয়ন্তীদি বললেন, "ওই অত ঠাণ্ডার দেশ, অন্যরকম সব কিছু। এই বুড়ো বয়েসে আমার সইবে না।'

খোকা উঠে দাঁড়াল, 'এ বিষয়ে আমি কাল আবার আলোচনা করব। এখন তুমি শুয়ে পড়। আমিতো ওই পাশের ঘরেই শোব।' পরের দিন সকাল থেকে বাড়িতে রীতিমতো ভিড়, লোকজন, আত্মীয়স্বজন। খোকার বন্ধুবান্ধব কম নয়, তারাও খোকা ফিরেছে খবর পেয়ে দেখা করতে এল। অসুবিধে হল আমাদের বেড়ালদের, এত লোকের মধ্যে আমাদের থাকার একেবারে অভ্যেস নেই। ময়নামতী প্রথমেই গা ঢাকা দিল। পেস্তা গিয়ে বারান্দার ওপাশে রান্নাঘরে আশ্রয় নিল। বাকিদেরও এক অবস্থা আমি গুটিসুঁটি হয়ে খাটের একপ্রান্তে পড়ে রইলাম। শুধু এখনকার অসুবিধেই নয়, পরশু রাতে খোকা আর জয়ন্তীদির কথা শুনে আমার মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকেছে, জয়ন্তীদি যদি সত্যিই খোকার সঙ্গে চলে যায়, তবে আমরা যাব কোথায়, থাকব কার কাছে? ঘরে সব সময় এত লোক যে আমার এই দুশ্চিন্তার কথাটা ময়নামতী, অলক্ষ্মী কারও সঙ্গে এমনকি আয়নার মধ্যে মানুআনুর সঙ্গে পর্যন্ত আলোচনা করা হচ্ছে না। আমি একা একাই চিন্তা করে যাচ্ছি।

অবশ্য চিন্তার করার আর বিশেষ সুযোগ রইল না। আমরা সবাই দু-এক-দিনের মধ্যে টের পেয়ে গেলাম। এ বাসায় আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। একেবারে ঠিক হয়ে গেছে যে খোকার সঙ্গে জয়ন্তীদি কয়েক মাসের জন্যে যাচ্ছেন। ইস্কুল ছাড়ছেন না। তবে লম্বা ছুটি নিচ্ছেন। আমাদের জায়গা হচ্ছে কল্যাণীদের বাড়িতে। জয়ন্তীদি যাওয়ার দিন পাগলাদাদু আর কল্যাণী এসে আমাদের নিয়ে যাবেন।

কল্যাণীদের বাড়ি আমি জন্মেছিলাম। কল্যাণী বা পাগলাদাদুকেও আমার খারাপ লাগে না। জয়ন্তীদির জন্যে এ বাড়ির জন্যে আমার খুব মন খারাপ করবে, তবু রাস্তায় কী অচেনা বাড়িতে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো। দেখতে দেখতে একটা মাস হই হই করে কেটে গেল। এই জয়ন্তীদি খোকার সঙ্গে বেরুচ্ছেন পাসপোর্টের জন্যে ফটো তুলতে, তার পরের দিনই যাচ্ছেন পাসপোর্ট করাতে। ভিসা করে টিকিট কাটা। এই ট্যাক্সি নিয়ে খোকা বেরুচ্ছে। আবার কখনও খোকার বন্ধুরা এসে গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িতেও লোকজন ক্রমাগত আসছে। খোকা বাক্স ভর্তি করে কত রকম জিনিস এনেছে। ছোটোদের জন্যে মজার মজার খেলনা। সোনালি রাংতায় মোড়া চকোলেট, বড়োদের জন্য ঘড়ি, কলম, সিগারেট। সব জয়ন্তীদির হাতে খোকা

তুলে দিয়েছে। বাড়িতে যারাই খোকার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, জয়ন্তীদি যা পারছেন কিছু না কিছু দিচ্ছেন। ওপরতলায় দামুদিকে একটা রঙিন হাতঘড়ি দিয়েছেন, প্রত্যেক মুহূর্তে সেটা রঙ বদলায়। পাগল দাদুকে খোকা নিজের হাতে এক বাক্স চুরুট দিতে গিয়েছিল, পাগলাদাদু নিলেন না, বললেন, 'ধূমপান মহাপাপ। আমি পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়াছি।' তবে কল্যাণীর জন্যে একটা খুব সুন্দর কলম নিয়ে গেলেন। তারু নামে কাজের ছেলেটাকে খোকা একটা রুপোর মতো ঝকঝকে ছুরি দিয়েছে।

ছুরিটা পেয়ে তারু খুব খুশি। খোকা মাকে আমাদের কথা বলেছে, 'তুমি আমাকে তোমার বেড়ালদের কথা লেখনি কেন? আমি ওদের জন্যে চমৎকার টিনে ভর্তি ক্যাটফুড আনতে পারতাম। সাহেবদের ক্যাটফুড খেলে ওদের বেড়াল জন্ম ধন্য হয়ে যেত'।

দু একদিনের মধ্যেই আমরা বুঝে ফেলেছিলাম খোকাকে ভয়ের কিছু নেই। খোকা আমাদের কিছুই বলেনি, বরং দুচারবার যখন যাকে হাতের কাছে পেয়েছে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, লোমের মধ্যে আঙুল বিলি দিয়েছে। যাওয়ার দিন এসে গেল। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই সব গোছগাছ শুরু হল। গোছগাছের মধ্যে আবার আরেকটা দিক আছে। জয়ন্তীদি আমেরিকা গেলে সেখানে খোকার বিয়ে হবে তার পছন্দ করা মেমসাহেব বউয়ের সঙ্গে। সে মেম মেয়ে নাকি খুব ভালো। আর সেই বিয়ের জন্যেই খোকা মাকে নিতে এসেছে। বিয়ের ব্যাপারটা শুনে জয়ন্তীদি একটু দোনামনা হয়ে গিয়েছিলেন। খোকা যেদিন কথাটা বলে, জয়ন্তীদি কেমন চুপচাপ হয়ে যান। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে সামলে নেন। রাতে শোয়ার সময় আমাকে কোলে জড়িয়ে বললেন, 'যা হবার হবে, আমি কিছু বাধা দেব না। বুঝলিরে আনুমানু।'

সে মেম বউয়ের জন্যে জয়ন্তীদি, দামু আর কল্যাণীকে নিয়ে দোকানে ঘুরে ঘুরে শাড়ি কিনলেন, নিজের গলার পুরোনো হার ভেঙে বউয়ের মকরমুখ বালা গড়ালেন।

হইচই ব্যস্ততা লোকজন ইত্যাদির মধ্যে আমরা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম জয়ন্তীদি চলে যাচ্ছেন। ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদেরও এ বাড়িতে থাকা অন্তত এখনকার মতো শেষ।

জয়ন্তীদিদের যাওয়ার আগের দিন বিকেলে বেলা জয়ন্তীদি আমাদের সবাইকে পেট ভর্তি করে একেক বাটি দুধ খাওয়ালেন। তারপর সে এক দৃশ্য, জয়ন্তীদি পাগলদাদু, কল্যাণী, দামু, তারু আর খোকা এই ছয়জনের কোলে আমরা একেকজন

উঠে কল্যাণীদের বাড়িতে রওনা হলাম। আমাদের এই মিছিল রাস্তার লোকজন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, শুধু কল্যাণী বলল, 'আমার কেমন যেন লজ্জা করছে। লোকগুলো আমাকে চিনে হাসছে।' পাগলাদাদু ধমক দিয়ে বললেন, 'লজ্জা কেন? জানো এই লোকগুলি যাহা দেখিতেছে এরূপ জন্মে দেখে নাই। ইহারা ইহাদের পৌত্র-পৌত্রীদের নিকট এই মিছিলের গল্প করিবে।' এর মধ্যে এক কাণ্ড হল। দামুর কোলে ছিল কিসমিস, হঠাৎ মোড়ের মাথায় এসে দামুর হাতে আচমকা একটা আঁচড় দিয়ে এক লাফে নেমে কিসমিস দৌড়ে পালাল আমাদের পুরোনো বাড়ির দিকে। জয়ন্তীদির মন খারাপ করছিল, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আজ রাতে থাক। কাল খুব সকালে তারু গিয়ে দিয়ে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত আমরা পাঁচজন কল্যাণীদের বাড়িতে পৌঁছালাম। সেই বাইরের ঘর যেখানে আমি জন্মেছিলাম যেখানে, আমার চোখ ফুটেছিল। ছেঁড়া সোফা, বড় আলমারি, পর্দা ঢাকা বন্ধ জানলা, ঘরটা এখনও সেই রকমই আছে। আমি ভেবেছিলাম, আবার বুঝি আমার মার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তা হল না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে বারান্দায় একটা মাথামোটা হুলোকে দেখলাম আমাদের দিকে খুব ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তার গায়ের গন্ধটা কেমন চেনা-চেনা মনে হল, অনুমানে বুঝলাম ও আমারই কোনও ভাই হবে। একবার মিউ করে ডাকতেই ওর মুখটা একটু নরম হল, ও হয়তো আমাকে চিনতে পারল।

জয়ন্তীদিরা আমাদের রেখে আধঘণ্টা খানেক পরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাদের কত করে আদর করলেন, বুকে তুলে চুমু খেয়ে, তাঁর চোখে জল এসে গেল। আমরা তাঁর জীবনের অনেকখানি, তাঁর শূন্য দিনগুলির সঙ্গী। বারবার কল্যাণীকে আর পাগলদাদুকে বলতে লাগলেন আমাদের যেন কোনও কষ্ট না হয়। আর আমাদের বলতে লাগলেন, 'এই তো কটা দিন, ফিরে এসেই তোদের নিয়ে যাব। এখানে ভালোভাবে সাবধানে থাকবি। নতুন পাড়া, অচেনা রাস্তাঘাট, বাইরে যাবি না।' আমাকে আলাদা করে বললেন, 'আনুমানু এটা তো তোরই বাড়ি তোর অসুবিধে হবে না, তাই না।'

সেই রাতেই কিন্তু ময়নামতী আর পেস্তা পালাল। গদাই মানে কেষ্টা, বুড়ো আর অথর্ব হয়ে গেছে তার পালাবার উপায় নেই। আর অলক্ষ্মী জানে সে কালো বেড়াল, তাকে বাইরে রাস্তাঘাটে কেউ পছন্দ করে না, তাই সে চলে যাওয়ার সাহস পেল না। এই দুজন আর আমি রইলাম, তিনজন। এছাড়া আরেকটা কথা আমাদের সঙ্গে কিন্তু এ বাড়িতে মানুআনু আসেনি। পরের দিন সকালে তারুর কিসমিসকে নিয়ে আসার কথা ছিল। নিশ্চয় কিসমিসকে ধরা যায় নি। সে এ

বাড়িতে এল না। সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী আর পাগলাদাদু জয়ন্তীদিদের দমদমে বিদায় জানাতে গেল, কল্যাণীর মা বারবার মানা করে ছিলেন জয়ন্তীদিকে যেন না বলা হয় দুটো বেড়াল বেপাত্তা হয়ে গেছে এর মধ্যে, তাহলে শুধু শুধু দিদিমণি বিদেশে চিন্তা করবেন।

দু-একদিন পরে অবশ্য ময়নামতী কী বুঝে কল্যাণীদের বাড়িতে ফিরে এল। কিন্তু পেস্তা আর কিসমিস, এই দুই ভাইবোনকে আর দেখলাম না। এক সপ্তাহের মাথায় জয়ন্তীদির জন্যে শোকেই হোক অথবা বয়েসের জন্যেই হোক, কেষ্টা হঠাৎ একদিন রাতে চুপচাপ মরে গেল। রইলাম আমি, অলক্ষ্মী আর ময়নামতী। জয়ন্তীদি তিনমাসের জন্যে খোকার সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই তিনমাস কবে শেষ হয়ে গেল, তারও পরে কত দিন কত মাস চলে গেল। আমাদের সেই একতলার ঢাকা অন্ধকার ঘরে বসেও আমরা বুঝতে পারলাম শীত গ্রীষ্ম সময়ের বদল, কখনও বাইরে বৃষ্টির শব্দ, কখনও জানলার ওপাশে ধবধবে রোদ।

জয়ন্তীদির পৌঁছন সংবাদ এসেছিল কল্যাণীদের এই বাড়িতে। কল্যাণী চিঠিটা নিয়ে আমাদের ঘরে এসে পড়ে জানিয়ে গেল, বলল, 'তোদের সকলকে দিদিমণি লিখেছে, তোদের জন্যে খুব চিন্তা করছে। আমি লিখে দিচ্ছি তোরা সবাই ভালো আছিস। ঠিক তো?' এর মধ্যে একদিন পাগলাদাদু একটা কালো চোঙা মতন জিনিস নিয়ে এসে আমাদের বললেন, 'স্মাইল প্লিজ'—মার্জারিগণ হাস্য কর। তোমাদের ছবি তোলা হইবে। তোমাদের ছবি দিদিমণির নিকট মার্কিন দেশে যাইবে।'

আরও কিছুদিন পরে কী একটা জিনিস এল ডাকে পাগলাদাদুর নামে। সেটা জয়ন্তীদি আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন। শিকাগোয় কেনা টিনে ভর্তি বেড়ালের খাবার। জয়ন্তীদির বাড়িতে যেমন, এখানে এই পাগলাদাদুদের বাড়িতেও আমরা চিরকাল দুধ-ভাত-মাছ এই সব খেয়ে কাটিয়েছি। এই কৌটোয় ভরা খাবারের কিন্তু কোনও তুলনা নেই, কী চমৎকার স্বাদে কী সুন্দর গন্ধ! দুদিনেই কৌটোটা ফুরিয়ে গেল। পাগলাদাদু চারবার আমাদের ভাগ করে দিলেন, আমরা চারজনে চেটেপুটে খুব আনন্দ করে খেলাম। পাগলাদাদু বললেন, 'চমৎকার খাদ্য। গন্ধে-বর্ণে আমারই ভক্ষণ করিতে লোভ হইতেছে।'

এইভাবে আমাদের চারজনের দিন কাটতে লাগল। কল্যাণীদের বাড়িতে আমরা যে খারাপ আছি তা নয়, কিন্তু জয়ন্তীদি, জয়ন্তীদির বাড়ির কথা, সেই ঘর, বিছানা এসব মনে পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। কেমন যেন মনে হয় জয়ন্তীদির সঙ্গে আর দেখা হবে না, আর একথা ভাবলেই কেমন যেন কিছুই আর ভালো লাগে

না। ওই দূর-দেশে জয়ন্তীদি কী করছে, কী ভাবছে আমি মাঝে মাঝে তা নিয়েও চিন্তা করি।

সত্যিই একদিন দুঃসংবাদ এল। কল্যাণী এখন আর স্কুলে যায় না। সে পাস করে কলেজে পড়ছে। কিন্তু এই পাড়ারই জয়ন্তীদির স্কুলের একটি ছোটো মেয়ে একদিন বাসায় এসে খবর দিয়ে গেল, স্কুলে শুভ্র রায়চৌধুরীর টেলিগ্রাম এসেছে, মিসেস জয়ন্তী রায়চৌধুরী হঠাৎ মারা গেছেন। তাই স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। নতুন বড়োদিদিমণি কল্যাণীদের বাড়িতে এই খবরটা দিতে বলেছে, তাই সে এসে জানিয়ে গেল।

জয়ন্তীদির নিজের লোকজন কে কোথায় আছে, তারা খবর পেল কী না কে জানে? এ বাড়িতে কল্যাণীর বাবা একবার পাগলাদাদুকে জিজ্ঞাসা করল, 'জয়ন্তীদির বয়েস ঠিক কত হয়েছিল?' খবরটা আসার পর পাগলাদাদু কেমন গুম মেরে গিয়েছিলেন, ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে মনে মনে কী হিসেব কষে বললেন, 'পঞ্চান্ন'। কল্যাণীর মা বললেন, 'আহা! বয়েস তো কিছুই হয় নি।' কল্যাণী জয়ন্তীদিকে ভালোবাসত, সে দু-একবার চোখ মুছল, সেদিন আমাদের একটু বেশি করে আদর করল। জয়ন্তীদির মারা যাওয়ার খবরে আমার চারদিকটায় কেমন একটা বেড়া উঠে গেল। বুঝতে পারলাম, সেই বাড়িতে আর কখনও ফেরা হবে না। সেই পিছনের রাস্তা, রান্নাঘরের ছাদ, পাশের বাড়ির পাঁচিল, জয়ন্তীদির কোলের কাছে আমার শুয়ে থাকা, সেই দুধ খাওয়ার জামবাটি—সব মনের মধ্যে রয়েছে। জয়ন্তীদির হাতের স্পর্শ এখনও আমার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। এদিকে আবার শীত এসে গেছে। বাতাসে একটা হিম হিম ভাব। জয়ন্তীদির কথা ভেবেই হোক আর যে কোন কারণেই হোক আমি কেমন যেন বুঝতে পারছি আমারও আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।

আমার কোনও কষ্ট নেই, দুঃখও নেই। ছেঁড়া সোফাটার এক পাশে শোয়ার জায়গা করে নিয়েছি। সব সময় কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব। আজ কদিন হল খেতে একেবারে ইচ্ছে করছে না। কল্যাণী এসে জোর করে দু-একবার খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি খেতে পারিনি। জয়ন্তীদির মৃত্যুসংবাদ আসার পরে পাগলাদাদু আর আমাদের ঘরে আসেননি। কল্যাণীর কাছে আমি খাচ্ছি না শুনে এসে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন। কল্যাণীকে বললেন, 'আনুমানু দিদিমণির নিকট যাত্রা করিবার আয়োজন করিয়াছে। উহার মঙ্গল হউক।'

কল্যাণী মেয়েটা খুব ভালো। এই কথা শুনে তার মুখটা কালো হয়ে গেল।

আজ সকালে পর্দার ফাঁক দিয়ে একটু রোদ এসে আমাদের ঘরে ঢুকেছে। আমার কেন যেন অনেকদিন আগের বুলবুলের কথা মনে পড়ছে। আমি আজকে বুঝতে পারছি বুলবুল কেন হারিয়ে গিয়েছিল। বুলবুল হারায়নি, সে মৃত্যুর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নিজের বাড়িতে সে মরতে চায়নি। এ এক আশ্চর্য বোধ, আজ সকাল থেকে আমারও মনে হচ্ছে এ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

সত্যি সত্যি বেরিয়েও পড়লাম। পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, কোনও রকমে ঘর থেকে বেরোলাম। কোথায় যাব আগেই ঠিক করে রেখেছি। কোন রকমে বাড়ির মধ্যের দেয়ালটাও ঘেঁষে টলতে টলতে পেছনের দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, আর একটু এগিয়ে গেলেই দুটো বাড়ির মধ্যে একটা নরম ঠাণ্ডা নিরিবিলি জায়গা রয়েছে। এখানে নিশ্চিন্ত মনে এখন আমি চোখ বুঝে শুয়ে থাকতে পারি।

এ জায়গাটার আশেপাশের বাড়ির অনেক ছেঁড়া ভাঙা জিনিস পড়ে আছে। তারই একপাশে আমিও শুয়ে পড়লাম। শুতে গিয়ে দেখি পাশে একটা ভাঙা আয়না, আর কী আশ্চর্য আমার পুরোনো বন্ধু মানুআনুকে তার মধ্যে দেখলাম। এতদিন পরে তাকে এই সময়ে এত কাছে পেয়ে খুব ভালো লাগল। আমি তাকে বললাম, 'কী রে মানুআনু, তুই এতদিন পরে এখানে কি করে এলি?' মানুআনু সঙ্গে সঙ্গে বলল 'কি করে মানুআনু তুই এতদিন পরে এখানে কি করে এলি?' পুরনো খেলাটা আবার শুরু হল। আমি বললাম, 'তুই মানুআনু, না আমি মানুআনু?' সে বলল, 'তুই মানুআনু, না আমি মানুআনু—?'

মানুআনুকে মাথার নিচে রেখে আমি শুয়ে পড়লেম। দূরে কোথায় পাগলাদাদু আর কল্যাণীর গলার স্বর পাওয়া যাচ্ছে, 'আয় আনুমানু, 'আয় আনুমানু—।' কিন্তু আমি সাড়া দেব না, আমি আর উঠব না।

বড়গল্প

কুমুদিনী

(এক)
বড়োলোকের পাখি

শেষ রাতের দিকে নদীর উত্তরপ্রান্ত থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা বাতাস আসে। কার্তিকের শেষ থেকে শুরু হয় হাওয়াটা, আর কোনো কোনো বছর চৈত্র পর্যন্ত ভোরবেলার উদ্দাম হিমেল ভাবটা থেকে যায়।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ভয় করেন না নিবারণবাবু। শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, বৃষ্টি বাদল কুয়াশায় তিনি প্রতিদিন সূর্য ওঠার প্রায় এক প্রহর আগে ঘুম থেকে ওঠেন।

নিবারণবাবুর ঘুম থেকে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করে সামনের চরের শেয়ালেরা যখন কাঠের পাটাতনের উপরে নিবারণ মজুমদারের খড়মের খট খট শব্দ তারা পায়, কিছুক্ষণ থেকে তারপর বালির উপর দিয়ে গুটি গুটি একদম যমুনার জলের কাছে চলে আসে, সেখানে জলের ধারে চারজনের মধ্যে সারি দিয়ে বসে তারা তাদের মুখগুলো আকাশের দিকে করে নিবারণ মজুমদারের খড়মের আওয়াজের কর্কশ প্রতিবাদ জানায়।

নিবারণবাবু এসব তেয়াক্কা করেন না। কারণ তিনি জানেন রাত এভাবেই শেষ হয়। শেয়ালদের গোলমাল নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামান না।

এর পরেই ভোর হওয়ার ব্যাপারটা। ভোর হওয়া সোজা নয়, সেটা অনেক গোলমাল। নদীর ওপারে দহাতপুরের মোক্ষদাসুন্দরী ডিসপেনসারির সামনের বকুলগাছে অনেকগুলো ছোটো সাদা ফুলের মধ্যে একটা বিশাল লাল গনগনে আকাশকুসুম টকটক করে জ্বলে উঠবে, তারও আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পিছনে হাজী সাহেবের ধান-গোলার ওপাশ থেকে একপাল মুরগি রাত ফুরিয়ে যাওয়ার ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠবে।

এখনো দিনের ব্যস্ততা শুরু হতে বেশ কিছু সময় বাকি। ওপাশের হিন্দু হোটেলের কাজের ঝি গত রাতের অবশিষ্ট এঁটো বাসনগুলো নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে গেল। উনুনেও আগুন দেওয়া হয়েছে। কাঁচা আমকাঠের জ্বালানি, ধরতে সময় নিচ্ছে। এখনই হিন্দু হোটেলের মালিক তেওয়ারি ঠাকুর ঘুম ভেঙে উঠে হইচই হাঁকডাক শুরু করে দেবে।

প্রথম স্টিমার আসবে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে বিরাজগঞ্জ থেকে। সাড়ে ছয়টা কিংবা তারো আগে থেকে পায়ে হেঁটে, টমটম গাড়িতে, সাইকেলে যাত্রীরা আসতে শুরু করবে, স্টিমার ছাড়ার মিনিট পনেরো আগে টাউন সার্ভিস ঝরঝরে বাসটাও এসে যাবে আষ্টেপৃষ্ঠে যাত্রী নিয়ে।

জায়গাটার নাম বেড়াবাড়ি। নদীর জল বছরের একেক সময়ে একেক রকমভাবে নামাওঠা করে। বেড়াবাড়িও জলের ওঠানামার সঙ্গে এগিয়ে পিছিয়ে যায়।

বেড়াবাড়ি ঘাটে দিনে রাতে তিনটা স্টিমার যায় আসে। যখন স্টিমার ঘাটে এসে দাঁড়ায় তখন রীতিমতো জমজমাটি ব্যাপার। লোকেরা নামে, ওঠে। দূর বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরে, বাড়ি থেকে বিদেশ যায়। কাছাকাছি যাতায়াতও আছে। দু চারজন ইস্কুল মাস্টার, অফিস আদালতের বাবু দৈনিক যাত্রীও আছে।

নিবারণবাবু স্টিমার কোম্পানির বুকিং ক্লার্ক। সকালের দিকটায় একটু বেশি চাপ পড়ে। দু'দিক থেকে দুখানা জাহাজ এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ে।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে, নৈমিত্তিক কাজকর্ম সেরে সাড়ে ছটার মধ্যে বুকিং কাউন্টারে গিয়ে বসতে হয়।

অবশ্য বুকিং কাউন্টারের ছোটো ঘরটা সাড়ে ছটার অনেক আগেই নিবারণবাবু ঘুম থেকে ওঠার একটু পরে আকাশ যখন অল্প-ফাটা হয়ে এসেছে, সেই সময় সনাতন এসে খুলে দেয়। কুমুদ কোনো কোনো রাতে ওই ঘরটায় থাকে। খুলে দেওয়ার পর সে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে যায়।

সামনের গ্রাম থেকে সনাতন মাঝি আসে। সে এসে ওই বুকিং ঘরটা পরিষ্কার করে, তারপর নিবারণবাবুর ঘর, সামনের পাটাতন, নদীর ঘাট থেকে এই জাহাজ ঘর পর্যন্ত পায়ে চলার রাস্তাটা শক্ত বাঁশের ঝাঁটা দিয়ে ঝকঝকে করে পরিচ্ছন্ন করে সনাতন।

কত রকমের লোক যায় আসে জাহাজঘাটায়। বিড়ির টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, পানের পিক, কী ভীষণ নোংরা হয়ে থাকে ঘাটটা। সকাল-বিকেল দুবেলা সনাতন যত্ন করে নিকোয়।

সনাতন এলে বুকিং ঘরের বন্দীদশা থেকে ছাড়া পাবে, এটা কুমুদ জানে। সনাতনের গলার শব্দ, এমনকি পায়ের শব্দ পর্যন্ত সে জানে। নদীর ঘাটের ওপর বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে পানের দোকানটা, সেখানে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা প্রথম গ্রাহক সনাতন, এক পয়সার বিড়ি কেনে। পানবিড়িওলার সঙ্গে সনাতনের দুএকটা ছোটোখাটো কথা হয়।

প্রায় দুশো হাত দূরে তার বন্ধ ঘর থেকে কুমুদ তা শুনতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে কঁক কঁক করে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে সে ঘরের মধ্যে থেকে ডেকে ওঠে।

কুমুদের চেঁচানি শুনে নিবারণবাবুও বুঝতে পারেন সনাতন আসছে। তিনিও গলা মেলান, রাস্তার দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে ডাকেন, 'এই সনাতন, আর দেরি করিস না রে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।'

সনাতন এসে দরজা খুলে দেবার পর সামনের কাঠের পাটাতনটার উপরে ওঠে একবার চারদিক পর্যবেক্ষণ করে নেয় কুমুদ। কাঠের পাটাতনটার উপর সারারাত রাশু আর দাশু—দুটো কুকুর ঘুমায়।

কুমুদ ঘরের ভিতর থেকে পাটাতনের উপরে চলে আসা মাত্র বিশু অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে কুমুদকে জায়গা ছেড়ে দেয়। তারা নিচে নেমে গিয়ে হিন্দু হোটেলের পিছনের আঁস্তাকুড়ে কিছু খাবার মেলে কি না তার চেষ্টা করে।

রাশু-দাশু যে কুমুদকে খাতির করে সেটা অকারণে নয়। রাশু নিজে চিরকালই শান্ত প্রকৃতির। সে খুব একটা মারামারি, কাটাকাটি পছন্দ করে না, কাউকে সে ঘাঁটায়ও না। চুরি-চামারি করে, লেজ নেড়ে সামান্য খাবার জোগাড় করতে পারলেই তার হয়ে গেল। বাকি সময় সে নির্বিকার ভাবে শুয়ে বা বসে থাকে, কিংবা ঘুমোয়। বড়োজোর কখনো সখনো দাশু খুব ঘেউ ঘেউ করলে কোনো কিছুর উদ্দেশে তাহলে সে তার দোহার কি করে।

দাশু একটু খেঁকি স্বভাবের। কিন্তু কুমুদ যেদিন এখানে প্রথম আসে সেদিনই শিক্ষা হয়েছিল। সে ঠিক কুমুদকে আক্রমণ করতে যায়নি, অল্প গর্জন করতে করতে সে কৌতূহলী হয়ে নাকটা উঁচু করে কুমুদকে শুঁকতে গিয়েছিল।

দাশুর খুব দোষ দেওয়া যায় না। সে দুচারটে পায়রা, শালিক, কাক-টাক দেখেছে। নদীর ওদিকের ঘাটে তাছাড়া বাস-স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে গৃহস্থপাড়ার দিকেও মাঝেমধ্যে সময় করে বেড়াতে যায় সেখানে সে পাতিহাঁস দেখেছে। কিন্তু এত বড়ো একটা সাদা ধবধবে পাখি, বিশাল রাশভারি চেহারা, জীবনে প্রথম রাজহাঁস দেখে স্টিমারঘাটের সামান্য দাশু কুকুরের কৌতূহল হওয়া দোষের নয়।

দুঃখের বিষয়, দাশুর সেই অনুসন্ধিৎসা ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। সে নাক বাড়িয়ে কুমুদের কাছে এগিয়ে যাওয়ার আগেই হঠাৎ প্রায় আড়াই ফুট গলা উঁচু করে পায়ের পাতার উপরে সটান দাঁড়িয়ে হলুদ শক্ত ঠোঁট দিয়ে কুমুদ দাশুর শরীরের সব চেয়ে নরম জায়গাটায় ঠিক নাকের ডগায় কালো ঠাণ্ডা অংশটার উপরে তীব্রভাবে আঘাত করল।

মুহূর্তের মধ্যে দাশুর ভয়ার্ত চিৎকারে জাহাজঘাটের নিস্তব্ধ পরিবেশ চমকিয়ে উঠল।

সেটাও ছিল এই এক রকম সকাল। তখনো স্টিমার আসতে দেরি আছে। ঘাটে লোকজন বিশেষ কেউ আসেনি।

রাশু দাশু দুজনেরই হিন্দু হোটেলে কাজের লোক জ্ঞানদাদির দুচোখের মণি। তাদের ছোটোবেলা থেকে জ্ঞানদাদি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। চোখ ফোটার অল্প পরেই এদের দুজনকে জাহাজঘাটায় খেতে টেতে পাবে বলে জ্ঞানদাদি ভেতর থেকে নিয়ে এসে পুষেছে।

রাশু-দাশু সারাদিন হোটেলের সামনের উঠোনে থাকে, রাত দশটা পর্যন্ত জ্ঞানদাদি খেয়ে উঠে হোটেলের রান্নার জায়গায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত। ছোটোবেলার বহুদিন পর্যন্ত তারা জ্ঞানদাদির কাছেই শুতো, কিন্তু এসে তারা বড়ো হয়ে গেছে, তার উপরে হোটেলের মালিকের রান্নাঘরে কুকুরকে শুতে দিতে আপত্তি, এখন অনেকদিন হল তারা দুজনে ঘরের সামনের কাঠের পাটাতনের উপরে থাকে।

দাশুর করুণ চিৎকার শুনে জ্ঞানদাদি ছুটে এল। নদীর ঘাটে বাসন মাজছিল সে। সেগুলোকে সেখানে সেভাবে রেখেই জ্ঞানদাদি ছুটে এল।

নিবারণবাবু বালির চড়ায় পায়চারি করতে করতে দাঁতন করছিলেন, তিনিও এলেন। এত সকালবেলায় হঠাৎ কুকুরটা এরকম আর্তনাদ করে উঠল।

দাশুর তখন নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সে আর রামু দুজনেই পাটাতন থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসেছে। তাদের লেজ গোটানো, চেহারায় ভীত সন্ত্রস্ত ভাব।

সামনের পাটাতনের উপরে অত্যন্ত ভারিক্কি ভঙ্গিতে পুরো দৃশ্যটা লক্ষ করছে একটা বিরাট রাজহাঁস।

নিবারণবাবু আর জ্ঞানদাদি দুজনেই তাকে দেখলেন। জ্ঞানদাদি বললেন, 'এটাকে তো আগে দেখিনি। এ জানোয়ারটা আবার এখানে কোথা থেকে এল?'

নিবারণবাবু বললেন, 'বোধহয় সামনের গ্রাম থেকে এসেছে।'

ততক্ষণে সনাতন কাজে এসে গেছে। সেও এসে রাজহাঁসটাকে দেখল। সনাতন বলল, 'সামনের গ্রাম থেকে কী করে আসবে? তার পাশেতো সব গরিবের গ্রাম, এসব গ্রামে এরকম হাঁস কারো নেই। এত বড়লোকের পাখি।'

(দুই)
স্বপ্নের কুমুদ

সেই থেকে রাজহাঁসটা এই জাহাজ ঘাটায়।

আর. এস. এন. কোম্পানির বেড়াবাড়ি স্টিমার স্টেশনের বুকিং বা নিবারণবাবুই স্টেশনের অভিভাবক। তাঁকে লোকে আজকাল মাস্টারবাবু বলে। নিবারণবাবু শুধু বুকিং বাবু নন। তিনি একধারে টিকিট বেচেন, যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করেন, স্টেশন মাস্টারের যা কাজ প্রায় সবই তাঁকে করতে হয়। তাঁকে সাহায্য করার লোক বলতে ওই যা সনাতন।

আগের যিনি স্টেশন মাস্টার ছিলেন তিনি তিন মাস আগে বিয়ে করতে দেশে গিয়েছিলেন, তারপর আর ফেরেননি। লোকে বলে মাস্টারবাবু ঘরজামাই হয়েছেন, আর এই চাকরিতে আসবেন না।

সে যা হোক, নিবারণবাবু যথাসাধ্য স্টেশন মাস্টারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর. এস. এন. কোম্পানির ব্রাঞ্চ অফিস কাছেই। এখান থেকে স্টিমারে মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। তেমন কিছু অসুবিধে হলে সেখান থেকে লোক আসে সাহায্য করতে। তাছাড়া প্রত্যেক স্টিমারের সঙ্গেই ক্যাশিয়ারবাবু একজন আসেন, তিনি তখনকার টিকিট বিক্রির হিসেব দেখে, নগদ টাকা পয়সা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যান। সে ব্যাপারে কোনো ঝুট-ঝামেলা নেই। মাসের প্রথমে নিবারণবাবু আর সনাতনের মাইনের টাকাও ক্যাশিয়ারবাবুই দিয়ে যান।

প্রত্যেক স্টিমারের সঙ্গে খালাসিরা থাকে। তারাই মালপত্র লোকজন ওঠানো, নামানো, স্টিমার ঘাটে লাগলে সিঁড়ি লাগানো, তারপরে ছাড়ার সময় সারেং-সাহেব শেষ সিটি বাজানোর পর জলের ওপর থেকে সিঁড়ি গুটিয়ে নেওয়া এইসব করে।

নিবারণবাবুর রাজহাঁসকে কয়েকদিনের মধ্যে সবাই চিনে ফেলল।

মানদায়িনী হাই ইংলিশ স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়, জয়গোপাল কাব্যতীর্থ, তিনি থাকেন নদীর ওপারের একটা গ্রামে। এখান থেকে কিছু দূরে যে ছোটো শহর, সেখানে মানদায়িনী স্কুল। প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার দিন বিকেলের স্টিমারে বাড়ি যান জয়গোপালবাবু আর সোমবার সকালের স্টিমারে ফিরে আসেন। সারা সপ্তাহটা স্কুল বোর্ডিং-এ কাটে।

জয়গোপালবাবু শুধু কাব্যতীর্থ নন। তিনি কাব্যরসিক মানুষ। বৎসরান্তে স্কুলের সরস্বতী পুজোর নেমন্তন্নপত্রে একটা করে নতুন সংস্কৃত পদ্য তিনি নিজেই রচনা করে দেন।

রাজহাঁসটা জাহাজঘাটায় প্রথম যেদিন আসে সেটা ছিল সরস্বতী পুজোর দিন কয়েক আগের এক বুধবার। সেই শনিবার দিন সরস্বতী পুজো ছিল বলে জয়গোপালবাবু বাড়ি যেতে পারেননি। কিন্তু জাহাজঘাটায় বিকেলের দিকে এসেছিলেন বাড়ির গ্রামের বা আশেপাশের কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে দেবেন বাড়িতে জানিয়ে দিতে যে ফিরতে পারছেন না, একেবারে পরের শনিবার ফিরবেন।

নিবারণবাবুর টিকিট ঘরে একটা কাঠের বড়ো তক্তা বেঞ্চির মতো করে দুটো মোটা বাঁশের সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বেঞ্চির উপরে কাব্যতীর্থমশায় বসেছিলেন।

এমন সময় রাজহাঁসটা পুরো জাহাজঘাটটা একবার পাক মেরে সব কিছু দেখেশুনে তারপর বুকিং ঘরে ঢুকল। এ কদিন ধরে নিবারণবাবু হাঁসটার এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর একবার বুকিং ঘরে এসে বিশ্রাম করে যায়।

রাজহাঁসটা ঘরে ঢুকে নির্বিকারভাবে একটা লাফ দিয়ে যেখানে পণ্ডিতমশায় বসেছেন তার পাশে গিয়ে বসল।

এত বড়ো একটা অতিকায় পাখি কিন্তু চেহারার মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব। একটা সৌম্য ব্যক্তিত্ব রয়েছে চালচলনে, চলাফেরায়, চোখের দৃষ্টিতে।

পণ্ডিতমশায় এবার সরস্বতী পুজোয় যে পদ্যটা লিখেছেন, তাতে এক শ্বেতশুভ্র স্বর্গীয় মরালের কথা আছে, যে পারিজাত কাননের কাকচক্ষুজল দীর্ঘকায় কুমুদ কহ্লারের সঙ্গে বাণীদেবীর চরণতলে খেলা করছে।

রাজহাঁসটাকে একটু দেখে ভয় ভয় করছিল পণ্ডিতমশায়ের আবার সেই সঙ্গে নিজের কবিতাটার কথাও মনে পড়ল।

রাজহাঁসটা আলতোভাবে তাঁর পাশে গিয়ে বসতে তিনি একটু সংকুচিত হয়ে সরে গিয়ে নিবারণবাবুকে বললেন, 'ও নিবারণ, চমৎকার হাঁসতো। কিনলে নাকি, পুষবে?'

নিবারণবাবু কাউণ্টারের ভিতরে দিয়ে এক যাত্রীর কাছ থেকে টিকিটের দাম নিচ্ছিলেন, একটা ঘষা দোয়ানি দিয়েছিলেন খুচরো ফেরতের সঙ্গে। সে লোকটা নেবে না। নিবারণবাবু দাঁত খিঁচোচ্ছিলেন 'নেবে না মানে। সরকারি পয়সা। আর একি আমি বানিয়েছি নাকি, এ তো তোমরাই কেউ দিয়েছ?'

লোকটা আমতা আমতা করে দোয়ানিটা নিয়ে চলে গেল। লোকটা আনাজের ব্যাপারি, ওপারের হাট থেকে সপ্তাহে দুদিন তরিতরকারি নিয়ে টাউনে আসে। সব সময়েই তার কাছে নিয়মের বেশি মাল থাকে। নিবারণবাবুকে চটিয়ে তার সুবিধে

হবে না, দোয়ানিটা বাজারে কেনাবেচার সময় কোনো খদ্দেরকে গছিয়ে দেওয়া যাবে। সে কেটে পড়ল।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়ের প্রশ্নের খেই ধরলেন এবার, 'না না। কিনব কোথা থেকে? কোন্ জায়গা থেকে যেন একা একাই চলে এসেছে। ভারি ভালো হাঁস, মাথায় হাত দিন। কিছু বলবে না।'

পণ্ডিতমশায় ভয়ে ভয়ে পাখিটার মাথায় হাত দিলেন, সে মাথাটা নিচু করে গলাটা দিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কনুইতে ঘষতে লাগল, আর আরামে চোখ বুজে রইল।

সেদিন পণ্ডিতমশায় যতক্ষণ রইলেন, হাঁসটা তার কোল ঘেঁষে বসে রইল, তারপর তিনি যখন ফিরে গেলেন সন্ধ্যার একটু আগে, সন্ধ্যায় আবার সরস্বতীর আরতি আছে, হাঁসটা পিছু পিছু বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

তারপর অনেক রাত্রে সরস্বতী পুজোর খাটাখাটুনির গোলমালের পর যখন ক্লান্ত জয়গোপাল কাব্যতীর্থ ঘুমোলেন তিনি সাদা রাজ-হাঁসটাকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বর্গের গঙ্গা মন্দাকিনীর নদীর নীলজলে বিরাট সাদা রাজহাঁস জল ছিটিয়ে দুষ্টুমি করে খেলা করছে, আর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মা সরস্বতী তাকে ডাকছেন, 'কুমুদ, কুমুদ। আর জলে থেকো না। কুমুদ, ভালো হবে না বলছি, তাড়াতাড়ি উঠে এস।'

শেষ রাতে স্বপ্নে, শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের আর নীল কুয়াশার আবেশ-জড়ানো হিমেল তন্দ্রা। জয়গোপাল কাব্যতীর্থ তন্দ্রা থেকে উঠে, বোর্ডিংয়ের মাঠের মণ্ডপে সরস্বতী ঠাকুরকে একটা প্রণাম করে চোখ বুজে স্বপ্নটা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি স্বপ্নে যে সরস্বতীকে দেখেছেন এই মূর্তি সরস্বতীর থেকে অনেক বেশি সুন্দরী, তার শরীরের ত্বকে কেমন একটা গোলাপী আভা, চোখের মণি অতসী ফুলের মত নীল।

প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় জয়গোপালবাবুর কেমন ঘোর এসে গিয়েছিল। একটু পরে সম্বিত ফিরে আসতে মোটা তুষের আলোয়ানটা দিয়ে কানমাথা ভালো করে ঢেকে, শরীরটা ভালোভাবে জড়িয়ে স্টিমার ঘাটের দিকে রওনা হলেন।

পণ্ডিতমশায় যখন পৌঁছলেন, তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি। সবে সনাতন এসে ঘরটর ঝাঁট দিচ্ছে। বুকিং ঘর খুলে দিয়েছে হাঁসটা ধীরেসুস্থে চারপাশে পায়চারি করছে দুলে দুলে। পণ্ডিতমশায়কে বাস স্ট্যাণ্ডের মুখে দেখতে পেয়েই সে দ্রুত পায়ে কঁক কঁক করে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

পণ্ডিতমশায়ের কাছে গিয়ে সে একবার ডানা ঝেড়ে ফুর্তিতে তীব্র একটা চিৎকার দিল। রাজহাঁসটাকে আজ খুব যত্ন করে পণ্ডিতমশায় দেখলেন, না, কোনো সন্দেহ নেই, এই হাঁসটাকেই কাল রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন।

এত সাত সকালে পণ্ডিতমশায়কে দেখে নিবারণবাবু অবশ্যই একটু অবাক হলেন। তখন তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হয়েছে। বুকিং ঘরের পাশের একটা কাঠের কামরাতে তাঁর বাস। সেখানে একটা কৌটোর মধ্যে কিছু মুড়ি, বাতাসা তাঁর রাখা থাকে। সেটাই তাঁর দুবেলার জলখাবার। কখনো খেতে ইচ্ছে হলে হিন্দু হোটেলের ওপাশের চমচম রসগোল্লার কোনো দোকান থেকে একটা দুটো মিষ্টি কিনেও খান।

পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, নিবারণবাবু ওই মুড়ি-বাতাসা খাচ্ছিলেন। আজ কয়েকদিন হল রাজহাঁসটা তাঁর মুড়ির ভাগীদার হয়েছে। তিনি দিয়ে দেখেছেন, বাতাসা খায় না কিন্তু মুড়ির খুব ভক্ত।

আগে কুকুর দুটো রাশু-দাশু মুড়ি খাওয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসত, আজকাল আর আসে না। হাঁসটা নিবারণবাবুর কাছে এল। নিবারণবাবু কয়েকটা মুড়ি পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিলেন, সে যত্ন করে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগল।

এতটা পথ হেঁটে এসে এই শীতকালেই পণ্ডিতমশায় রীতিমতো ঘেমে গেছেন। শহরের মধ্যে তাঁর স্কুল বোর্ডিং থেকে এই নদীর ঘাট প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল রাস্তা।

পণ্ডিতমশায় বুকিং ঘরের মধ্যে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলেন। কালকের মতোই হাঁসটা উঠে তাঁর পাশে বসে মাথা ঘষতে লাগল।

মুড়ি-বাতাসা খাওয়া শেষ করে এক গেলাস জল খেয়ে নিবারণবাবু এলেন। পণ্ডিতমশায় সবিস্তারে তাঁর স্বপ্নের গল্পটা নিবারণবাবুকে বললেন।

নিবারণবাবু সাদাসিধে মানুষ। হঠাৎ একটা রাজহাঁস এসে গেছে, এটাই তাঁর কাছে একটা অলৌকিক ব্যাপার। তার উপরে শ্রদ্ধেয় জয়গোপাল কাব্যতীর্থের এই স্বর্গীয় স্বপ্ন, তিনি কেমন অভিভূত হয়ে বারবার সাদা রাজহাঁসটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

বোধহয় কোনো শাপগ্রস্ত কিন্নর বা দেবতা, কিংবা স্বয়ং মা সরস্বতীরই বাহন। দেখেছ ঠিক সরস্বতী পুজোর সময় চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে এই জাহাজঘাটায় কেন? এখানে বিদ্যা বা সঙ্গীতচর্চা নেই, কোনো সাধক নেই এসবের। তিনি ম্যাট্রিক ফেল, জাহাজ কোম্পানির সাড়ে সতেরো টাকা মাইনের তুচ্ছ বুকিং ক্লার্ক, তাঁকে মা সরস্বতীর এই দয়া কেন?

পণ্ডিতমশায়ের স্বপ্ন বর্ণনা তখন শেষ হয়েছে। মন্দাকিনী নদীর জল এই দিশি

যমুনার মতো ঘোলা নয়। ঝকঝকে নীল। সেখানে এই হাঁস খেলা করে, মা সরস্বতী তাঁকে কুমুদ বলে ডাকেন।

কথা বলা শেষ করে পণ্ডিতমশায় একবার হাঁসের মাথায় হাত রেখে, 'কুমুদ' বলে ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে ডানা ঝাপটিয়ে, গলা উঁচু করে কঁক কঁক করে ডেকে উঠল।

পণ্ডিতমশায় অভিভূতের মতো বললেন, 'দেখলে তো নিবারণ, ওই হল কুমুদ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

এই সময় কুমুদ আরেকবার ডানা ঝেড়ে ডেকে উঠল।

(তিন)
ঘাটের কুমুদ

এরপর থেকে কুমুদ নামটা পাকাপাকিভাবে বহাল হয়ে গেল।

সাধারণ যাত্রীরা স্টিমারের খালাসিরা, এমনকি বাস স্ট্যাণ্ডের লোকজন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যারা যায় সবাই কুমুদকে চিনে ফেলল।

এসব অঞ্চলে রাজহাঁস দেখা যায় না। এমন কী দূরপাল্লার যে সব নৌকো নদী দিয়ে যায়, তারা পর্যন্ত জাহাজঘাটে কুমুদকে বিস্মিত হয়ে দেখত।

প্রথম প্রথম কুমুদ সন্ধ্যা হওয়ামাত্র জাহাজঘাট ছেড়ে জলে নেমে যেত। পাড়ের থেকে অনেক দূরে পঁচিশ, পঞ্চাশ হাত নদীর মধ্যে গিয়ে নিজের কাঁধে ঠোঁট গুঁজে রাত কাটাত।

প্রথমদিনে সন্ধ্যাবেলা যখন রাজহাঁসটা, তখনো তার কুমুদ নাম হয়নি, নদীর জলে নেমে গেল, সনাতন নিবারণবাবুকে ডেকে বলল 'কর্তা, হাঁসটা নদীর জলে নেমে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।'

শুনে নিবারণবাবু স্বস্তি পেয়েছিলেন, একটা উটকো ঝামেলা এসে জুটেছিল, একা একাই বিদায় নিয়েছে।

জ্ঞানদাদিও খুশি হয়েছিল, যা মারকুটে জানোয়ার, তার আদরের কুকুরের নাকটা একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে।

রাত আটটার ফিরতি স্টিমারে অনেক লোক নামে। তারা অনেকে রাতের খাওয়া-দাওয়া তেওয়ারির হোটেলে সেরে নিয়ে তারপর টাউনে যায়। কেউ কেউ তেওয়ারির কাছ থেকে চাটাই চেয়ে নিয়ে রাত্রিবাসও করে বুকিং ঘরের পাটাতনে অথবা হোটেলের খাওয়ার মেঝেতে। গরমের দিনে অনেকে চরের উপর শুয়ে থাকে। সুন্দর শিরশিরে বাতাসে চমৎকার ঘুম আসে।

সকলেরই কাজ পরের দিন সকালে টাউনে। ভোরবেলা উঠে যে যার মতো চলে যায়।

যেদিন কুমুদ এসেছিল সেটা শীতের শেষ হলেও তখনো কড়া ঠাণ্ডা রয়েছে এই অঞ্চলে । নদীর চরে কলাই আর সরষের রবিশস্যের মাঠে হিমজলে দানা বাঁধছে ফসল। দুধের বিন্দু জমেছে ধানের ছড়ায়।

একদিক থেকে চমৎকার প্রকৃতি কিন্তু নদীর তীরে বাইরে খোলা চালে ধূ-ধূ হাওয়ার মধ্যে শুলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হবে, সবাই গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকে বুকিং ঘরের পাটাতনে আর হিন্দু হোটেলের মেঝেতে অথবা সম্ভব হলে টাউনে চলে যায়, যদি তখন লাস্ট বাসটা থাকে। এত রাত্রে ঠাণ্ডায় কেউ হেঁটে যেতে চায় না।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় রাজহাঁস সেই যে নদীর জলের মধ্যে নেমে গেল, তারপর শেষরাতে যখন নিবারণবাবু খড়ম পায়ে পাটাতনের উপর ঘুমন্ত মানুষগুলোকে পাশ কাটিয়ে খটাং খটাং শব্দ করে, বালির চড়ায় নেমে এসেছেন, হঠাৎ দেখলেন নদীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে যেন জলের মধ্যে উড়ছে, গত কালকের রাজহাঁসটা তরতর করে নদী বেয়ে ঘাটের দিকে আসছে।

সোজা উঠে এল সে, বালির উপর দিয়ে ঝলমল করে চলে এসে নিবারণ-বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে দুবার পাখা ঝাড়ল, কিছুটা জল ছিটকালো, কিছুটা বালি উড়ল।

পিছনে পিছনে জ্ঞানদাদি এল, তার বুদ্ধি খুব প্রখর। সে বলল, 'হাঁসটা কাল রাত্তিরে কোথাও যায়নি। আমি বাসন মাজতে গিয়ে দেখলাম জলের মধ্যে রয়েছে। সকাল হতে উঠে এল।'

নিবারণবাবু একটু ভুরু কুঁচকোলেন। কিন্তু সনাতন ব্যাপারটার সমাধান করে দিল। সে বলল, 'এই পাখিগুলো খুব সেয়ানা। রাতের বেলা শেয়াল আর বনবেড়ালের ভয়ে জলের মধ্যে গিয়ে থাকে।'

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কয়েকদিনের মধ্যে কুমুদ জাহাজঘাটকে ভালোবেসে ফেলল, সন্ধ্যাবেলাতেও লোকজন মিষ্টির দোকান এ সবের মধ্যে ঘোরায় তার পরম উৎসাহ। এদিকে যায়, ওদিকে দেখে, হই-চই-এর মধ্যে সন্ধ্যা কাটায়, তারপর সন্ধ্যার শেষে স্টিমার ছেড়ে গেলে সে নিবারণবাবুর পিছে পিছে হেলতে দুলতে চলে আসে।

নিবারণবাবু ভয় পান, এখানে শেয়ালের বড়ো উৎপাত, কোথায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থেকে হঠাৎ হাঁসটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সাবধান হওয়ার জন্যে

তিনি সনাতনকে বলে দিলেন, 'এই হাঁসটাকে প্রত্যেকদিন রাতে বুকিং ঘরে আটকিয়ে তারপর বাড়ি যাবে।'

কুমুদের কিছুতেই আপত্তি নেই। এমন কী কয়েকদিন পরে তার নাম যে কুমুদ দেওয়া হল তাতেও নয়।

কুমুদ নামটা এখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। নিবারণবাবু অবশ্য কুমুদ নামকরণের রহস্যটা কারো কাছে ব্যক্ত করেন নি, কেউ বিশ্বাস করবে না, বলে লাভ কী।

সবাই কুমুদকে চিনে গেছে। স্টিমারের খালাসিরা ঘাটে জাহাজ ভিড়তেই, আয়, চই, চই করে তাকে ডাকে, অনেকে কুমুদ-কুমুদ বলেও ডাকে।

প্রথম দিকে স্টিমার বিষয়ে একটা আশঙ্কা ছিল কুমুদের মনে। ঘাটে এসে স্টিমার যেই ভিড়ত, জাহাজের তীব্র সিটি আর পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে বড় ঢেউয়ের দোলা, কুমুদ ঘাটের কাছ থেকে ওই সময়টায় একটু পিছিয়ে যেত। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে স্টিমারটাকে লক্ষ করত।

ধীরে ধীরে তার ভয় ভাঙল। ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্টিমার থেকে মানুষজন, জিনিসপত্রের ওঠানামা লক্ষ করত।

আরো কিছুদিন পরে কুমুদ মিষ্টির দোকানের ছেলেদের সঙ্গে জলে নেমে যেত। জাহাজ ঘাটে ভিড়লে আশপাশের চমচম রসগোল্লার দোকানগুলো থেকে ছেলেরা হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি নিয়ে জলে নেমে যায়। জাহাজের যাত্রীদের আর ঘাটে নেমে মিষ্টি কিনতে হয় না। একতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দরদাম করে হাঁড়ি ভর্তি চমচম বা অন্য মিষ্টি কেনে।

বেড়াবাড়ির মিষ্টি খুব বিখ্যাত। ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত নাম তার। বেড়াবাড়ি স্টিমার-স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি নামডাক বেড়াবাড়ির চমচমের।

সেই চমচম বিক্রির ছেলেদের সঙ্গে কুমুদও জলে নেমে যায়। যাত্রীরা কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তার গতিবিধি লক্ষ করে।

ইতিমধ্যে মিষ্টির দোকানে, ছেলেদের সঙ্গে থেকে আর মিষ্টির দোকানের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে কুমুদের চমচম খাওয়া বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু অভ্যেস নয় চমচম সে আজকাল খুব পছন্দ করে।

একদিন মিষ্টির ঘরের বারান্দায় কুমুদকে ঘুর ঘুর করতে দেখে একজন যাত্রী পদ্মপাতায় চমচম খেতে খেতে একটা টুকরো ভেঙে কুমুদকে দেয়। কিছুক্ষণ ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর কুমুদ টুকরোটা খেয়ে নেয়।

সেই থেকে চমচমের প্রতি কুমুদের আসক্তি শুরু। এখন যে কেউ মিষ্টি খেলেই কুমুদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় একটু ছুঁড়ে দিলে খুশি হয়ে খেয়ে নেয়।

কুমুদের একটা বড়ো যোগ্যতা হল শূন্য থেকে মিষ্টির টুকরো লুফে নেওয়া। যে কোন বিদগ্ধ গোলরক্ষক লুফে নেওয়ার যোগ্যতায় তার কাছে হার মানবে। মজা করার জন্যে অনেকে কুমুদকে ছুড়ে ছুড়ে খাওয়ায়।

ইতিমধ্যে কুমুদের আরেকটা গুণ আবিষ্কৃত হল, আবিষ্কার করলেন স্টিমার যাত্রীরা। স্টিমার থেকে যদি জলের মধ্যে খাবারের টুকরো ফেলে দেওয়া হয় তবে কুমুদ সেটা সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিয়ে তুলে আনে। শুধু তুলেই আনে তা নয়, সেই টুকরোটা ঠোঁটে উঁচু করে তুলে ধরে সবাইকে দেখায়, যেন সে বাহবা চাইছে, তারপর সেটা গিলে ফেলে।

প্রত্যেক শনিবার বিকেলে আর সোমবার সকালে মানদায়িনী স্কুলের পণ্ডিত কাব্যতীর্থমশায় বাড়ি যাতায়াতের পথে কুমুদকে দেখে যান, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কুমুদ পণ্ডিতমশায়কে দেখলে আত্মহারা হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, দুচার সপ্তাহ পরে নিবারণবাবু আর পণ্ডিতমশায় লক্ষ করলেন, শনিবার বিকেলটা যেন কী করে টের পায় কুমুদ, দুপুর থেকেই কেমন চনমন করে, তারপর এক সময় বাস-স্ট্যাণ্ড পার হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পণ্ডিতমশায়ের জন্যে।

পণ্ডিতমশায় অভাবী শিক্ষক, তাছাড়া হাঁটা তাঁর খুব অভ্যাস। পয়সা বাঁচানোর জন্যে বাসে না এসে সাধারণত হেঁটে আসেন।

দূর থেকে কুমুদ পণ্ডিতমশায়ের ধূসর তালি দেওয়া ছাতা দেখলেই চিনতে পারে। বাস স্ট্যাণ্ডের থেকে একটু উত্তর দিকে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে, একটা বহু প্রাচীন তেঁতুলগাছের নিচে। ওই বাঁকের মুখে গাছের নিচে যেই পণ্ডিতমশায়ের ছাতাটা দেখা যায় কঁক কঁক করে গলা দিয়ে আহ্লাদি শব্দ করতে করতে কুমুদ ছুটে যায়।

পণ্ডিতমশায় অবাক হন না। ওতো আর কোনো সাধারণ হাঁস নয়। এই ধূলি মলিন পৃথিবীর কোনো পাখি নয় এ, এ হল তাঁর স্বপ্নের মন্দাকিনী কুমুদ।

(চার)
এলেম আমি কোথা থেকে

কুমুদ খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়।

সাদা ধবধবে, উন্নত গ্রীবা, গজেন্দ্রগমন, বুদ্ধিদীপ্ত গোল কালো চোখ, সমস্ত মিলে একটা রাজসিক ব্যাপার।

নদীর ভগ্ন পাড়ে। সাময়িক চালাঘরের ছোটো স্টিমার স্টেশনের অস্তিত্ব কুমুদের রূপের ছটায়, কুমুদের গৌরবে ঝলমল করতে লাগল।

প্রায় মাইল চল্লিশের উজানের স্টিমার স্টেশন এনায়েতপুর, সেখানকার এক যাত্রী বেড়াবাড়ি এসেছেন, টাউনে যাবেন বলে।

এনায়েতপুরের লোকেরা সচরাচর এ দিকে আসে না। কারণ তাদের এই টাউনে কোনো কাজ থাকে না, তাদের অন্য মহকুমা, অন্য জেলা।

এই যাত্রীটি এনায়েতপুরের সম্পন্ন চাষি, হানিফ মিঞা। গত বছর সামনের শহরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কুটুমবাড়িতে যাচ্ছেন এখন মেয়েকে নিয়ে যেতে। বোধহয় মেয়ের বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

ঘাটে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলেন হানিফ মিঞা। এমন সময় কোথা থেকে কুমুদ তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে এল। আজকাল অনেক যাত্রীর সঙ্গেই সে এরকম ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করে। বিভিন্ন লোকজন সম্পর্কে নিজস্ব স্পষ্ট মতামত আছে কুমুদের।

কুমুদ উপেক্ষা করে অনেক লোককেই, তাদের কাছে ঘেঁষে না। তারা কেউ যদি 'চই চই' কিংবা 'আয় আয়' করে ডাকে তাহলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, তাদের কাছে না গিয়ে বরং দূরে দূরে সরে যায়।

অন্যদিকে এমন অনেক লোক আছে যারা হয়তো কুমুদকে মোটেই খেয়াল করেনি, অথচ কুমুদ তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, পোষা বেড়ালের মতো গলা ঘষে তাদের শরীরে।

আবার এরকমও আছে যেখানে কুমুদ রীতিমতো অপছন্দ করে কাউকে। সে এমনিতে শান্ত, সংযত প্রকৃতির। কিন্তু কাউকে সে ঠিক কী কারণে তাড়া করে যায় বা কামড়াতে যায় বোঝা কঠিন। হয়তো শেষ পর্যন্ত ঠিক কামড়ায় না সে, তবে ভয় দেখায়।

হানিফ মিঞা একটা চমচমের দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চির উপরে বসে দুটো মিষ্টি খেয়ে একটা গোলাপি বিড়ি ধরিয়ে আয়েস করে চোখ বুজে টানছিলেন।

ধলেশ্বরী আর যমুনার বাঁকের উপরে বেড়াবাড়ি স্টিমার স্টেশন। শীত প্রায় শেষ। এখন বাতাস আর তত ঠাণ্ডা নয়, ধলেশ্বরীর দিক থেকে ঈষৎ শীতল দক্ষিণের হাওয়া আসে, একটা মাদকতাময় আবেশ আছে এই জলের গন্ধ মাখা হাওয়ায়, এখন শান্ত দিন, দুপুরে রোদে এখনো চড়া ওঠেনি।

মিষ্টির দোকানের আড়াই সের চমচম হাঁড়িতে ভালো করে বেঁধে দিতে বলেছেন হানিফ মিঞা, কুটুমবাড়িতে হাতে করে যাবেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আর মৃদু রোদের আমেজে একটু সময় কাটিয়ে তারপর কুটুমবাড়ি যাবেন, এমন সময় হাঁটুর কাছে

কিসের একটা কোমল স্পর্শে তাঁর খেয়াল হল, একটা সাদা ধবধবে রাজহাঁস মাথা [illegible] পায়ে।

হানিফ মিঞা রাজহাঁসটার দিকে ভালো করে তাকাতে সে মুখ উঁচু করে পরম মমতাময় দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার নরম করে ডাকল।

হানিফ মিঞা একদৃষ্টিতে, অনেকক্ষণ ধরে হাঁসটাকে পর্যবেক্ষণ করে তারপর মিষ্টির দোকানের মালিক হরেন ঘোষকে বললেন, 'ও ঘোষমশায়, এ হাঁসটা এখানে এল কোথা থেকে? এতো কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের হাঁস।'

হানিফ মিঞার বাড়ি এনায়েতপুর। এনায়েতপুরের পাশের গ্রাম কুমারগঞ্জ, এককালের খুব বর্ধিষ্ণু এলাকা। সেখানকার তালুকদার হলেন রায়চৌধুরীরা।

এনায়েতপুর খুব কাছের জায়গা নয়। প্রায় চল্লিশ মাইল নদী সাঁতরিয়ে বেড়াবাড়ি আসতে হয়েছে কুমুদকে। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। তাছাড়া নিজের এলাকা ছেড়ে হাঁস, পায়রা, গোরু, ছাগল গৃহপালিত পশুপাখি খুব বেশি দূরে কখনো যায় না, সেটা তাদের স্বভাবে নেই।

হানিফ মিঞার কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মধ্যবয়সী, ভারিক্কি গৃহস্থ মানুষ। তাঁর উল্টোপাল্টা কথা বলা স্বাভাবিক নয়।

অন্যদিকে কাছাকাছি অঞ্চলে দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কোনো বাড়িতে কেউ এরকম রাজহাঁস পুষেছে তা শোনা যায়নি। গরিব মানুষের জলা দেশ। রাজহাঁস কোনো কাজে লাগে না, এর ডিম মাংস কোনোটাই খাওয়ার মতো নয়। এ অঞ্চলে শখ করে কেউ রাজহাঁস পুষবে ভাবা যায় না।

তাছাড়া নানা জায়গার লোকজন স্টিমারে যাতায়াত করার পথে কুমুদকে অনবরতই দেখছে। কুমুদের মালিকরা কাছাকাছি অঞ্চলের লোক হলে নিশ্চয়ই তার এতদিনের মধ্যে তার খবর পেয়ে খোঁজ করতে বেড়াবাড়ি স্টিমার স্টেশনে আসত।

এতদিন কেউ কোথাও থেকে আসেনি। তাই কাব্যতীর্থমশায়ের স্বপ্ন অনুযায়ী এবং কুমুদের হাবভাব দেখে নিবারণবাবু নিশ্চিত হতে চলেছিলেন এ নিশ্চয়ই মা সরস্বতীর বাহন, মন্দাকিনীর নীলজলের আসল স্বর্গীয় রাজহংস। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।

তবু নিবারণবাবুর মনে একটা খট্‌কা ছিল ও হঠাৎ এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? আর যদি মা সরস্বতীর বাহন তবে কুমুদের গলা এত কর্কশ কেন?

একটু আগে বিরাজগঞ্জ ঘাটের ফিরতি স্টিমার ছেড়ে চলে গেছে। টিকিট

বিক্রির টাকা পয়সা জাহাজ কোম্পানির ক্যাশিয়ারের হাতে হিসাব করে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর তাকে স্টিমারে তুলে আরাম করে হিন্দু হোটেলের চাতালে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছিলেন নিবারণবাবু।

হিন্দু হোটেলের তেওয়ারি ঠাকুর ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো রেখেছে। নিবারণবাবুর তামাক খাওয়ার খুব নেশা নেই, কিন্তু মাঝেমধ্যে ধূমপান করতে ভালো লাগে। নিজে হুঁকো রাখেননি, তেওয়ারির হোটেল থেকে হুঁকো চেয়ে নেন। জ্ঞানদাদি চমৎকার তামাক সাজে। নিবারণবাবু যে তার হোটেলের হুঁকোয় তামাক খান এতে তেওয়ারি বেশ খুশিই হয়, হাজার হোক জাহাজ কোম্পানির লোক, জাহাজ কোম্পানির মেয়াদি জমিতেই তার এই রমরমা ভাতের ব্যবসা, কোম্পানির লোককে হাতে রাখা, খুশি রাখা ভালো।

হিন্দু হোটেলের সামনে সনাতন তাঁকে জানাল যে, এনায়েতপুর থেকে এক গৃহস্থ এসেছে, মিষ্টির দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছে, সে বলেছে যে হাঁসটা তাদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে।

কুমুদ এই পৃথিবীরই হাঁস। এই নদীরই অন্য কোনো তীরের কোনো গ্রামের একথা ভাবতে নিবারণবাবুর খটকা লাগে। তিনি হুঁকোটা রেখে হানিফ মিঞার কাছে গেলেন।

তখন বাঁশের বেঞ্চির উপর উঠে হানিফ মিঞার কাঁধের উপর আলগোছে ঠোঁট রেখে আয়েসে চোখ বুজে আহ্লাদে গরগর করছে কুমুদ।

হানিফ মিঞা নিবারণবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আসুন মাস্টারবাবু, খুব ভালো জাতের হাঁস এটা। রায়চৌধুরী সাহেবরা রেঙ্গুন না কোথায় মগের দেশ থেকে আনিয়েছিল।'

নিবারণবাবু একটু নিশ্চিন্ত হলেন, মগের দেশ মানে এসব দেশ নয়, স্বর্গের কাছাকাছি কোনো জায়গা হবে, হয়তো মন্দাকিনী নদীর তীরেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তবে কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরী সাহেবদের হাঁস?'

হানিফ মিঞা বললেন, 'আরো অনেক ছিল। সে বাড়ির বড়োগিন্নি খুব ভালোবাসত এদের, এদের পায়ে ঝুমুর বেঁধে দিয়েছিল। এখনও দেখুন পায়ে একটু দাগ আছ ঝুমুরের।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমাকে দেখে চিনতে পেরেছে। রায়চৌধুরীদের বড়ো দিঘিতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতাম মেজোকর্তার সঙ্গে। আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত।

নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন, 'ওখান থেকে চলে এল কেন?'

হানিফ মিঞা বললেন, 'বড়গিন্নি মারা গেলেন। কর্তা আর কর্তাদের ছেলেপিলেরা ঢাকা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। বছরে একবার পর্যন্ত বাড়ি আসে না। এরা রাজাপাখি, খালি বাড়িতে থাকতে পারেনা। সব সময় লোকজন হইচই পছন্দ করে। সব চারদিকে কোথায় কোথায় চলে গেল। যে দুএকটা শেষ পর্যন্ত ছিল সেগুলিও ভেসে গেল গত সনের বন্যায়। এনায়েতপুরের মাঠঘাট, কুমারগঞ্জের বাড়ি-ঘর, রায়চৌধুরীদের পুকুর দালান, স্টিমারঘাট, মায় নদী সব একাকার হয়ে গেল, হাঁসগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।'

কুমুদের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে হানিফ মিঞা বলল, 'ও ভাসতে ভাসতে চলে এল আপনার এখানে। এখানে তো ভালোই আছে দেখছি।'

ভালো যে আছে, সেটা প্রমাণ করার জন্যে মাথা উঁচু করে কয়েকবার ডানা ঝেড়ে কুমুদ খুশির সঙ্গে দু'বার কঁক-কঁক করে ডেকে উঠল।

আরেকবার রাজহাঁসের পালকে হাত বুলিয়ে হানিফ মিঞা চলে গেলেন, যাওয়ার সময় নিবারণবাবুকে বলে গেলেন, 'দেখতে পাবেন মাস্টারমশায়, খুব বুদ্ধিমান পাখি।'

(পাঁচ)
ভ্রমণকাহিনী

বাসস্ট্যাণ্ডের ওদিক থেকে পণ্ডিতমশায়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে কুমুদ সরাসরি নিবারণবাবুর ঘরে।

প্রত্যেক শনিবারই এমন হয়। আজও তাই হল। কিন্তু আজ যখন নিবারণবাবুর সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে পণ্ডিতমশায় বাড়ি যাওয়ার স্টিমারে উঠলেন, তাঁর পিছু পিছু কুমুদও পাটাতনের সিঁড়ি বেয়ে স্টিমারে গিয়ে চড়ল।

আজ কয়েকদিন হল কুমুদের এই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে। জাহজের অনেক খালাসির সঙ্গেই তার বেশ ভাব। দুএকজন সারেংও তাকে ভালোবাসে, পছন্দ করে।

এখন ঘাটে জাহাজ লাগলে সে আর খুব একটা ঘুরে ঘুরে ডুব দিয়ে যাত্রীদের ছুড়ে দেওয়া খাবার জলের থেকে তুলে নিয়ে খায় না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। তারপর স্টিমারের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখে। ইঞ্জিনঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ কৌতূহল নিয়ে যন্ত্রের দপদপ শব্দ কান পেতে শোনে। কখনো দেড়তলায় উঠে যায়, সারেং সাহেবের ঘরে ঢুকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

ফাল্গুন মাসের একেক দিন বিয়ের লগ্ন থাকে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে জোড়ায় জোড়ায় নতুন বিয়ে হওয়া বর-বউ ওঠে স্টিমারে, নতুন বউ লাল শাঁখা, লাল চেলি পরে শ্বশুর-বাড়ি যায়, মুখে ঘোমটা টেনে।

কুমুদের নতুন বউ খুব পছন্দ। কোনো স্টিমারে নতুন দম্পতি থাকলে সে সোজা সেখানে গিয়ে নতুন বউয়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখে। বরযাত্রীরা তার কাণ্ড আর হাবভাব দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রাজামশায়, নতুন বউ পছন্দ হয়েছে তো?' অথবা, 'কুমুদবাবু, এবার আপনিও একটা বিয়ে করুন লাল টুকটুকে বউ দেখে। আমাদের গাঁয়ের বিলে চমৎকার বুনোহাঁস আছে একবার গিয়ে দেখে আসুন না।'

মাঝে মাঝে দুচারটে গোলমেলে লোকও থাকে, বিশেষ করে বাচ্চাকাচ্চা হলে তো কথাই নেই। অনেকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরতে চায় কুমুদকে, কিংবা হয়তো গলাটা খপ করে চেপে ধরবে।

কিন্তু কুমুদ সতর্ক। মোক্ষ মুহূর্তে সে যেন কী করে টের পায়। সাবলীলভাবে নিজেকে এড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়া চলাফেরার মধ্যে রীতিমতো এটা রাশভারি ভাব রয়েছে, অনেকেই তাকে ভয় পায় রীতিমতো সমীহ করে। বিশেষ কেউ ঘাঁটাতে চায় না। তবে সবাই খুব অবাক হয়ে দেখে একটা সাদা রাজহাঁস, এত বড়ো একটা পাখি যাত্রীদের বাক্স বিছানা, ঘটিবাটির মধ্য দিয়ে চলাফেরা করছে, সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামাওঠা করছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠার সময়। যেই ভোঁ বাজল সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, খালাসিরা পাটাতনের সিঁড়ি তুলে ফেলার আগেই কুমুদ নেমে আসে স্টিমার থেকে। অনেক সময় এ সময়টা খুব ভিড় হয়, নদীর ঘাটে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে যে সব যাত্রীরা তারা সবাই হুড়োহুড়ি করে ছুটে আসে জাহাজে ওঠবার জন্যে, ভোঁ বেজেছে, এখনই ছাড়বে। অনেকে বেশ অস্থির হয়ে ওঠে।

ভিড়টা আসে উল্টো দিক থেকে। কুমুদ নামবে আর লোকজন উঠবে। কুমুদ ধৈর্য ধরে পাটাতনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে, যেইমাত্র উপরে ওঠবার ভিড়টা একটু পাতলা হয়ে আসে, সে টুক করে নেমে যায়, ঘাটে নেমে সোজা নিবারণবাবুর কাছে। নিবারণবাবু হাতের কাজ সারতে সারতে কুমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কুমুদ? তা হলে জাহাজ এবার ছাড়বে? সব ঠিক আছে তো?'

কুমুদ কোনো জবাব দেয় না। বেঞ্চির উপর উঠে নিজের পালকে মাথা গুঁজে চোখ বুজে থাকে। যেন অনেক পরিশ্রম করে এসেছে, এখন বিশ্রাম দরকার।

আজ শনিবার বিকেলে কাব্যতীর্থমশায়ের সঙ্গে কুমুদ গিয়ে জাহাজে চড়ল। শ্রীযুক্ত জয়গোপাল কাব্যতীর্থের বাড়ি বেড়াবাড়ি ঘাট থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে সেখানে নায়নার ঘাটে নেমে হেঁটে আরো তিন ক্রোশ গেলে তবে তাঁর গ্রাম আমোদপুর। সেখানে এক মাঝারি আয়তনের একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কর্তা এবং একমাত্র উপার্জনশীল পুরুষ।

বিধবা মা, বিধবা দিদি এবং এক বিধবা কন্যা তাঁর বাড়িতে। সংসারের চতুর্থ মহিলা তাঁর স্ত্রী একমাত্র সধবা। এ ছাড়া এক ভাগ্নে এবং তিনটি অপোগণ্ড পুত্রসন্তান নিয়ে তাঁর সংসার।

চাকরির সামান্য আয় বিঘে আড়াই ধানজমি আর কয়েক ঘর নিম্নমধ্যবিত্ত যজমান, কোনো রকমে তাঁর সংবৎসর কেটে যায়।

জিনিসপত্র দুর্মূল্য হচ্ছে। ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা কলকাতা থেকে আসা তিনদিনের বাসি খবরের কাগজ পড়ে আলোচনা করেন যুদ্ধ ঘরের কাছে এসে যাচ্ছে। চালের দর পাঁচ টাকায় উঠেছে, একটা মিলের মোটা শাড়ি আড়াই টাকা-তিন টাকা দাম।

তবে খুব একটা বেকায়দায় না পড়লে কাব্যতীর্থমশায় এসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পেতে চান না, তাঁর চিন্তা এখন অন্যত্র। একটি স্বর্গীয় হংসের মর্ত্যে আগমনের উপরে মন্দাক্রান্তা ছন্দে তিনি একটি দীর্ঘ পদ্য রচনায় হাত দিয়েছেন। তাতেই তাঁর হৃদয়-মন নিমজ্জিত।

স্টিমারে ওঠার মুখে একটু ভিড় ধাক্কাধাক্কি ছিল। ধুতির খুঁটে এ মাসের মাইনের টাকা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা আছে। তবে যা দিনকাল পড়েছে, শুধু হাট-বাজারেই নয়, আজকাল জাহাজেও গাঁটকাটা উঠছে।

কাব্যতীর্থমশায় একটু সাবধান হতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। কোনোরকমে গাঁট বাঁচিয়ে জাহাজের ওপাশে একটা হেলান দেওয়া বেঞ্চি আছে ডেকের ধারে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি তারপর এক কোনায় বসে খেয়াল করলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কুমুদও উঠে এসেছে, পায়ের কাছে বসে আছে।

পণ্ডিতমশায় ভাবলেন যে স্টিমার ছাড়ার সময়ে কুমুদ নেমে যাবে, এখন আহ্লাদ করে আমার সঙ্গে এসেছে, থাকুক; একটু বসে থাকুক।

কিন্তু অন্যদিন জাহাজের ভোঁ বাজলে কুমুদ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎগতিতে ঘাটে নেমে যায়, আজ কিন্তু তা করল না। আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের পা ঘেঁষে এল।

পণ্ডিতমশায় একটু বিচলিত বোধ করলেন, কুমুদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ও কুমুদ, লক্ষ্মীটি বাবা, জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে, নেমে যাও তাড়াতাড়ি।' কিন্তু কুমুদের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। সিঁড়ি তোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আরেকবার ভোঁ বাজল। পণ্ডিতমশায় সারেং সাহেবের ঘরে ছুটে গেলেন, 'ও সারেং সাহেব, জাহাজ ছাড়বেন না, রাজহাঁসটা যে নামে নি এখনো।'

সারেং ভদ্রলোক কড়া মানুষ, চট্টগ্রামের কৈবর্ত মাঝি, কোনোদিন কোনো বিশেষ যাত্রীর জন্যও তিনি নিয়মের অতিরিক্ত একমিনিট অপেক্ষা করেন না, আজকেও তাই হল।

শেষ মুহূর্তে নিরুপায় পণ্ডিতমশায় জাহাজের রেলিঙের ধারে ছুটে গিয়ে নিবারণবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনের শব্দ, লোকজনের, খালাসিদের চেঁচামেচি অতিক্রম করে ধলেশ্বরীর বিকেলের শনশন হাওয়া পণ্ডিতমশায়ের চিৎকার ঘাটে পৌঁছে দিতে পারল না।

পণ্ডিতমশায় চিন্তিত মুখে বেঞ্চিতে এসে বসলেন। তখন কুমুদ চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে তাঁর সিটের পাশে। পণ্ডিতমশায় কিন্তু অস্থির হয়ে উঠলেন, কী করা যায়। কুমুদকে যদি জলে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তাহলে ও নিশ্চয় সাঁতরিয়ে ঘাটে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু যদি স্টিমারের চাকার নিচে চলে যায়, তাহলে তো নির্ঘাত অপমৃত্যু।

পণ্ডিতমশায়ের অস্থিরতা দেখে একজন খালাসি তাঁর কাছে এগিয়ে এল এবং বলল যে, 'পণ্ডিতমশায়, হাঁস নিয়ে ভাববেন না, জাহাজ তো রাত্রে আবার বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরবে তখন হাঁসটা নামিয়ে দেব। এখন থাকুক না যেমন আছে।'

এত সহজ সমাধানটা পণ্ডিতমশায়ের মাথায় আসেনি। তিনি খালাসিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে খেয়াল করলেন তাঁরই এক পুরোনো ছাত্র, নামটা মনে পড়ছে না, কিন্তু খুব অগা ছেলে ছিল, কোনোদিন সংস্কৃতে পনেরর বেশি পায়নি। এইট-নাইন পর্যন্ত পড়েছিল, কিন্তু এখন তো দেখছেন বেশ বুদ্ধিমান হয়েছে। ধন্যবাদ না জানিয়ে প্রাক্তন ছাত্রটিকে জয়গোপাল কাব্যতীর্থ আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, 'বাবা, তুমি ফেরার সময় ওকে মনে করে নামিয়ে দিয়ো বেড়াবাড়ি ঘাটে।'

পুরোনো ছাত্রটি, তার নাম জানা গেল বলাই, সে পণ্ডিতমশায়কে আশ্বস্ত করল। 'আপনি ভাববেন না স্যার, আমি ঠিক বেড়াবাড়ি ঘাটে নামিয়ে দেব।'

বলাইয়ের দায়িত্বে কুমুদকে রেখে নয়নার ঘাটে জাহাজ পৌঁছতে পণ্ডিতমশায় নামতে গেলেন, কিন্তু অসুবিধে দাঁড়াল যে কুমুদ তাঁর পিছু নিল। বলাই ছুটে গিয়ে

কুমুদকে বাধা দিতে কুমুদ হিংস্রভাবে ধারালো ঠোঁট দিয়ে তাকে তাড়া করল যেভাবে প্রথমদিন বেড়াবাড়ির ঘাটে দাশু কুকুরটাকে আক্রমণ করেছিল।

তাতেও যখন বলাই ভয় পেল না, কুমুদ হঠাৎ জাহাজের রেলিঙের উপর দিয়ে পাখা মেলে হাওয়ায় ঝাঁপ দিল। পণ্ডিতমশায় সে দৃশ্য দেখে সেই প্রসারিত সাদা ডানা ঊর্ধে উঠে যেতে দেখে ভাবলেন, স্বর্গের হাঁস কুমুদ এবার মন্দাকিনীতে ফিরে যাচ্ছে।

কুমুদ কিন্তু আকাশে উড়ল না। সেই নয়নার ঘাটে গিয়ে একটা দোকানের সামনে পড়ল। বোধহয় ওড়া অভ্যেস নেই, মাটিতে পড়ে প্রায় মাথা উল্টিয়ে যাচ্ছিল, একটা ধাক্কা খেয়ে সামলিয়ে নিল।

ততক্ষণে পণ্ডিতমশায় ঘাটে নেমে এসেছেন। কুমুদও তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। চারপাশের কৌতূহলী জনতার রাজহাঁস সম্পর্কে নানা প্রশ্নে দুচারটে সংক্ষিপ্ত হুঁ-হুঁ করতে করতে পণ্ডিতমশায় মনস্থির করলেন।

এখনো সন্ধ্যা হতে বাকি আছে। এদিকটায় শেয়ালের খুব উৎপাত, এখন কুমুদ তাঁর সঙ্গে বাসায় চলুক। মনে হচ্ছে কুমুদ তাঁর পিছে পিছে হাঁটছে। বাসায় গিয়ে রাতে ভাঁড়ার ঘরটা কুলুপ এঁটে ওকে আটকিয়ে রাখতে হবে, নাহলে শেয়ালের হাতে মারা পড়বে। পথেও ভয় আছে, তবে দিনের বেলায় শেয়াল বেরবে না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

সত্যি সত্যি কুমুদ পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। ফাল্গুনের অপরাহ্ণের হলুদ রোদে নয়না ঘাটের ভাঙা রাস্তায় এক প্রৌঢ় গ্রাম্য কবি আর এক অমল রাজহাঁস চমৎকার পাশাপাশি যেতে লাগল।

সন্ধ্যার একটু আগে গ্রামে পৌঁছলেন পণ্ডিতমশায়। প্রতিদিন এই সময়ে তাঁর স্ত্রী ও জননীর কলহ লাগে, আজও যথারীতি তাই শুরু হয়েছে নিশ্চয়, ভাবতে ভাবতে পণ্ডিতমশায় বাড়ির দিকে এগোলেন। সঙ্গে পায়ে পায়ে কুমুদ।

কিন্তু গ্রামের মধ্যে কেমন একটা চাপা ভাব। সবার মুখ কেমন থমথমে মনে হল পণ্ডিতমশায়ের।

বাড়ির ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত দুঃসংবাদটা তাঁর সম্যক উপলব্ধি হয়নি। তাঁর বিধবা মেয়েটি আজ বিকেলেই ঢেঁকি-ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পণ্ডিতমশায়ের পরম আদরের প্রথম সন্তান সে, শুধু বাবাকে মৃতমুখ দেখানোর জন্যই শনিবার বিকেলে পর্যন্ত বোধহয় অপেক্ষা করছিল। পণ্ডিতমশায় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

সেদিন রাতে সবাই যখন শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে তার একটু আগে

পণ্ডিতমশায়ের জ্ঞান হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল, কিন্তু মা-বাবা-ঠাকুমার ভালোবাসার অভাব ছিল না। এত কী দুঃখ, কী অভিমান তার হয়েছিল! জয়গোপাল মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কুমুদের কথা মনে পড়ল।

আজ আকাশে এক বড়ো চাঁদ উঠেছে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে, আমের মুকুলের গন্ধে বাড়িঘর ছেয়ে গেছে। এইরকম সব অপার্থিব নিশীথে পৃথিবীর জলকাদা ডানায় ঝেড়ে ফেলে শুভ্র মরালেরা আকাশের নীলিমা অতিক্রম করে মন্দাকিনীর দিকে উড়ে যায়।

কাব্যতীর্থ মশায় বারান্দায় শুয়ে ছিলেন উঠে বসে দাওয়ায় ঠেস দিয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলেন, কুমুদ, কুমুদ কোথায় গেল?

(ছয়)
কুমুদিনী

ওই শনিবার রাতেই কুমুদ নয়নার ঘাটে ফিরে এসে সেখান থেকে ফিরতি স্টিমারে চড়ে বেড়াবাড়িতে এসে নামে। বলাই খালাসি নয়নার ঘাটে দেখতে পায় হাঁসটা ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে এসে জাহাজে উঠল। বেড়াবাড়িতে সে একাই নেমে যায়, বলাইকে কিছুই করতে হয়নি।

পণ্ডিতমশায় মেয়ের মৃত্যুর পর দুসপ্তাহ বিদ্যালয়ে যাননি। পনেরো দিন পরের এক সোমবারে যখন স্টিমারে চড়ে বেড়াবাড়ির ঘাটে এলেন, তিনি অবাক। ঘাটের সিঁড়ির উপরে কুমুদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাঁকে দেখে কুমুদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে এসে তিনি কুমুদের গায়ে-মাথায় হাত বুলোলেন।

এই কয়দিনে শোকটা তিনি একটু সামলে নিয়েছেন। কুমুদকে নিয়ে প্রতিদিনই চিন্তা করেছেন, শেয়ালে মেরে ফেলল না স্বর্গে উড়ে গেল, এই দুই অতি বিপরীত প্রশ্নের তাঁর কাছে কোনো সমাধান মেলেনি।

আজ সকালে স্টিমারে বলাই খালাসি যখন তাঁকে বলল যে সেইদিন রাতেই কুমুদ ফিরে গিয়েছিল, তিনি আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন।

কিন্তু বলাইয়ের আরেকটা কথা শুনে তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন, আজকাল নাকি একা একাই জাহাজে চড়ে এদিক-ওদিকে, এ-ঘাট সে-ঘাটে নামে, তারপর সময়মতো ঠিক উল্টো জাহাজে চড়ে বেড়াবাড়ি ফিরে আসে। এর মধ্যে তিন-চারদিন নাকি সে নয়নার ঘাটেও ঘুরে গেছে।

ঘাটে নেমে পণ্ডিতমশায়ের নিবারণবাবুর সঙ্গে দেখা হল। পণ্ডিতমশায়ের

সঙ্গে এ সব বিষয় আলোচনা করে তাঁর দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই, নিবারণবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি এ সব কথা উত্থাপন করলেন না। পণ্ডিতমশায়ের কাছে বরং ঘাটে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট যা কথা হল তা কুমুদের এই যাতায়াত নিয়ে, কুমুদের ভ্রমণ-প্রীতি বিষয়ে।

নিবারণবাবু পণ্ডিতমশায়কে বললেন, 'পণ্ডিতমশায়, আপনার কুমুদ এখন আর বেড়াবাড়ির কুমুদ নয়, সে ধলেশ্বরীর কুমুদ, সে ঘাটের কুমুদ থেকে জাহাজের কুমুদ হয়েছে।'

পণ্ডিতমশায় স্কুলে চলে গেলেন। কুমুদ তার পিছে পিছে হেঁটে রাস্তায় তাঁকে তেঁতুল গাছটা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর এসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল। হিন্দু হোটেলের কাঠ রাখবার জায়গায় বারান্দার এক কোণে রাখা কুকুরটার আজ কিছুদিন হল তিনটে বাচ্চা হয়েছে। তাদের সদ্য চোখ ফুটেছে। তাদের সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল কুমুদের। মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে দেখতে যায়। বিলুর এ ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি। সে কুমুদের এই উৎসাহ অতিরিক্ত সন্দেহের চোখে দেখে। কুমুদকে ওদিক পানে দেখলেই সে দাঁত খিঁচিয়ে আসে। কুমুদ এসব কিছু মনে করে না এখন, বিশেষ গ্রাহ্যও করে না। দাশু-রাশু এবং আর সকলের সঙ্গে সে মানিয়ে নিয়েছে।

কুকুরের বাচ্চা পর্যবেক্ষণ শেষ করে ধীরে-সুস্থে কুমুদ এনায়েতপুরে স্টিমারে এসে উঠল। স্টিমারটা আধ ঘণ্টা আগে ভিড়েছে, এবার ফিরবে। নানা জায়গার মধ্যে কুমুদ আজকাল মধ্যে মধ্যে এনায়েতপুরেও যায়।

তবে এনায়েতপুরে নেমে সে ঘাটের আশেপাশেই থাকে, তা নয়। তাকে অনেকে কুমারগঞ্জের দিকে যেতে দেখেছে। দিনের বেলা হলে সে হাঁটাপথেই কুমারগঞ্জে যায়, সে রাস্তাটা অল্প। কিন্তু সন্ধ্যা হলে সে আল দিয়ে যায়, এতে একটু ঘোরা হয়। শেয়ালের থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই সে এটা করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেশ বোঝা যায় এনায়েতপুর-কুমারগঞ্জের পথঘাট সবই বেশ চেনা কুমুদের। নিবারণবাবু খোঁজ নিয়েছেন শুধু হানিফ মিঞাই নয়, ও অঞ্চলের অনেকেই কুমুদকে ভালো চেনে। তারা বলেছে, কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের হাঁস, বুনো হয়ে গেছে।

রায়চৌধুরীদের দিঘিতেও দু-একবার গিয়ে ঘুরে এসেছে কুমুদ। সে পুকুরে এখনো তার স্বজাতি দু-চারজন আছে কিন্তু এই পর্যন্তই, পাকাপাকিভাবে সে কোথাও থাকে না। খুব ঝড় বাদলা বিপর্যয়ে স্টিমার চলাচল ব্যাহত না হলে,

যেদিক থেকেই হোক শেষ ট্রিপে কুমুদ বেড়াবাড়ি ঘাটে ফিরে অসে। একবার সারা ঘাট পরিদর্শন করে, মিষ্টির দোকানঘর থেকে কিছু খাবার খেয়ে নিবারণবাবুর ঘরে চলে আসে।

মিষ্টির দোকানে রাতের দিকে হাতে গড়া রুটি বিক্রি হয়। আজকাল কুমুদ রুটি খেতে শিখেছে। লোকেরা মজা করার জন্য তাকে রুটি ছুঁড়ে দেয়, সে শূন্যে ঠোঁট থেকে ঠোঁট দিয়ে লুফে নিয়ে দুপায়ের পাতার মধ্যে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তবে এখানো তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হল মুড়ি, সকালবেলায় নিবারণবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট।

সে যা হোক, একদিন এনায়েতপুরের জাহাজ আসতে অনেক রাত হল। বৈশাখ মাস সেটা. নদী শুকিয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে চড়া পড়ছে, ডুবো চড়া, জলের একটু নিচেই। তাতে এই খরার সময়ে কখনো কখনো স্টিমার আটকিয়ে যায়। সে এক ঝামেলা। বেশ সময় লাগে মাটি কেটে বেরিয়ে আসতে।

সেদিন যে জায়গাটায় স্টিমারটা আটকে গিয়েছিল, বেড়াবাড়ি থেকে দূরে নয়। মাত্র কয়েক মাইল।

স্টিমারটা আটকে যাওয়ার পর কুমুদ কী বুঝল কে জানে, সে তরতর করে নদীতে নেমে পড়ল। তারপর বেড়াবাড়ির দিকে রওনা হল। জাহাজের অনেকেই সে দৃশ্য দেখেছে।

দেখেছে পারের শেয়ালেরাও। তারা অনেকদিন ধরে রাজহাঁসটার ওপর নজর রাখছে। আজ তারা পাড় ধরে ধরে হাঁসের সঙ্গে বেড়াবাড়ি ঘাটের দিকে এগোতে লাগল। এক সঙ্গে প্রায় পাঁচ-সাতটা শেয়াল।

রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ঘাট অন্ধকার। মিষ্টির দোকানের হ্যাজাকগুলো নিবিয়ে দোকানটায় লণ্ঠন জ্বালিয়েছে। শুধু একটা ডে-লাইট নিবারণবাবুর অপিসের বারান্দায় জ্বলছে, তারও তেজ কমে এসেছে।

রাশুর তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চা ছোটোবেলায় শেয়ালে চুরি করে খেয়েছে। বাকি দুটো এর মধ্যে বেশ বড়ো হয়েছে। কিছুক্ষণ হল সেই বাচ্চা দুটো ঘাটের একটু পেছন দিকে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শুরু করছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল দাশু-রাশু গর্জন করতে করতে সেই দিকে ছুটে গেল। জলের ধারে চারটে কুকুরের এই চেঁচামেচি নিবারণবাবুর কেমন যেন মনে হল এবং তিনি সেই মুহূর্তে একটা তীব্র কর্কশ চিৎকার এবং স্পষ্ট ডানার ঝাপটানি শুনতে পেলেন। তাঁর হাতের কাছে কোম্পানির দেওয়া একটা বড়ো পাঁচ সেলের টর্চলাইট থাকে, সেটা নিয়ে

তিনি তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে এগোলেন। কুকুরদের ডাকাডাকি শুনে জ্ঞানদাদি পাশের ঘাটে বাসন মাজছিল, সেও দৌড়ে এল লণ্ঠন হাতে।

পাঁচ সেলের টর্চের তীব্র আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন নিবারণবাবু কুমুদকে। ঘাটের কাছে পাঁচ-ছটা বড়ো বড়ো শেয়াল ঘিরে রয়েছে। চেঁচামেচি করছে বটে কিন্তু খাড়া পাড় থেকে তার কুড়ি ফুট নিচে লাফিয়ে নামতে পারবে না, ধূর্ত শেয়ালেরা সেটা বুঝতে পেরেছে।

নিবারণবাবুর টর্চের আলো পড়তেই শেয়ালগুলো একটু হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ সবচেয়ে সামনে যে শেয়ালটা ছিল তার মাথায় বিদ্যুৎগতিতে একটা তীক্ষ্ণ ঠোকর দিল, তারপর আর একটা, তারপর আরেকটা। ততক্ষণে জ্ঞানদাদি লণ্ঠন নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে গেছেন। আহত শেয়ালটা করুণ আর্তনাদ করে সরে যেতেই কুমুদ তরতর করে জল থেকে উঠে জ্ঞানদাদির লণ্ঠনের সামনে চলে এল। তখনো একটা লোভী শেয়াল তার পিছে পিছে এগোচ্ছিল, কুমুদ ক্ষিপ্র ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো সহসা ঘুরে গিয়ে তাকে তাড়া করে গেল।

এদিকে ঘাটের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে দাশু-রাশু এবং বাচ্চা দুটো এবার জ্ঞানদাদির কাছে পৌঁছে গেছে। তারা চারজনে নদীর ধারে ধারে প্রায় আধ মাইল রাস্তা শেয়ালগুলোকে তাড়া দিয়ে বিদায় করে এল।

এতক্ষণে ঘাটের যত লোক সব নদীরধারে এসে দাঁড়িয়েছে। রীতিমতো হইচই কাণ্ড, কুমুদের এই সাহস ও বীরত্বের গল্প সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

পরের দিন স্কুলে পণ্ডিতমশায় কুমুদের এই কাহিনী ঘাটের পাশের হাজি বাড়ির একটা ছেলের কাছে শুনে বিকেলবেলা ছুটির পর উদ্বিগ্ন চিত্তে কুমুদকে দেখতে এলেন বেড়াবাড়ি ঘাটে।

অনেকদিন পরে আজ প্রথম এমন হল যে তিনি তেঁতুল গাছটার নিচে এসেছেন কুমুদ অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে এই পরিচিত ও প্রিয় দৃশ্য দেখতে পেলেন না। তাঁর আরো চিন্তা হল, তাহলে কুমুদ কী গুরুতর আহত হয়েছে?

ঘাটে এসে নিবারণবাবুর কাছে যা শুনলেন সেটা অবশ্য সুখবর। কুমুদকে শেয়ালেরা কিছু করে উঠতে পারেনি। শুধু দু-একটা পালক ঝরেছে। কুমুদ ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। রাতে ভালো ঘুমিয়েছে, ভোরবেলা নিবারণবাবুর সঙ্গে মুড়ি খেয়েছে, তারপর ঘাটের চাতালে নেমে রাশুর বাচ্চা দুটোর সঙ্গে খেলা করেছে।

কুকুরছানা দুটোর সঙ্গে কুমুদের খুব ভাব। এখন আর রাশু ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। কুকুরছানা দুটো বড়ো হয়েছে, তারা ছুটে ছুটে এসে কুমুদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে, নকল মারামারি করে, আবার তারা যখন জাপটা-জাপটি করে ক্লান্ত হয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে, কুমুদ দুষ্টুমি করে তাদের লেজ টেনে বিরক্ত করে।

আজ সকালেও বাচ্চা দুটোর সঙ্গে কুমুদ অনেকক্ষণ খেলেছে। তারপর বিরাজগঞ্জের জাহাজ এলে সেটায় চড়ে চলে গেছে।

পণ্ডিতমশায় ফিরে গেলেন। দুঃখের বিষয় পরের শনিবার কুমুদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। কুমুদ সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঠিকই ফিরছিল, কিন্তু দুদিন পরে বৃহস্পতিবার দিন থেকে আর ফেরেনি।

নিবারণবাবু চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এনায়েতপুর থেকে খবর এসেছ, কুমুদ কুমারগঞ্জের রায়চৌধুরীদের দিঘিতে নাকি ফিরে গেছে। সেখানেই অন্য হাঁসেদের সঙ্গে থাকছে।

রায়চৌধুরীদের দিঘিতে বড়ো বড়ো মাছ। এখান থেকে অনেক লোক ছিপ নিয়ে সেখানে মাছ ধরতে যায়। তারা কুমুদকে ভালো চেনে। তারা সেখানে কুমুদকে দেখেছে।

কুমুদকে চেনা অবশ্য এখন কঠিন নয়। নানা ঘাটে যায় তাই একটা তার দিয়ে তিনি কুমুদের পায়ের সঙ্গে তামার চাকতি লাগিয়ে দিয়েছে, তাতে লেখা অছে।

কুমুদ
C\O, নিবারণবাবু
বেড়াবাড়ি ঘাট।

পরের সোমবার বাড়ি থেকে ফেরার পথেও পণ্ডিতমশায় কুমুদকে দেখতে পেলেন না।

কুমুদ এল ঠিক সাত দিন পরের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, এনায়েতপুরের জাহাজে। শুধু নিবারণবাবু নয়, ঘাটের সবাই খুশি হল তার ফেরায়। লোকেরা তাকে আদর করে রুটি আর চমচম খাওয়াল।

পরের দিন সকালবেলা বুকিং ঘর খুলে পরিষ্কার করতে গিয়ে সনাতন দেখল যে হাঁসের ডিমের চেয়ে অনেক বড় আকারের, ধবধবে সাদার মধ্যে ঈষৎ নীলচে আভা একটা বড়ো ডিম ঘরের মেঝেয়।

কুমুদের ডিম এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সনাতন তাড়াতাড়ি নিবারণবাবুকে ডেকে আনল,—

মাস্টারবাবু, দেখে যান আপনার নাতি হয়েছে।

পরের শনিবার পণ্ডিতমশায় যখন এলেন, তখন কুমুদ নেই। কিন্তু কুমুদের ডিমটা একটা বেতের ঝুড়ির মধ্যে বালির উপরে বসিয়ে রেখেছেন নিবারণবাবু, সেটা পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়ে বললেন, সনাতন যা বলেছিল ঠিক তাই, 'এই দেখুন আপনার নাতি হয়েছে। তবে পৌত্র নয় দৌহিত্র আপনার হিসেব ভুল হয়েছিল, ও কুমুদ নয়, ও হল কুমুদিনী।'

নাতি, দৌহিত্র ওসব বোধহয় নিবারণবাবুর উল্লেখ না করাই ভালো ছিল। অনেকদিন পরে পণ্ডিতমশায়ের মৃতা কন্যার কথা মনে পড়ল, তিনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তারপর পাঞ্জাবির ময়লা হাতা দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'ডিমটা ফুটবে?'

(সাত)
বুঁচি

বৃহস্পতিবার অনেক বেলা পর্যন্ত কুমুদ বেড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু একবারও ডিমের কাছে ফিরে আসেনি। কিছুক্ষণ কুকুরের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে এ দোকান সে দোকান করে অবশেষে নিবারণবাবুর ঘরে ঢুকে বাঁশের বেঞ্চিটার উপর বসে থেকেছে।

অন্যদিন এ সময় সে স্টিমারে চড়ে বসে, আজ তার এই মতি পরিবর্তন দেখে নিবারণবাবু খুশি হলেন, যাক মা হয়ে একটু স্থির হল মনে হচ্ছে।

কিন্তু কুমুদ স্থির হয়নি। আগবেলায় যখন নয়না ঘাটের জাহাজ এল, সে গিয়ে উঠে বসল সেটায়। সেই থেকে সে নিরুদ্দেশ। বলাই খালাসি বলেছে সেদিন ফিরতি পথে সে আর কুমুদকে দেখেনি।

কুমুদকে দেখতে পেলেন পণ্ডিতমশায়, শনিবার বিকেলে নয়নার ঘাটে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিল। জাহাজ থাকতেই সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল, সেই পুরনো কঁক, কঁক করতে করতে । তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে জয়গোপাল কাব্যতীর্থ যা শুনলেন তা আরো তাজ্জব ব্যাপার। বৃহস্পতিবার বিকেলেই এই হাঁসটা তাঁর বাড়িতে এসেছে।

সোজা আটচালা শোয়ার ঘরটাতে ঢুকে তাঁর মেয়ে যে চৌকিটাতে শুত সেই চৌকির উপর উঠে চোখ বুজে ঘুমিয়েছে। একটা অচেনা এতবড়ো পাখি ঘরের মধ্যে, সবাই খুব দুশ্চিন্তিত, কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের বৃদ্ধা মা বারবার বলেছেন, 'ওরে ও যে বুঁচি, বুঁচি যে ফিরে এসতেছে, ওকে তোরা তাড়াসনে।

বুঁচি পণ্ডিতমশায়ের মেয়ের নাম। ঠাকুমার এই কাতর অনুরোধের পরে কেউ আর কুমুদকে ঘাঁটায়নি। সারাদিন কুমুদ এদিক-ওদিক ঘুরেছে। সন্ধ্যায় এসে বুঁচির শূন্য বিছানায় নিশ্চিন্তে বসে সাদা পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে চোখ বুঝে সারারাত নিঃশব্দে ঘুমিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এসে এই ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কবি জয়গোপাল। তাঁর 'কুমুদসম্ভব' কাব্য কাহিনীর প্রায় সবটাই বদলাতে হবে মনে হচ্ছে। কাল সকালে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসতে হবে। যেখানে শৌর্য, বীর্য ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন সেখানে কুমুদকে উদাসীন স্বর্গীয় মরাল বলে স্তুতি করেছেন, সেই সমস্ত শ্লোক পাল্টাতে হবে। আর তাছাড়া, সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গে পুংলিঙ্গে অনেক গোলমাল, প্রতিটি ছত্রেই অনেক সংশোধন হয়তো প্রয়োজন হবে।

তা হোক, কুমুদ অথবা কুমুদিনীকে দেখে তাঁর মন ভরে গেল, বিশেষ করে পরদিন। সকালবেলায় যখন কুমুদিনী তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, তিনি বারান্দায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, কুমুদিনী তাঁর মাথায় ঠোঁট দিয়ে আলতো করে বিলি দিতে লাগল। তাঁর কেমন মনে হল এ স্পর্শ তাঁর চেনা, এ সেই ছোটোবেলার বুঁচি, ঠিক এমনি করেই আঙুল বোলাত। তিনি কুমুদিনীর দিকে তাকালেন, সেই চোখ, কালো অন্ধকার, ছায়াময় ভালবাসাময় চোখ। এ কে, বুঁচি না কুমুদিনী? গরিব পণ্ডিতের দুঃখিনী বিধবা মেয়ে নাকি স্বর্গের মন্দাকিনীর রাজহংসী।

রাজহংসী নিয়ে খুব বেকায়দায় পড়লেন কাব্যতীর্থমশায়। তাঁর শ্লোকগুলো পালটাতে গেলে রাজহংসিনী মন্দাক্রান্তায় সহজ হয়। কিন্তু অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে শ্যামাঙ্গিনী লিখে বড়ো জব্দ হয়েছিলেন, সোমপ্রকাশের সমালোচক এই ব্যবহার ক্ষমা করেননি। তখনো বঙ্কিম ঋষি হননি, ঋষি হলে হয়তো আর্য প্রয়োগ হত। ভয়ে ভয়ে বঙ্কিম নিজেকে সংশোধন করেছিলেন।

জয়গোপাল কাব্যতীর্থ বঙ্কিমের অন্ধ ভক্ত। তাঁর ধারণা বঙ্কিম কিছু ভুল করেননি। তিনি 'কুমুদসম্ভব' কাব্য আগাগোড়া রাজহংসিনীতে ভরিয়ে দিলেন, বাংলায় সংস্কৃতে দুবার লিখে দেখলেন রাজহংসিনী চমৎকার দেখায়।

যাকে নিয়ে এত সমস্যা সেই কুমুদ কিংবা কুমুদিনী, রাজহংস কিংবা রাজহংসী কিংবা রাজহংসিনী সে কিন্তু নির্বিকার। সে ভুলে গেল বেড়াবাড়ি ঘাট, ভুলে গেল এনায়েতপুর, কুমারগঞ্জ, নয়না ঘাট, ভুলে গেল তার শুভ্রনীল ডিমের কথা।

কুমুদিনী মিলে মিশে হারিয়ে গেল এক আধা-গরিব আধা-কবি পণ্ডিতের সংসারে। পণ্ডিতমশায়েরা বাড়ির পিছনের ছোটো পানাপুকুরে সাঁতরিয়ে, জলে ডুবে মাছ ধরে সে চমৎকার কাটিয়ে দিল তার দিন।

এর মধ্যে একদা গান্ধীজি ডাক দিলেন, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে, আর. এস. এন. কোম্পানির জাহাজ বয়কট হল। চালের দর উঠল টাকা-টাকা সেরে, রেঙ্গুন থেকে জাপানিরা সামনের দিকে এগোচ্ছে; রেঙ্গুন থেকে খবর পৌঁছে গেল বেড়াবাড়ি আর নয়নার ঘাটে।

সে গল্প আমার নয়, সে গল্প অন্যেরা লিখেছেন। যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে যাব না, সে আমার কাজ নয়। শুধু আর একটু বাকি আছে। সেটুকু বলেই আমার কাজ শেষ।

সেই শেষটুকু ছোটো করে বলি।

কুমুদিনীর সেই ডিম। সেটা নিবারণবাবু হাজি-বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, যদি তাঁদের মুরগিরা তা দিয়ে ফোটাতে পারে। সত্যি একদিন একটা হাঁসের ছানা বেরল, রোগা টিঙটিঙে, রোমহীন লম্বা গলা ছাল-ছাড়ানো চেহারা। সেটা হাজি-বাড়িতেই মুরগির ছানাদের সঙ্গে বড়ো হতে লাগল।

একটু বড়ো হতেই ছানাটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলে এল বেড়াবাড়ি ঘাটে, একা একাই। তাঁর রক্তের মধ্যে রয়েছে জল, জাহাজ আর ঘাটের টান।

নিবারণবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, একেবারে কুমুদ। সেই ধবধবে রঙ, রাজসিক চেহারা, চালচলন সব কিছুতে অভিজাত। এখনো কুমুদের মতো বড়োসড়ো হয়নি, আরেকটু বাড়বে।

ঘাটের যাত্রীরা, জাহাজের খালাসিরা সবাই ধরে নিল এই সেই পুরনো হাঁসটা, কোথায় গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। কেউ জানে না, সেই হাঁসটা অনেকটা দূরের গ্রামে এক কবির বাড়ির অন্দরে ঢুকে গেছে।

সবাই ভুল করে। এমনকি পণ্ডিতমশায় পর্যন্ত। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে মায়ের মতোই যখন কুমুদিনীর ছেলে পণ্ডিতমশায়কে দেখে এগিয়ে যায় তেঁতুলতলার দিকে, তিনি চমকিয়ে ওঠেন, তাঁর বাড়ি থেকে কুমুদিনী কী চলে এল!

বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর কুমুদিনী, তাঁর বুঁচি ঠিকই আছে।

নাটক

ময়দানব

ভূমিকা

উনিশ শতকের কলকাতায় ব্রাহ্মগুরু আচার্য কেশবচন্দ্র সেন থেকে নিষিদ্ধ গোমাংস বিক্রেতা উইলসেন পর্যন্ত বিভিন্ন সেনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাঁরা নাকি কলকাতার যুবকদের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিলেন। এ নিয়ে গান বাঁধাও হয়েছিল।

হেনিরিক ইবসেন তখনও কলকাতায় এসে পৌঁছাননি। তা হলে হয়তো সেই তালিকায় ইবসেনও যুক্ত হতেন।

ইবসেন বাঙালির বড়ো কাছের মানুষ। তাঁর পুতুল খেলা, গণশত্রু বাঙালির ঘরের ঘটনা। শম্ভু মিত্র তাঁর কাহিনী অবলম্বনে নাটক করেছেন, সে নাটক বছরের পর বছর অভিনীত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর নাটকের ছায়ায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, সেও অসামান্য।

আমি নাটক বা সিনেমার লোক নই, কিন্তু বহুকাল আগে প্রথমে পুতুল খেলা দেখে এবং অব্যবহিত পরে ওই নাটক দেখার সূত্রেই উদ্বুদ্ধ হয়ে মর্ডান লাইব্রেরির কলেজ এডিশনে ইংরেজি অনুবাদে ইবসেনের কয়েকটি নাটক পড়ে ফেলি এবং টের পাই বইটা কিনতে যে সাড়ে চার টাকা ব্যয় করেছি, সেটা নষ্ট হয়নি।

এতদিন পরে প্রায় দায়ে পড়ে হেনরিক ইবসেনের একটি নাটক অনুবাদ করতে বসেছিলাম। কিন্তু অনুবাদ করা হল না, ইবসেন অনুবাদ করা যায় না। আমাকে প্রায় নতুন করে একটা নাটক লিখতে হল।

এটা আমার পক্ষে বেশ কঠিন কাজ। কারণ এর আগে আমি কোনো নাটক লিখিনি, শুধু ডোডো-তাতাই পালাকাহিনীতে কয়েকটা শিশুনাটিকা ছিল।

তবু একটা কথা স্বীকার করি; যতই কষ্ট হোক, নাটকটা লিখতে খুব ভালো লেগেছে। হেনরিক ইবসেনের মতো বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে রচনা করলাম হয়তো সেই জন্যে। আরও একটা গোপন কারণ আছে, আমার রম্যরচনার পাঠক-পাঠিকারা হয়ত লক্ষ করেছেন. ডায়ালগ লিখতে আমার খুব ভালো লাগে, সেদিকে একটা ঝোঁক আছে আমার।

'ময়দানব' নামক এই নাটকটি বিল্ডার এবং প্রমোটারদের নিয়ে লেখা। একেবারে হাল আমলের বিষয়।

আঠারশো বিরানব্বুই সালে ইবসেন মূল নাটকটি রচনা করেন। ইবসেনের নাটকটির নাম ছিল, 'মাস্টার বিল্ডার'। যত দূর জানি এবং অনুমান করি বাংলা ভাষায় বইয়ে কিংবা মঞ্চে এখনও মাস্টার বিল্ডার প্রবেশ করেনি।

এই নাটকের বঙ্গীয়করণে আমি চূড়ান্ত স্বাধীনতা নিয়েছি। এ বিষয়ে কারও কোনো অনুযোগ নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না।

স্থান

বিখ্যাত স্থপতি হলধর সান্যালের বাড়ি। তাঁর বাড়ির বাইরের ঘরে 'হলধর বিল্ডার্সের' অফিস্। এই ঘরেই প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক বাড়ির ভেতরের ড্রইংরুম।

তৃতীয় অঙ্ক বাড়ির বড়ো বারান্দায়।

কাল

আধুনিককালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটিকে সাজানো হয়েছে, যদিও ইবসেনের মূল রচনার বয়েস একশো বছরেরও বেশি।

পাত্র-পাত্রী

হলধর সান্যাল—স্থপতি, বয়েস ৫৫

অলি সান্যাল—ওই স্ত্রী, বয়েস ৫০

ডাঃ হরিদয়াল—পারিবারিক ডাক্তার, বয়েস ৪৫

ব্রজেশ নিয়োগী—হলধরের অধীনস্থ স্থপতি, বয়েস ৫৬

রঞ্জন নিয়োগী—ব্রজেশের ছেলে, তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, বয়েস ২৭

কাজল সেন—ব্রজেশের বন্ধুকন্যা, কেরানি, বয়েস ২৫

অঙ্গনা বসুরায় ঃ অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণী এবং কয়েকজন মহিলা, জনতা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক ঃ

প্রথম দৃশ্য

কলকাতার সল্ট লেকের একটি বড়ো বাড়ির বাইরের ঘর। বেশ লম্বা এবং চওড়া, রীতিমতো হলঘর বলা যায়।

ঘরের দরজার গায়ে নেমপ্লেট তথা সাইন বোর্ড লাগান আছে।

'হলধর বিল্ডার্স'।

ঘরে ঢোকার মুখে দুটো বড়ো বড়ো ড্রয়িং টেবিল। প্রথমটিতে হলধরের সহপাঠী ব্রজেশ নিয়োগী বসেন, দ্বিতীয়টি ব্রজেশবাবুর ছেলে রঞ্জনের টেবিল। ঘরটা পার্টিশন করা, ওধারে একটু আড়ালে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে একটা টাইপ মেশিন। একগাদা চিনেবাজারে কেনা হলুদ রঙের ফাইল। পাশে একটা চিনেমাটির ফুলদানিতে এখনও ম্রিয়মাণ হতে দুয়েকদিন লাগবে এমন একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। এটা ব্রজেশবাবুর বন্ধুকন্যা কাজলের টেবিল। তার পাশে একটা পুরোনো সোফা, কয়েকটা চেয়ার। এটাই অফিস ঘর। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা ব্রজেশবাবুরই অফিস। হয়তো একদা তাই ছিল, এখন এটা হলধর সান্যালের অফিস, তাঁরই নামে কোম্পানির নাম 'হলধর বিল্ডার্স।'

ব্রজেশ নিয়োগী রোগা চেহারারা মানুষ। মাথায় এলোমেলো সাদা ধবধবে চুল। গায়ে ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট। তিনি এই কোম্পানির মালিক হলধর সান্যালের একদা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সহপাঠী ছিলেন। বহুকাল আগে দু'জনে একসঙ্গে ব্যবসাতে নেমেছিলেন কিন্তু ব্রজেশবাবুর পক্ষে ব্যবসার গতিবিধি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। এখন বন্ধুর ফার্মেই কাজ করেন, তাঁর ছেলে রঞ্জন এবং বন্ধু কন্যা কাজল তাঁর সঙ্গে এখানেই কাজ করে।

রঞ্জনের বয়েস সাতাশ, মোটামুটি সুবেশ, তবে চেহারার মধ্যে একটা ঘাড়গোঁজা ভাব। কাজল মেয়েটি রোগা, পাতলা। সাজগোজ নিখুঁত, নীল ফুল-ফুল সালোয়ার-কামিজ পরনে।

ঘরের মধ্যে তিনজনেই আপনমনে মাথা নিচু করে কাজ করছেন। ব্রজেশ নিয়োগী একটা নকশা খুঁটিয়ে দেখছেন। রঞ্জন একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে ফাইলের কী সব যোগ-বিয়োগ মেলাচ্ছে। ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা রয়েছে, যা কাজলের টাইপ-রাইটারের শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ চেয়ার সরিয়ে ব্রজেশ উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারের শব্দে রঞ্জন ও কাজল দুজনেই চোখ তুলে তাকাল।

ব্রজেশ : (একটা জোর নিশ্বাস নিয়ে টেবিল থেকে দরজার দিকে এগিয়ে) কিচ্ছু হচ্ছে না। আমি আর পারছি না।

কাজল : (ব্রজেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে) ব্রজেশকাকা, তোমার খুব শরীর খারাপ লাগছে?

ব্রজেশ : প্রত্যেকদিন আমার শরীর আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জন : (চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্রজেশের দিকে এগিয়ে এসে) বাবা তুমি বাড়ি যাচ্ছ না কেন? বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমনোর চেষ্টা করো। একটু বিশ্রাম নাও।

ব্রজেশ : (বিরক্ত হয়ে) এই ভর বিকেলে বিছানায় গিয়ে শোবো?

কাজল : একটু বাইরে থেকে খোলা বাতাসে হেঁটে এসো। তোমার ভালো লাগবে।

রঞ্জন : চলো। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ব্রজেশ : (বেশ জোরের সঙ্গে) না আমি এখন কোথাও যাব না। আমি হলধরের জন্যে অপেক্ষা করছি। তার সঙ্গে একটা শেষ ফয়সালা করতে চাই।

কাজল : (উদ্বিগ্নভাবে) না ব্রজেশকাকা তুমি এ রকম কিছু করতে যেয়ো না।

রঞ্জন : বাবা, তুমি আর একটু দ্যাখো।

ব্রজেশ : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) না সেটা সম্ভব নয়। আমার আর অপেক্ষা করার মতো সময় নেই।

কাজল : (হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে) চুপ! আমি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। (তিনজনেই নিজের নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ চুপচাপ।) (অফিসঘরের পাশে একটা হলঘর। হলঘরের দরজা ভেজানো। সেই দরজা দিয়ে হলধর সান্যাল অফিস-ঘরে এলেন। পার্টিশনের ওপাশে কাজলের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় না যে, তিনি ব্রজেশের সমবয়সী, এককালের সহপাঠী, রীতিমতো তরুণ চেহারা, হৃষ্টপুষ্ট, শক্ত-সমর্থ। মাথার কোঁকড়া চুল ছোটো করে

ছাঁটা। কালো গোঁফ। ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, হাতে একটা পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ।)

হলধর : (কাজলের চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে পার্টিশনের ওধারে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে নিচু গলায়) ওরা চলে গেছে?

কাজল : (ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে) না। (চেয়ারের বাঁ-পাশের হাতলে সে তার হালকা নীল রঙের ওড়নাটা রেখেছিল, সেটা সে আলগোছে বুকের ওপর রাখল।)

(হলধর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপরে তাঁর হাতের পোর্টফোলিয়ো ব্যাগটা রাখলেন এবং তারপর আবার কাজলের পাশে ফিরে এলেন।) কাজল একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি টাইপ মেশিনের পাশ থেকে একটা লেজার খাতা বের করে কোনো একটা কিছু লিখতে লাগল।

হলধর : (ঝুঁকে পড়ে) কাজল খাতায় কি লিখছ?

কাজল : (একটু অপ্রস্তুত হয়ে) না, এই আর কী।.....

হলধর : লেজার খাতাটা দেখি একটু। (তারপর একটু থেমে) আচ্ছা কাজল, তুমি আমাকে দেখলে এমন জড়সড় হয়ে যাও কেন? হঠাৎ ওড়নাটা জড়িয়ে ফেললে।

কাজল : (বিব্রতভাবে) ওড়না ছাড়া আমাকে কুচ্ছিত দেখায়।

হলধর : (একটু হেসে) তোমাকে কুৎসিত দেখায় এটা তুমি চাও না, তাই না কাজল?

কাজল : (হলধরের দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে) না। আপনার সামনে নয়।

হলধর : (কাজলের মাথায় হাত রাখলেন) হায়রে বোকা মেয়ে!

কাজল : (মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়ে) একটু আস্তে কথা বলুন। ওরা শুনতে পাবে।

(হলধর একটু সরে গেলেন। কিছুক্ষণ ঘরের পার্টিশনের ওপাশটার দিকে তাকিয়ে রইলেন)

হলধর : আমি যখন ছিলাম না, তখন আমার কেউ খোঁজ করেছিল?

কাজল : হ্যাঁ, সেই অল্প বয়েসী স্বামী-স্ত্রী এসেছিলেন, যাঁরা নরেন্দ্রপুরে বাড়ি করতে চান।

হলধর : (একটু গম্ভীর হয়ে) ও তারা? ওদের একটু অপেক্ষা করতে

হবে। প্ল্যান স্যাংশন করানো আজকাল খুব কঠিন হয়ে গেছে।

কাজল : ওরা বলছিল, প্ল্যান তৈরি করার আগে আপনি যদি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেন। আর তা ছাড়া ওরা নিজেরাও প্ল্যানটা পাস করিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। ওদিকে ওদেরও কিছু চেনাশুনো আছে।

হলধর : (একটু বিরক্ত হয়ে) হ্যাঁ, সবই ও রকম ভাবে। আজকালকার দিনে এসব আর অত সোজা নয়।

(হলধরের গলা শুনে ব্রজেশ ও রঞ্জন দুজনেই পার্টিশনের এপাশে চলে এসেছে। ব্রজেশই প্রথম কথা বলল।)

ব্রজেশ : আসলে ওরা দুজনে নিজেদের একটা ছোটো বাড়ি বানানোর স্বপ্নে অস্থির হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করতে চায়।

হলধর : সব সেই এক ব্যাপার। এরা বাড়িটাড়ি চায় না, এরা ভাবে, কোনোরকমে একটা মাথাগোঁজার জায়গা! মাথার ওপরে এক টুকরো ছাদ হলেই হয়ে যাবে। এ সব হা-ঘরেদের বাড়ি আমি করব না। পরের বার এলে বলে দিয়ো, শহরে অনেক লোক আছে, তাদের কাছে যাক, হলধর সান্যাল ফরমায়েস খাটে না।

ব্রজেশ : (চোখের মোটা কাচের, ভারি ফ্রেমের চশমাটা কপালে তুলে) তুমি বলছ অন্যের কাছে যেতে? তা হলে তোমার কী হবে? তোমার লাভ, তোমার কমিশনের কী হবে?

হলধর : (অস্থিরভাবে) এটা আবার কী ধরনের কথা হল? তুমি জানো না, আমি ফালতু কাজ করি না। (একটু থেমে) তা ছাড়া এ সব বাজে ছেলেমেয়ে, এদের কাজ করে টাকা-পয়সা পাব তার ভরসা কী?

ব্রজেশ : ও সব কথা বলো না। ছেলেমেয়ে দুটি অত্যন্ত ভালো। রঞ্জন ওদের অনেকদিন ধরে জানে। মেয়েটির বাবাকে আমি নিজেও চিনি, অত্যন্ত ভদ্রলোক।

হলধর : (বেশ ক্রুদ্ধ) ভদ্রলোক! ভদ্রলোক! এই শহরের সব ভদ্রলোকবে আমার জানা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কারবার না করলেও আমার চলে যাবে।

ব্রজেশ : তুমি যা বলছ, ভেবে বলছ?

(হলধর কোন জবাব না দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

(ব্রজেশ রঞ্জনের দিকে তাকালেন, রঞ্জন কী একটা ইশারা করে ব্রজেশকে মানা করল, ব্রজেশ সেই মানা শুনলেন না, হলধরের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

ব্রজেশ : হলধর তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

হলধর : অবশ্যই।

(রঞ্জন হলধরের পেছন দিক থেকে হাত নেড়ে বাবাকে নিষেধ করল কোনো কিছু না বলতে। কাজল ব্রজেশ ও হলধরের মধ্যে বোকার মতো দাঁড়িয়ে।)

ব্রজেশ : কাজল, তুমি একটু ওপাশের ঘরে যাও তো।

কাজল : কিন্তু, ব্রজেশকাকা।

ব্রজেশ : যা বলছি, তাই করো। আর যাওয়ার সময় পার্টিশনের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো।

(কাজল অনিচ্ছার সঙ্গে পাশের ঘরে চলে যায় এবং যাওয়ার সময় একবার ব্রজেশের দিকে অনুনয়ভরা চোখে ঘুরে তাকিয়ে তারপর মধ্যের দরজাটা বন্ধ করে দিল।)

ব্রজেশ : (গলার স্বর নামিয়ে) আমি ছেলেমেয়েদের জানতে দিতে চাই না যে, আমি কতটা অসুস্থ।

হলধর : তা বটে, আজ কিছুদিন হল তোমাকে ভালো দেখছি না।

ব্রজেশ : আমার শরীর ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

হলধর : বসছ না কেন? (সামনের চেয়ারটার দিকে দেখিয়ে) ওখানে বসো। তারপর বলো কী ব্যাপার?

ব্রজেশ : দ্যাখো, এই রঞ্জনের বিষয়ে বলছিলাম। ওর যে কী হবে? রঞ্জন আর কাজলের বিয়েটাও সেরে ফেলতে চাই। কিন্তু তার আগে ওদের দুজনার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

হলধর : ওদের কথা ভাবছ কেন? আমার এখানে ও যতদিন ইচ্ছে কাজ করবে।

ব্রজেশ : কিন্তু রঞ্জন সেটা চাইছে না, সে বলছে এখানে আর থাকার মানে হয় না।

হলধর : কেন মানে থাকবে না? সে এখানে খুব ভালো কাজ করছে।

তবে হ্যাঁ, সে যদি বেশি টাকা চায়......

ব্রজেশ : না-না। টাকার কথা নয়। রঞ্জন টাকা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। রঞ্জন ভাবছে এবার তার নিজের থেকে কোন একটা উদ্যোগ নেওয়া উচিত, একটা স্বাধীন চেষ্টা আর কী।

হলধর : তোমার কি মনে হয় রঞ্জন পারবে, নিজে ব্যবসা চালানোর যোগ্য সে?

ব্রজেশ : সেটাই প্রশ্ন। আমিও ও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

হলধর : প্ল্যান করার ব্যাপারে রঞ্জনের মাথাটা খুব পরিষ্কার, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশিকিছু দরকার পড়ে আমাদের এই ব্যবসায়। তা ছাড়া রঞ্জনের তেমন অভিজ্ঞতাও কিছু হয়নি।

ব্রজেশ : অভিজ্ঞতার কথা বলছ? তোমার কী অভিজ্ঞতা ছিল, যখন তুমি আমার কাছে কাজ করতে এসেছিলে! কিন্তু তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছ, তোমার নাম হয়েছে, তুমি আমাকে, আমাদের মতো সকলকে ফেলে ওপরে উঠে গেছ।

হলধর : কিন্তু তুমি তো জানো ব্যাপারটা, ভাগ্য আমার সহায় হয়েছিল।

ব্রজেশ : ভাগ্যের কথা থাক হলধর। হ্যাঁ, এ কথা মানতে হবে, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তুমি একবার রঞ্জনের ভাগ্যটা যাচাই করতে দাও, ওকে একটা চান্স দাও। ওকে নিজে একটা কিছু করার সুযোগ দাও।

হলধর : তা আমাকে কী করতে হবে?

ব্রজেশ : তুমি তো নরেন্দ্রপুরে ওই ছেলেমেয়েদের বাড়িটা করতে চাইছ না, ওই বাড়িটা না হয় রঞ্জনকে করতে দাও।

হলধর : ও বাড়িটা আমি করতে চাই না? এ কথা তোমাকে কে বলল?

ব্রজেশ : এইমাত্র তুমিই তো বললে।

হলধর : কী কথার যে কী মানে করো তোমরা! আমার কথা থাক। ওই ছেলেময়ে দুটো কি রঞ্জনকে দিয়ে বাড়ি বানাতে রাজি হয়েছে?

ব্রজেশ : দ্যাখো ব্যাপারটা হল, ওরা রঞ্জনের অনেকদিনের বন্ধু। রঞ্জনের সুবাদেই ওরা এখানে এসেছে। ওদের কথামতো রঞ্জন ওদের বাড়ির প্ল্যানও করেছে।

হলধর : সেই প্ল্যান ওদের পছন্দ হয়েছে?

ব্রজেশ : তুমি যদি একবার প্ল্যানটা দেখে দাও। তোমার সম্মতি দাও।

হলধর ঃ তা হলে রঞ্জনের কিছু আয় হয়।

ব্রজেশ ঃ ওই ছেলেমেয়ে দু'টি কিন্তু প্ল্যানটা দেখে খুব খুশি হয়েছে। ওরা বলেছে, ও একেবারে আলাদা ধরনের প্ল্যান, বাড়ি তৈরির ব্যাপারে একেবারে নতুন আইডিয়া।

হলধর ঃ আলাদা ধরনের প্ল্যান? নতুন আইডিয়া। আমার মতো পুরোনো. বস্তাপচা নয়। তাই তো? আর সেই জন্যে তারা আমি না থাকলে আসে, রঞ্জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে।

ব্রজেশ ঃ না। এ কথা ঠিক নয়। ওরা তোমার কাছেই এসেছিল। তোমাকে না পেয়ে ভাবল তোমার হয়তো গরজ নেই।

হলধর ঃ না, আমার গরজ নেই।

ব্রজেশ ঃ তা হলে তুমি রঞ্জনের প্ল্যানটা যদি অ্যাপ্রুভ করে দাও।

হলধর ঃ তার মানে তোমার ছেলের জন্যে আমি কাজ ছেড়ে দেব। হলধর সান্যাল তরুণদের জন্যে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবে।

ব্রজেশ ঃ তুমি অবসর নিতে যাবে কেন? তোমার কত কাজ আছে।

হলধর ঃ তা আছে, এবং থাকবে। শোনো ব্রজেশ. আমি অবসর নিচ্ছি না, অবসর নেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আর কোনো কাজও আমি ছেড়ে দিচ্ছি না।

ব্রজেশ ঃ (কষ্ট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে) দ্যাখো আমি মরতে বসেছি। মরার আগে দেখে যেতে চাইছিলাম রঞ্জন কিছু একটা করছে।

হলধর ঃ (পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) এখন আর কোনো কথা নয়। এবার এসো।

ব্রজেশ ঃ (করুণভাবে) একটা কথার উত্তর আজ তোমাকে দিতে হবে। আমাকে কী এই রকম খারাপ অবস্থায় মরতে হবে? তুমি কি তাই চাও?

হলধর ঃ (শক্ত গলায়) যতটা ভালোভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া যায়, সেটাই ভালো।

ব্রজেশ ঃ ঠিক আছে, তাই হোক।

হলধর ঃ (একটু অধীর হয়ে ব্রজেশের পিছু-পিছু গিয়ে) তুমি কেন বুঝতে পারছ না যে, এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। আমি সারাজীবন এই ভাবেই চলেছি, তাই চলব। তাই। (তারপর

পার্টিশনের দরজাটা খুলে রঞ্জনকে উদ্দেশ করে) রঞ্জন, তুমি বরং তোমার বাবাকে নিয়ে বাড়ি যাও।

(রঞ্জন এবং কাজল বাইরের ঘরে এল।)

রঞ্জন : কি হয়েছে বাবা?

ব্রজেশ : তুমি আমার হাতটা একটু ধরো।

রঞ্জন : আমি তোমাকে ধরছি। কাজল, তুমিও চলো।

হলধর : না, কাজলের একটু কাজ আছে, আমার একটা দরকারি চিঠির ডিকটেশন নিতে হবে।

(ব্রজেশ ও রঞ্জন বেরিয়ে গেল। কাজল নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। হলধর টেবিলের ওপর ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়ালেন।)

কাজল : চিঠি ডিকটেশন দেবেন বললেন।

হলধর : কোনো চিঠি নেই।

কাজল : তা হলে?

হলধর : কাজল, আমার মনে হচ্ছে ব্রজেশ আর রঞ্জন হয়তো আমার এখানে আর আসবে না। তুমি কী করতে চাও।

কাজল : আমি তোমার কাছে থাকব।

হলধর : কিন্তু রঞ্জন যদি নিজের ব্যবসা শুরু করে, তার তোমাকে দরকার পড়বে।

কাজল : আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। অসম্ভব।

হলধর : তা হলে তুমি রঞ্জনকে বোঝাও ব্যবসার বুদ্ধি ছাড়তে আর এখানকার কাজটা না ছাড়তে। তখন তোমার এখানে থাকা অসুবিধে হবে না।

কাজল : কী যে করি?

হলধর : (কাজলের মাথার চুলে আলতো করে বিলি কাটতে কাটতে) আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে কাজল।

(হলধর কাজলের চুলে চুমু খেলেন।)

কাজল : (চেয়ারে বসেই দুহাত দিয়ে হলধরের কোমরে হাত জড়িয়ে) আমিও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

হলধর : কাজল, ছাড়ো ছাড়ো। বাইরে কে যেন আসছে।

(বাইরে থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। হলধর একটু সরে

দাঁড়ালেন, কাজলও ঠিকঠাকভাবে চেয়ারে বসল, ওড়নাটা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে নিল। ঘরের মধ্যে শ্রীমতী অলি সান্যাল প্রবেশ করলেন। তিনি বাড়ির মধ্যে থেকে এলেন। শ্রীমতী সান্যালের অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, তবে একদা রূপসী ছিলেন সেটা বোঝা যায়। পরনে হালকা রঙিন টাঙ্গাইল শাড়ি, ছিমছামে হাবভাব)

অলি : (দরজার ওপাশ থেকে) মিঃ সান্যাল এখানে নাকি?

হলধর : কে অলি? এসো, এসো ভেতরে এসো।

অলি : (ঘরের মধ্যে ঢুকে, একবার কাজলের দিকে তাকিয়ে) আমি নিশ্চয় তোমাদের বিরক্ত করলাম না!

হলধর : না, না। তা নয়। আমি কাজলকে একটা ছোট ডিকটেশন দিতে যাচ্ছিলাম।

অলি : ও।

হলধর : তুমি কিছু বলতে এসেছিলে?

অলি : ডাক্তার হরিদয়াল অনেকক্ষণ হল এসেছেন, ড্রইংরুমে বসে আছেন, তুমি একটু আসবে না?

হলধর : (সচকিতভাবে) ডাক্তার কি আমাকে কিছু বলতে চায়?

অলি : না, তেমন কিছু নয়। আসলে ডাক্তার আমাকে দেখতে এসেছিলেন, যাওয়ার সময়ে বললেন, মিঃ সান্যাল যদি থাকেন, তাঁকেও একটু হ্যালো বলে যেতাম। আমি তাই ড্রইংরুমে ওঁকে বসিয়েছি।

হলধর : একটু বসতে বলো ডাক্তারকে। আমি এখনই আসছি।

অলি : (ঘর থেকে বেরুনোর মুখে) তা হলে তুমি এখনই আসছ। (তারপর আরেকবার কাজলকে ভালো করে দেখে নিয়ে) সত্যি আসছ তো?

হলধর : (হাসিমুখ করে) আসছি, আসছি।

(অলি সান্যাল আলগোছে দরজা ভেজিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ।)

কাজল : আমার ভয় হচ্ছে, মিসেস সান্যাল কিছু সন্দেহ করছেন।

হলধর : খুব সামান্য ব্যাপার। এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে যেয়ো না। তবে এবার তুমি যাও।

কাজল : হ্যাঁ, এবার আমার যাওয়া উচিত।
(কাজল জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।)

হলধর : আগের কথাটা ভুলে যেয়ো না। যেভাবে পার রঞ্জনকে রাজি করাও এখানকার কাজটা না ছাড়তে। সেটা তোমার আমার দুজনের পক্ষেই জরুরি।

কাজল : কী করা যাবে আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

হলধর : কিন্তু-রঞ্জন না থাকলে, তোমাকে দিয়ে আমি কী করব?

কাজল : (হলধরের কথা শুনে খুব বিচলিত হয়ে) মানে? আমি কেউ না? রঞ্জনের জন্যে আমি?
(হলধর নিজের বোকামিটা সামলানোর চেষ্টা করলেন, চেষ্টাকৃতভাবে একটু নরম হওয়ার চেষ্টা করলেন।)

হলধর : (কণ্ঠস্বরে একটা নরম ভাব এনে) কী আবোলতাবোল বকছো কাজল, তোমার জন্যেই আমার রঞ্জনকে দরকার। না হলে রঞ্জন কে? সবকিছু তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে।
(কাজল ধীরে ধীরে অফিস ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ হলধর দরজার মুখে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।)

হলধর : আচ্ছা ওই নতুন ছেলেমেয়ে দুটির নরেন্দ্রপুরের বাড়িটার যে ড্রইংটা রঞ্জন করেছে, সেটা কি তোমার কাছে রয়েছে?

কাজল : রঞ্জন সেগুলো আমার কাছেই দিয়েছে।

হলধর : তুমি আমাকে দিয়ে যাও তো, আমি একটু দেখি।

কাজল : রঞ্জন খুব খুশি হবে, তুমি একবার দেখে দিলে।
(দরজায় মৃদু করাঘাত। অলি সান্যালের গলা।)

অলি : ভেতরে আসতে পারি।
(কাজল এগিয়ে গিয়ে দরজা টেনে দিল। অলি সান্যাল ও হরিদয়াল ডাক্তার ঢুকলেন।)
কাজল ও অলি মুখোমুখি। একপাশে হরিদয়াল ডাক্তার। পেছনে হলধর সান্যাল।)

অলি : কাজল, তোমার চিঠি তৈরি হয়ে গেছে।

কাজল : চিঠি?

হলধর : হয়ে গেছে। ছোটো একটা চিঠি।

অলি : খুবই ছোটো চিঠি মনে হচ্ছে।

হলধর : কাজল, যাও আজ তোমার ছুটি। কাল ঠিক সময়ে এসো।

কাজল : যাই। (বেরিয়ে গেল)

অলি : তুমি সত্যিই খুব ভাগ্যবান; কেমন সুন্দর টুকটুকে একটা মেয়ে পেয়ে গেছ।

হলধর : খুব কাজের মেয়ে।

অলি : তাই মনে হচ্ছে।

হরিদয়াল : (এতক্ষণ একটু পেছনে ছিলেন, এবার একটু এগিয়ে এসেছেন) মেয়েটি অফিসের কাজকর্ম বোঝে?

হলধর : অল্পদিনে খুব ভালো শিখে নিয়েছে।

অলি : খুব সুসংবাদ।

হরিদয়াল : আমার একজন রোগী দেখার আছে।

অলি : আপনি তাকে দেখে আসুন। তারপর আমাদের সঙ্গে চা খাবেন। (ভেতরে চলে গেলেন)

হলধর : ডাক্তার, আপনার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে?

হরিদয়াল : না। তেমন কিছু নয়।

হলধর : তা হলে এখানে একটু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

(দুজনে দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসলেন)

হলধর : ডাক্তার, অলিকে কেমন দেখছেন। কিছু অস্বাভাবিক দেখছেন?

হরিদয়াল : অস্বাভাবিক?

হলধর : আমার সঙ্গে কথাবার্তায়, ব্যবহারে?

হরিদয়াল : দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমার কেমন মনে হল ওই কাজল মেয়েটাকে মিসেস সান্যাল স্ট্যাণ্ড করতে পারেন না।

হলধর : কিন্তু কী করা যাবে!

হরিদয়াল : কাজলের জায়গায় অন্য কাউকে রাখতে পারেন না? কোনো ভালো ছেলে.....

হলধর : অসম্ভব, কাজলকে ছাড়া চলবে না। আমি কারও জন্যে, কোনো কারণে কাজলকে ছাড়ব না।

হরিদয়াল : তা হলে? (একটু ইতস্তত করে) আচ্ছা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করব?

হলধর : বাধা কোথায়?

হরিদয়াল : মিসেস সান্যাল যে কাজলকে পছন্দ করেন না, তার কি কোনো কারণ আছে?

হলধর : না, কোনো কারণ নেই? অলির চিরদিন সন্দেহবাতিক।

হরিদয়াল : কিন্তু শহরসুদ্ধ লোক জানে মহিলা সম্পর্কে আপনার দুর্বলতা। অনেক মহিলার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতার কথাও শুনেছি।

হলধর : অস্বীকার করছি না। কিন্তু কাজলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তার বিষয়ে, আমার কোনো দুর্বলতা নেই।

হরিদয়াল : কিন্তু কাজলের তো দুর্বলতা থাকতে পারে। সেটা হয়তো অলি দেবী....

হলধর : অলির কথা এখন থাক। আমি আপনাকে একটা অদ্ভুত গল্প বলি। আপনার শুনতে ইচ্ছে করছে?

হরিদয়াল : অদ্ভুত গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

হলধর : আপনি তো জানেন, ব্রজেশ নিয়োগীর ব্যবসা ফেল হয়ে যাওয়ার পরে আমি নিয়ে নেই। ব্রজেশ আর তার ছেলে রঞ্জনকে আমার কাছেই চাকরিতে রেখে দিই। দুজনেই আমার অ্যাসেট, ব্রজেশের মতো ভালো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বেশি নেই। রঞ্জনেরও মাথা খুব পরিষ্কার। প্ল্যান, ড্রইং, একদম নিখুঁত। খুব কাজের ছেলে।

কিন্তু রঞ্জনের মাথায় ভূত চেপেছে, নিজে ব্যবসা করবে। বিয়ে করবে। বুড়োও তাতে তাল দিচ্ছে। রঞ্জনও তাতে মেতে উঠেছে।

বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ছুটির একটু আগে কাজল আসত। দুজনে মিলে বেরিয়ে যেত। কাজল এলেই রঞ্জনের চেহারা পালটিয়ে যেত, প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাওয়া যাকে বলে তাই।

তখন আমি ভাবলাম কাজলকেও যদি এখানে কাজ দেই, রঞ্জনকে আটকিয়ে রাখা যাবে এখানেই।

হরিদয়াল : সে তো ঠিকই।

হলধর : দাঁড়ান, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। আমি বুদ্ধি করে কাজলের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হলাম। এই দু-চারটে মিষ্টি কথা, রঞ্জন না থাকলে যদি কাজল এলো, তার একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ানো।

হরিদয়াল : (হেসে) আপনি তো এ সব ব্যাপারে এক্সপার্ট।

হলধর : তা বলতে পারেন। সে যা হোক, একদিন কাজলকে একলা পেয়ে বললাম, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তুমি এখানে কাজ করবে? কাজল এককথায় রাজি হয়ে গেল। বাড়ির অবস্থাও হয়তো ভালো নয়, বিয়ের কথাও ভাবছে, একটা কাজ দরকারও ছিল। কাজলকে নিয়ে দেখলাম ঠকিনি। ভালো, বুদ্ধিমতী মেয়ে, মন দিয়ে কাজ করে।

হরিদয়াল : কাজল হয়তো কাজটা নিয়েছিল রঞ্জনের কাছে সব সময় থাকতে পারবে বলে।

হলধর : সেটাও নিশ্চয় একটা কারণ। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পরে ও ক্রমশ রঞ্জনের কাছ থেকে দূরে সরতে লাগল।

হরিদয়াল : আপনার দিকে এগোতে লাগল?

হলধর : ঠিক তাই। আমি অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ করলাম, আমাকে দেখলেই কাজল চঞ্চল হয়ে ওঠে। জামা কাপড় ঠিক করে। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এমন কী, আমি ওর সামনে না থাকলেও যদি ঘরের মধ্যে পেছন দিকে থাকি, কেমন ছটফট করতে থাকে।

কিন্তু ডাক্তার, আপনাকে আমি বলছি, আমি কিন্তু কাজলের জন্য কোনো আকর্ষণ বোধ করি না। আগে মনের না হলেও শরীরের একটা খাই খাই ভাব ছিল, এখন সেটাও নেই। আমি বোকা মেয়েটাকে বোঝাই কী করে যে রঞ্জনকে রাখার জন্যেই তোমাকে আমি রেখেছি। দু-চারটে মিষ্টি কথা, একটু সোহাগ— সে সবই অভিনয়।

হরিদয়াল : আপনার স্ত্রীকে, মিসেস সান্যালকে কথাটা বুঝিয়ে বলেছেন?

হলধর : না। অলিকে এ সব কথা বলা যাবে না। তা ছাড়া আমি তাকে সারা জীবন ধরে অনেক ঠকিয়েছি। একবার অন্তত ভুল সন্দেহ করুক আমাকে।

(হরিদয়াল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন। হলধর তাঁকে থামালেন)

হলধর : আচ্ছা ডাক্তার, অলি কি আপনাকে বলেছে যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

হরিদয়াল : না তো?

হলধর : আপনি কি অলিকে বলেছেন যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হরিদয়াল ঃ তা বলব কেন?

হলধর ঃ (একটু চুপ করে থেকে) ডাক্তার, আপনার মনে আছে আমার আরম্ভের কথাটা।

হরিদয়াল ঃ তা মনে থাকবে না কেন? আপনি আমার প্রথম পেসেন্টদের একজন। তখন আপনি বেলেঘাটার মুখে একটা বাড়ির একতলায় থাকতেন। মোড়ের কাছেই একটা কাঠ গোলা ছিল। একদিন অনেক রাতে সেই গোলাটায় আগুন লাগল।

হলধর ঃ তখন সল্ট লেকের এ পাশটা প্রায় ফাঁকা। স্টেডিয়ামটা হয়নি। আগুনের আলোয় চারদিক জ্যোৎস্নার চেয়েও বেশি হলুদ।

হরিদয়াল ঃ সতেরো-আঠারো বছরের বেশি হয়ে গেল। আপনি সেই কাঠগোলার পোড়ো জমিটায় একটা পাঁচতলা বাড়ি তুললেন, কুড়িটা ফ্ল্যাট, এদিকে সেটাই প্রথম পাঁচতলা বাড়ি।

হলধর ঃ এখন তো রাম-শ্যাম যে কেউ দশ-বিশতলা বাড়ি বানাচ্ছে।

হরিদয়াল ঃ আমার মনে আছে, তখন সবে প্র্যাকটিশ শুরু করেছি, জগদম্বা মেডিকেল স্টোরে বসি। চেম্বারে যাওয়া-আসার পথে দেখতাম রোদ-বৃষ্টিতে একটা শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছেন। কখনও নকশা মেলাচ্ছেন, কখনও ফিতে দিয়ে মাপজোক করছেন। শেষে তো একদিন আপনার সানস্ট্রোক হয়ে গেল।

হলধর ঃ অলি আপনাকে পাড়ার মধ্যে দেখে কল দিয়েছিল। তখন বড়ো ডাক্তার দেখানোর সঙ্গতি আমাদের ছিল না।

হরিদয়াল ঃ কিন্তু এখন আমি বড়ো ডাক্তার।

হলধর ঃ সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

হরিদয়াল ঃ (হাসতে হাসতে) এবার যেতে হয়। মিসেস সান্যালকে বলেছি রাতে খেতে আসব।

(হরিদয়াল বাইরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন।)

(দৃশ্যান্তর)

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ

হলধর বিল্ডার্সের অফিসঘর।

ডাক্তার হরিদয়াল চলে যাওয়ার পর হলধর সান্যাল একা একা বসে আছেন।

প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে আলো কমে এসেছে। বাইরে একটা গাছতলায় শালিকেরা দিনশেষের চেঁচামেচি শুরু করেছে।

বাইরের দরজা বন্ধ করার জন্য অথবা সুইচ টিপে আলো জ্বালাবার জন্য হলধর উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় বাইরের দরজায় খুটখুট শব্দ।

হলধর : (গলার স্বর একটু উঁচু করে) ভেতরে আসুন।

(একটি তরুণী দরজার ভেতর দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দেখল। ঘরের মধ্যে হলধর সান্যালকে দেখে তরুণীটির চোখ-মুখ ঝলমল করে উঠল, সে ঘরে ঢুকে এল। ঘরে ঢুকে হলধরের দিকে তাকিয়ে বলল) চিনতে পারছেন না? আমি অঙ্গ না, অঙ্গনা বসুরায়। কৃষ্ণনগর থেকে আসছি।

(ঘরে ঢুকলে দেখা গেল মেয়েটি বেশ সুন্দরী। দোহারা চেহারা। মুখে একটা সারল্যের ভাব আছে। পরনে জিনস এবং স্ট্রাইপ শার্ট। হাতে একটা ঝোলা ব্যাগ।)

(হলধর তরুণীটিকে বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।)

অঙ্গনা : চিনতে পারলেন না?

হলধর : কি নাম যেন বললে?

অঙ্গনা : অঙ্গনা। অঙ্গনা বসুরায়।

হলধর : (একটু চিন্তা করে) কৃষ্ণনগর থেকে আসছ? তুমি কি কৃষ্ণনগরের ডাক্তার জয়ন্ত বসুরায়ের মেয়ে?

অঙ্গনা : (হেসে উঠল) অবশ্যই। আপনি আমাকে কার মেয়ে ভেবোছলেন?

হলধর : হ্যাঁ, তোমাকে চিনতে পারছি। তোমাকে সে বছর কৃষ্ণনগর মহারানী বালিকা বিদ্যালয় উদ্বোধনের সময় দেখেছিলাম। সে তো অনেকদিন আগে, সাত-আট বছর হবে। তখন তুমি কত ছোটো ছিলে, একেবারে বাচ্চা মেয়ে।

অঙ্গনা : (খুশি হয়ে) তা হলে চিনতে পেরেছেন।

হলধর : (অঙ্গনার হাতের ঝোলাব্যাগের দিকে তাকিয়ে) কলকাতায় কোথায় উঠেছ?

অঙ্গনা : কোথায় আর উঠব। স্টেশনে নেমে এখানেই সরাসরি চলে এলাম।

হলধর : কলকাতায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় কেউ নেই?

অঙ্গনা : আপনারাই তো আছেন। আপনি আছেন, বৌদি আছেন।

হলধর : বৌদি?

অঙ্গনা : মিসেস সান্যাল বাড়িতে নেই?

হলধর : বাড়ির মধ্যে আছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।

অঙ্গনা : বৌদি গতবার রাসের সময় কৃষ্ণনগর গেলেন না। ওঁর সঙ্গে গাড়িতে করে মায়াপুর গেলাম, নবদ্বীপ গেলাম। একবার বাংলাদেশের বর্ডার থেকেও ঘুরে এলাম। বৌদি আমাকে বলে এসেছিলেন, কলকাতায় এলে এখানে এসে উঠতে। আজকের রাতটা এখানে থাকা যাবে না?

হলধর : সেটা খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু তোমার কথা তো অলি আমাকে কখনও বলেছে বলে মনে হচ্ছে না।

(হলধর এগিয়ে গিয়ে ভেতরের দরজার দিকে মুখ করে ডাকলেন) অলি, এদিকে একটু এসো।

অলি : (ভেতরের দরজার সামনে এসে) কি ব্যাপার? ডাকাডাকি কিসের? (এই সময় অঙ্গনার দিকে চোখ পড়তে) ও মা, অঙ্গনা, তুমি? তাহলে সত্যি তুমি কলকাতায় এলে।

হলধর : অঙ্গনা কিন্তু রাতে থাকবে।

অলি : সে অসুবিধে হবে না। আমি ওর জন্যে একটা ঘর গুছিয়ে দিচ্ছি।

(অলি বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।)

অঙ্গনা : বৌদি, আমার সঙ্গে কিন্তু বাড়তি জামাকাপড় কিছু নেই।

অলি : (ভেতর থেকে) সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি ওখানে একটু বসো।

(অলি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হলধরের সামনে বসল।

হলধর : তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে?

অঙ্গনা : একদম ক্লান্ত নই। তবে শুয়ে থাকতে ভালোবাসি। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে খুব ভালো লাগে।

হলধর : স্বপ্ন দ্যাখো? সারারাত স্বপ্ন দ্যাখো?

অঙ্গনা : খুব স্বপ্ন দেখি।

হলধর : কি স্বপ্ন দ্যাখো?

অঙ্গনা : সে সব আপনাকে বলতে পারব না। (উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারদিকের জিনিসপত্র দেখতে লাগল। অবশেষে কাজলের

টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।)

হলধর : তুমি কি কিছু খুঁজছ?

অঙ্গনা : না, তা কিছু নয়। এই এমনি দেখছিলাম। (কাজলের টেবিলে মোটা লেজার খাতাটায় হাত দিয়ে) আচ্ছা, এই মোটা খাতাটায় আপনি লেখালেখি করেন?

হলধর : আমি করি না। আমার অফিসের অ্যাকাউনট্যাণ্ট আছেন। তিনি এই খাতায় হিসাব রাখেন।

অঙ্গনা : অ্যাকাউনট্যাণ্ট? ছেলে না মেয়ে?

হলধর : (হেসে) মেয়ে।

অঙ্গনা : বিয়েওলা মেয়ে?

হলধর : না বিয়ে হয়নি। কিন্তু হয়তো শিগগিরই বিয়ে হয়ে যাবে।

অঙ্গনা : খুব ভালো খবর।

হলধর : কিন্তু আমাকে আবার একটা নতুন কাজের লোক খুঁজতে হবে। (কিছুক্ষণ অঙ্গনার দিকে তাকিয়ে) তখন তুমি এখানে কাজ করবে? লেজার খাতায় হিসেব তুলতে, টাইপ মেশিনে টুকটুক করে টাইপ করতে তোমার কেমন লাগবে?

অঙ্গনা : আমি ওসব কিছু করতে চাই না। (হলধরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ চাহনি মেলে) আমার এর চেয়ে অনেক ভালো কাজ আছে।

(বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। অঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে দেয়াল সুইচ টিপে দুটো আলো জ্বালল)

(হলধর চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে বসেছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসলেন)

হলধর : তোমার বাবা কেমন আছেন?

অঙ্গনা : ভালো। তাঁর বয়সের পক্ষে বেশ ভালো।

হলধর : তুমি কলকাতায় কদিন থাকবে?

অঙ্গনা : বলা কঠিন। ভেবে দেখতে হবে। কোথায় কেমন লাগে কী জানি। (পা ছড়িয়ে সোফায় বসে হলধরের দিকে তাকিয়ে হাসল, বড় মোহময়ী সেই হাসি। তারপর হলধরের দিকে তাকিয়ে) আপনার কিছুই মনে নেই।

হলধর : কি মনে থাকবে?

অঙ্গনা : কৃষ্ণনগরের কথা।

হলধর : কৃষ্ণনগর? কি হয়েছিল?

অঙ্গনা : (রীতিমতো আহত কণ্ঠে) আপনি চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করছেন, কৃষ্ণনগর; জানতে চাইছেন, কী হয়েছিল।

হলধর : আমাকে একটু মনে করিয়ে দাও। শুধু শুধু দোষ ধরতে যেয়ো না।

(অঙ্গনা একটু নরম হল। জিনসের হিপ পকেট থেকে একটা চিরুনি বার করে নিজের ঘন কালো কেশদাম আঁচড়াতে আঁচড়াতে হলধরের খুব কাছে এগিয়ে এল।)

অঙ্গনা : মনে আছে মহারানি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়?

হলধর : মেয়েদের ওই স্কুলটাতো অনেকদিনের পুরোনো। ওর শতবার্ষিকী ভবনটা আমরা তৈরি করেছিলাম। বাড়িটা তৈরির সময় প্রায় দৈনিকই ছুটতে হত কৃষ্ণনগরে। খুব খাটতে হয়েছিল।

অঙ্গনা : চারতলা বাড়ির ছাদে একটা শ্বেতপাথরের গোল গম্বুজ। সেই উদ্বোধনের দিন ভোরবেলা, ফাল্গুনের সকাল, ঝলমলে রোদ উঠেছে, স্কুল কম্পাউণ্ডের পাশে মেয়েদের বোর্ডিংয়ের বাগানে আমগাছগুলোয় মুকুল এসেছে, সকালবেলায় ঠাণ্ডা বাতাসে থিরথির করে কাঁপছে আমের মুকুলের গন্ধ।

হলধর : আশ্চর্য, তোমার এত মনে আছে?

অঙ্গনা : প্রিয়লতা দেবী সোনালি জরির ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। ইস্কুলের মাঠ, বোর্ডিংয়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য।

হলধর : অধিকাংশই মহিলা।

অঙ্গনা : কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা। কত যুগের ছাত্রী সব। ফিতে কাটা শেষ হতেই হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা হইহই রব উঠল। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছিল, উলু দিচ্ছিল, আমিও ছিলাম সেই দলে, হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে সবাই থেমে গেল। সব চুপ হয়ে গেল।

হলধর : হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল?

অঙ্গনা : মনে নেই আপনার? সেই সকালে আপনার গায়ে একটা সাদা হাফশার্ট আর লাল সোয়েটার। শ্বেতপাথরের ধবধবে গম্বুজে ঝলমল করছে সাদা রোদ, আপনি সেই গম্বুজ বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছিল যেন সাঁতরিয়ে যাচ্ছেন, সব লোক

অবাক হয়ে দেখছে, ভয়ে আমার তো বুক কাঁপছিল।

হলধর : (সম্মোহিতের মতো) তারপর?

অঙ্গনা : আপনার পা কাঁপছে না, মাথা ঘুরছে না। আপনি তরতর করে গম্বুজ বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে গম্বুজের মাথায় উঠে গেলেন আপনি, পকেট থেকে বার করলেন সবুজ পতাকা, তার মধ্যে সোনার হরফে লেখা ১০০, আপনি গম্বুজের চূড়ায় সেই পতাকাটা পরিয়ে দিলেন। হাওয়ায় সেটা ঢেউ তুলে তুলে উড়তে লাগল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে।

হলধর : তারপর?

অঙ্গনা : চারদিকে লোকেরা কী হাততালি। আমরা আপনার জন্যই আবার শাঁখ বাজালাম, উলু দিলাম।

হলধর : আসলে ব্যাপারটা কী জান, তোমাদের ওই শতবার্ষিকী ভবন, ওটা আবার ছিল আমার তৈরি একশো নম্বর বাড়ি। তাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। তখন বয়েসও কম ছিল। (হলধর উঠে এসে অঙ্গনার খুব কাছে দাঁড়ালেন।)

অঙ্গনা : (খুশি হয়ে হাসতে হাসতে) এর চেয়ে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

হলধর : সেদিন সন্ধ্যাবেলা?

অঙ্গনা : হ্যাঁ, মনে নেই আপনার? সেদিন আপনি থেকে গেলেন। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান ছিল স্কুলে। সেখান থেকে বাবার সঙ্গে আপনি আমাদের বাড়িতে এলেন।

হলধর : তোমার বাবা তো স্কুল কমিটির সভাপতি ছিলেন।

অঙ্গনা : বাবার কথা থাক, আমার কথা বলুন।

হলধর : তোমার আবার কি কথা?

অঙ্গনা : আশ্চর্য! কিছুই মনে নেই?

হলধর : একটু আবছা আবছা যেন মনে পড়ছে।

অঙ্গনা : (আহত কণ্ঠে) আবছা-আবছা? (তারপর অনেকক্ষণ থেমে থেকে) তারিখটা কী করে মিলে গিয়েছিল, সেদিন আবার ছিল আমার জন্মদিন। রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা আপনাকে সে কথা বলতে আপনি আমাকে বললেন, জন্মদিনের উপহার কি দিতে হবে?

হলধর : দিয়েছিলাম নাকি কোনো উপহার?

অঙ্গনা : না দেননি। দেবেন বলেছিলেন। সেই উপহার নিতেই আমি আজ এসেছি।

হলধর : কি উপহার দেব বলেছিলাম?

অঙ্গনা : সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আপনি আমাদের দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। বারান্দার পাশে বুড়ো জামগাছের পাতার আড়ালে চাঁদ উঠেছে। ঝিরিঝিরি জ্যোৎস্না আর হাওয়া। দূরে কোথাও বোধ হয় ঘোষালদের আমবাগানে দুটো কোকিল ডাকছে।

হলধর : কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

অঙ্গনা : না। স্বপ্ন নয়। আমি বারান্দায় আপনাকে গুডনাইট বলতে এলাম, শুতে যাওয়ার আগে। আপনি আমাকে ইজিচেয়ারের হাতলে বসতে বললেন।

হলধর : লাল ফিতে দিয়ে তোমার ডবল বিনুনি বাঁধা। অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক।

অঙ্গনা : সেই ফ্রকটার গলায় লেসের কাজ ছিল। আপনি তার ওপরে আঙুল বোলাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার ঠোঁটে আলগা করে একটু চুমু খেলেন, তারপর বললে, 'রাজকন্যা, কী উপহার চাই তা তো বললেন না।' আমি আপনার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমাকে একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দাও।'

হলধর : রাজপ্রাসাদ?

অঙ্গনা : আমি বলেছিলাম, 'আমার জন্যে একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দাও। সেই প্রাসাদে শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি থাকব। তুমি আমার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র।'

হলধর : আমি কী বলেছিলাম।

অঙ্গনা : আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার বয়েস কত হল। আমি বলেছিলাম, বারো। আপনি বলেছিলেন, ছ'বছর পরে যেদিন তোমার আঠারো বছর পূর্ণ হবে, আমার কাছে যেয়ো।

(অবাক হয়ে হলধর অঙ্গনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।)

অঙ্গনা : (হলধরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে) আজ, আজই আমার আঠার আমারো বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই আমি ছুটে এসেছি।

(বাড়ির ভেতর থেকে অলির গলার স্বর শোনা গেল।

অলি ঃ অঙ্গনা, অঙ্গনা, (ঘরের মধ্যে এলেন। তখন অঙ্গনা হলধরের কাছ থেকে একটু সরে গেছে।) অঙ্গনা, তোমার শোয়ার ঘর, জামা-কাপড়ের বন্দোবস্ত হয়েছে। তুমি শাড়ি পর তো? যাও ভেতরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, জামাকাপড় ছেড়ে রেডি হয়ে নাও। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

(বাইরের দরজা দিয়ে হরিদয়ালের প্রবেশ।)

হরিদয়াল ঃ আমি ঠিক খাওয়ার সময়ে এসে গেছি। আমার রোগী দেখা আজকের মতো শেষ।

(অলির সঙ্গে হরিদয়ালও বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। যাওয়ার সময়ে অঙ্গনার দিকে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হলধরের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে আরও একটু হাসলেন, তারপর বললেন)

হরিদয়াল ঃ সান্যাল সাহেব দেরি করবেন না। আমাকে আবার বাড়ি ফিরতে হবে।

(একটু পরে অঙ্গনাও ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। হলধরও একটু বাদে ভেতরে চলে গেলেন।

পাশের কোনো বাড়িতে টিভিতে চিত্রহার বা ওই জাতীয় কোন সিনেমার গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। রোজা সিনেমার 'ছোটি সি আশা' গানের কথা ও সুর ভেসে আসছে।)

যবনিকা পতন

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

সকালবেলা। প্রায় ন'টা বাজে।

হলধরের বাড়ির ভেতরের ড্রইংরুম। সুন্দরভাবে সাজান। সোফা সেট, কাচের টেবিল। টেবিলে চিনেমাটির ফুলদানিতে একগুচ্ছ গোলাপ। ওপাশে বুককেস। ঘরের সেই পাশে জানলার ধারে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার । চেয়ারে বসে হলধর খুব মনোযোগ দিয়ে রঞ্জনের আঁকা নকশা দেখছিলেন।

জানলার ওপাশে বারান্দা। বারান্দায় ফুলের টব দেখা যাচ্ছে। মরসুমি ফুল। ফুলের গাছগুলোয় একটা পেতলের ঝারি থেকে জল দিচ্ছেন অলি। তাঁর গায়ে একটা পাতলা র‍্যাপার জড়ানো।

হলধরের পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। সামনের টেবিলে একটা খালি চায়ের পেয়ালা।

পায়ের শব্দ শুনে হলধর নকশা থেকে মুখ তুলে তাকালেন। কাজল ঘরে ঢুকল।

হলধর : ও তুমি।

কাজল : আমি এসে গেছি, সেটাই আপনাকে বলতে এলাম।

হলধর : রঞ্জন?

কাজল : রঞ্জন এখনও আসেনি। আমি ওদের বাসা হয়ে এলাম। ও ডাক্তারের কাছে গেছে।

হলধর : ব্রজেশ কেমন আছে?

কাজল : ভালো নেই। আপনাকে বলতে বলেছেন আজ আসতে পারবেন না।

হলধর : কোনো দরকার নেই। দু-একদিন বিশ্রাম নিক।

কাজল : (বাইরের ঘরের দিকে যেতে যেতে) রঞ্জন এলে আমি ওকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলব।

হলধর : কোনো দরকার নেই।

(কাজল চলে গেল। হলধর আবার মন দিয়ে নকশা দেখতে লাগলেন।)

অলি : (বারান্দার ওপাশে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে) আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, ব্রজেশবাবু আর বাঁচবেন না।

হলধর : অলি তুমি আজ বাইরে হাঁটতে যাওনি।

অলি : দেরি করে ঘুম থেকে উঠলাম তাই আর যাওয়া হল না।

হলধর : অঙ্গনা কি এখনও শুয়ে আছে?

অলি : তুমি তা হলে এখন অঙ্গনার কথা ভাবছ?

হলধর : না তা নয়। হঠাৎ খেয়াল হল।

অলি : অঙ্গনা সেই কোন্ সকালে উঠেছে। একটু আগে দেখলাম নিজের ঘর গুছোচ্ছে।

হলধর : আমাদের একটা ঘর তবু কাজে লাগল। এত বড়ো বাড়িটা এত খালি লাগে।

অলি : সত্যি বড়ো খালি খালি লাগে।

হলধর : দেখ এখন থেকে আর অতটা শূন্য লাগবে না।

অলি : এখন থেকে?

হলধর ঃ হ্যাঁ।

অলি ঃ অঙ্গনা এসেছে বলে?

(হলধর চুপ করে রইলেন। অলি বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে এলেন।)

হলধর ঃ (ক্লান্তভাবে) আচ্ছা অলি, একটা অসুস্থ মানুষের জন্য তোমার কোনো মায়াদয়া হয় না।

অলি ঃ কে অসুস্থ? তুমি?

হলধর ঃ আমি পাগল, আমার মাথা খারাপ, এটা অসুখ নয়?

(অলি অন্যমনস্কভাবে একটা সোফায় বসে পড়লেন।)

অলি ঃ কি বলছ?

হলধর ঃ আমি বলছি না। তোমরা বলছ। তুমি আর ডাক্তার। তোমরা তো ঠিক করেই ফেলেছ যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

(হলধর ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে থাকেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হলধরকে দেখেন অলি। হলধর অলির সামনে এসে দাঁড়ালেন।)

হলধর ঃ অলি, বিশ্বাস কর, আমার মাথার কোনো গোলমাল হয়নি।

অলি ঃ তুমি তা হলে সারা দিনরাত থম মেরে বসে থাকো কেন? এত কি ভাবো?

হলধর ঃ আমার বহু দেনা আছে। অনেক ঋণ।

অলি ঃ তোমার কারও কাছে কোনো দেনা নেই।

হলধর ঃ তোমার কাছে আমার বহু দেনা অলি। তোমার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই।

(এই সময়ে অঙ্গনা বাইরে থেকে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা ছাপা শাড়ি, নাইটির ওপরে এলোমেলো করে জড়ানো। কপালের চুল উস্কোখুস্কো।

অঙ্গনা ঃ গুড মর্নিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

হলধর ঃ (হেসে) গুড মর্নিং। ভালো ঘুম হয়েছিল।

অঙ্গনা ঃ খুব ভালো ঘুমিয়েছি।

হলধর ঃ কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে?

অঙ্গনা ঃ দেখলাম। কিন্তু স্বপ্নটা বেখাপ্পা।

হলধর ঃ বেখাপ্পা?

অঙ্গনা ঃ আমি স্বপ্ন দেখলাম আমি একটা ছাদের ধারে প্যারাপিটের ওপর দিয়ে হাঁটছি। আপনি কখনও এরকম স্বপ্ন দেখেন?

হলধর ঃ দেখি বটে। ঘামে ভিজে, বুক ধড়ফড় করে জেগে উঠি।

অঙ্গনা ঃ প্যারাপিট থেকে পড়ে যেতে আপনার ভালো লাগে না? শূন্যে ভাসতে ভাসতে আস্তে আস্তে নিচের দিকে.....

অলি ঃ আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। বাজার থেকে ঘুরে আসি। অঙ্গনা, তোমার যা যা দরকার বলেছ, নিয়ে আসব।

অঙ্গনা ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে, অলির গলা জড়িয়ে) বৌদি, আমার সোনার বৌদি।

(অলি প্রায় অপ্রস্তুত হয়ে কোনোরকমে অঙ্গনার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হল।)

অঙ্গনা ঃ আমিও তো আপনার সঙ্গে বাজারে যেতে পারি বৌদি।

অলি ঃ তুমি এইভাবে বাজারে গেলে রাস্তার লোকজন হাসবে।

অঙ্গনা ঃ তাই নাকি? তা হলে তো খুব মজা হবে।

অলি ঃ মজা আবার কী? লোকে তোমাকেও পাগল ভাববে।

অঙ্গনা ঃ আমাকেও পাগল ভাববে? এখানে অনেক পাগল আছে নাকি?

হলধর ঃ (নিজের মাথার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) এই একজন এখানে।

অঙ্গনা ঃ আপনি পাগল?

অলি ঃ কি ইয়ার্কি করছ তুমি?

হলধর ঃ অঙ্গনা, তোমার মনে হয় না আমার মাথা খারাপ?

অঙ্গনা ঃ না, তা হয় না। (একটু ভেবে) কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খটকা আছে।

(অলি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়ালেন।)

অলি ঃ কিসের খটকা?

অঙ্গনা ঃ সে আপনাকে বলা যাবে না বৌদি।

অলি ঃ তা হলে ওঁকেই বল। আমি বরং ওঁর কাছ থেকে শুনে নেব।

(অলি বেরিয়ে গেলেন।)

অঙ্গনা ঃ বৌদির বোধ হয় আমাকে তেমন পছন্দ হচ্ছে না।

হলধর ঃ তা হবে না কেন?

অঙ্গনা ঃ কিন্তু আমার তাই মনে হচ্ছে।

(অঙ্গনা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বুককেসের সামনে নিয়ে দাঁড়াল। বইগুলোর নাম দেখতে লাগল। হলধর চুপচাপ বসে।)

অঙ্গনা ঃ কত বই? এই সব বই আপনি পড়েন? কতরকম বই? পিরামিড, তাজমহল, বাকিংহাম প্যালেস, এই তো এখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপরে একটা মোটা বই।

হলধর : প্রায় সবই বিখ্যাত সব দালান নিয়ে।

অঙ্গনা : এই তো একটা বই রয়েছে, 'কামসূত্র'। এটাও কি দালান নিয়ে?
একটু দেখব?

হলধর : বুককেসের চাবি আমার কাছে নেই। বৌদি এলে চেয়ে নিয়ো।
এত বই থাকতে ওই বইটা পড়তে তোমার ইচ্ছে করছে কেন?

অঙ্গনা : (অসহায়ের মত এগিয়ে এসে) আমার কোনো বই পড়তে ইচ্ছে
করে না। দু-চার পাতা পড়ার পরেই মনে হয় সব পুরোনো, এ
সব পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

হলধর : আমি তোমার সঙ্গে একমত। অল্প বয়সে কিছু কিছু পড়তাম এই
সব বই। পরে কিনেছি। কিন্তু পড়িনি। না পড়লেও চলে যায়।

(অঙ্গনা বুককেসের পাশ থেকে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের নকশাগুলোকে দেখতে লাগল।)

অঙ্গনা : এই নকশাগুলো আপনি করেছেন?

হলধর : আমি আঁকব কেন? আমার এখানে একটি ছেলে কাজ করে,
সেই এঁকেছে।

অঙ্গনা : সে নিশ্চয় আপনার কাছে কাজ শিখেছে?

হলধর : তা কিছু কিছু শিখেছে।

অঙ্গনা : সে নিশ্চয় খুব বুদ্ধিমান।

হলধর : ওই নকশা দেখে তোমার মনে হচ্ছে?

অঙ্গনা : না, তা নয়। কিন্তু সে তো আপনার ছাত্র।

হলধর : এতদিন কাজ করছি। অনেকেই আমার কাছে কাজ শিখেছে।

অঙ্গনা : আপনি কিন্তু খুব বোকা। সবাইকে আপনার কাজ শেখানো
উচিত হয়নি।

হলধর : কেন?

অঙ্গনা : আপনার মতো তো সবাই নয়। আপনার কাজের মর্ম সকলে
কী বুঝবে। সকলকে শিখিয়ে কী লাভ?

হলধর : (একটু চিন্তিতভাবে) তুমি আশ্চর্য একটা কথা বললে, অঙ্গনা।
এ কথাটা আমিও অনেকবার ভেবেছি।

(হলধর আবার মন দিয়ে নকশা দেখতে বসলেন। বাইরে একটু মেঘলা-মেঘলা রোদ।)

অঙ্গনা : আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?

(হলধর একটা পেন্সিল দিয়ে নকশাটাকে মার্জনা করছিলেন, খুব মনোযোগ থাকায় অঙ্গনার কথাটা শুনতে পেলেন না। কিন্তু কিছু একটা বলেছে বুঝতে পেরে মাথা উঁচু করে তাকালেন।)

হলধর : তুমি আমাকে কিছু বললে?

অঙ্গনা : আমি একটু আমার ঘর থেকে ঘুরে আসি। একটু ফিটফাট হয়ে আসি।

(অঙ্গনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হলধর নকশাটা দেখতে দেখতে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই একই দৃশ্য। পনেরো-বিশ মিনিট পর।

হলধর বোধ হয় কোনো একটা স্বপ্ন দেখছেন, সুখস্বপ্ন বলা যায়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।।

ঘরের মধ্যে অঙ্গনা এল, নতুন সালোয়ার-কামিজ পরা। অঙ্গনার পায়ের শব্দে হলধরের তন্দ্রা ভাঙল, চোখ মেলে তাকালেন।

হলধর : বাঃ, সুন্দর পোশাক হয়েছে তোমার।

অঙ্গনা : বৌদি বাজার থেকে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বৌদির বোধ হয় ফিরতে দেরি হবে।

হলধর : বাজার তো কাছেই, এসে যাবে এখুনি।

অঙ্গনা : আচ্ছা, একটা মজার কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে?

হলধর : কি মজার কথা?

অঙ্গনা : এ বাড়িতে তো কোনো বাচ্চা নেই।

হলধর : (বেদনাহত কণ্ঠে) এটা কোন মজার কথা হল?

(অঙ্গনা বুঝতে পারল কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিল।)

অঙ্গনা : না, আসলে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে কাল রাতে তো খেয়াল করিনি। আজ সকালে দেখলাম আমার ঘরভর্তি বাচ্চার

জিনিসপত্র, খেলনা-দোলনা। আর পাশের ঘরেও তাই।

(হলধর উঠে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন, অঙ্গনাকে ডাকলেন।)

হলধর ঃ অঙ্গনা। এদিকে এসো। ওই দিকে একটু দূরে ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার পেছন দিকে তাকাও।

অঙ্গনা ঃ (জানলার কাছে এসে) তাই তো ওই দিকটায় কী সুন্দর একটা বাড়ি উঠছে। গির্জার চূড়ার মতো কী লম্বা একটা ঝকঝকে সাদা মিনার আকাশে উঠে গেছে, চূড়ার নিচের বাড়িটার দেওয়ালে কালো পাথরের আস্তর।

হলধর ঃ বাড়ির বাইরেটা কালো গ্রানাইট পাথরের, আর ওই লম্বা চূড়াটা জয়পুরের সাদা মার্বেলের।

অঙ্গনা ঃ ওই বাড়িটা কী একটা মন্দির।

হলধর ঃ মন্দির হবে কেন? ওটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। হলধর বিল্ডার্সের শেষতম কীর্তি।

অঙ্গনা ঃ অত সুন্দর বাড়িতে কারা থাকবে?

হলধর ঃ একতলা থেকে তিনতলা, ছটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আর এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা ওখানে গিয়ে থাকব।

অঙ্গনা ঃ (স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো) আমরা? আমরা ওখানে থাকব? ওই আমার স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ?

হলধর ঃ (কিঞ্চিৎ বিব্রত) শোনো, আরও কথা আছে।

অঙ্গনা ঃ আর কি কথা থাকতে পারে এর পর?

হলধর ঃ কথাটা শোনো। এ বাড়িতে যেমন দুটো ঘর আছে বাচ্চাদের খেলনায়, জিনিসপত্রে ভর্তি, ওই চারতলাতেও ট্রাইসাইকেল, দোলনা, রঙিন বল, ছোট ওয়ার্ডরোব, চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো এখানকার চেয়েও ভালো দুটো বাচ্চাদের ঘর আছে।

অঙ্গনা ঃ (হাততালি দিয়ে) কী মজা?

হলধর ঃ (একটু দুঃখিত কণ্ঠে) মজা? আমার সব কথা শোনো, বুঝবে তেমন মজা নয়।

অঙ্গনা ঃ (উৎকণ্ঠিত হয়ে, বড়ো বড়ো চোখ মেলে) বলুন, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।

হলধর ঃ অনেকদিন আগের কথা, তোমার জন্মেরও আগের। আমি তখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার বন্ধু ব্রজেশ নিয়োগীর

সঙ্গে কিছু টুকটাক কাজ করি, সেই সঙ্গে খুচরো সাপ্লাই, কন্‌ট্রাক্ট। ইধার কা মাল উধার....

অঙ্গনা : ইধার কা মাল উধার?

হলধর : সত্যি তাই। ইধার কা মাল উধার আর উধার কা মাল ইধার। কথাটা শোনোনি আগে?

অঙ্গনা : না তো।

হলধর : তা হলে আর বুঝে দরকার নেই। তার চেয়ে গল্পটা শেষ করি।

কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে চলে যাচ্ছে। এই সময়ে অলি সন্তানসম্ভবা। আমাদের প্রথম সন্তান। (একটু থেমে থেমে, জানলা দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে) সরকারি হাসপাতালে অলির যমজ ছেলে হল। নার্সিং হোমের পয়সা আমাদের ছিল না।

আমরা থাকতাম বেলেঘাটা মোড়ের কাছে একটা গলির মধ্যে, নোংরা, পচা, আবর্জনা ভরা, ঘেয়ো কুকুর আর ডোমবস্তির শুয়োরের পাল.....

অঙ্গনা : আমি কিন্তু দুঃখের গল্প একদম সহ্য করতে পারি না।

হলধর : ঠিক আছে। একটু বাদ দিয়ে যাচ্ছি।

অলি ছেলে দুটোকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এল। দুপাশে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে অলি শুয়ে থাকত, মনে হত খাপরার ভাঙা ঘর আলো হয়ে আছে।

আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একটা কাঠগোলা। প্রায় এক বিঘে জমির ওপর। পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরোনো গোলা, বছরে ষাট টাকা ভাড়া।

অঙ্গনা : এক বিঘে জমির ভাড়া বছরে ষাট টাকা, মানে মাসে পাঁচ টাকা?

হলধর : থাম। আমাকে কথাগুলো শেষ করতে দাও।

ছেলে দুটো জন্মাল বর্ষাকালে। ইংরেজি তারিখটা মনে আছে, বাইশে জুলাই, সোমবার। পাঁচ-ছমাসেই তারা বেশ বড়োসড়ো হয়ে উঠল, গাব্দা-গোব্দা। হাত-পা ছোঁড়ে, থুতনিতে আঙুল ছোঁয়ালে ফিক করে হাসে। ঘুমের ঘোরে দেয়ালা দেখে, ঠোঁটে-মুখে হাসিকান্না খেলে বেড়ায়।

অঙ্গনা : দেয়ালা কি?

হলধর : বাচ্চাদের স্বপ্ন।

অঙ্গনা : বাচ্চারাও আমাদের মতো স্বপ্ন দেখে?

হলধর : মুমূর্ষু জানো?

অঙ্গনা : তা জানি, যে মরতে বসেছে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে লিখতে হয়েছিল। কিন্তু বানানটা বড়ো খটমট।

হলধর : বানান দরকার নেই। শুধু শুনে রাখো, একালের ডাক্তারেরা বলেছেন মায়ের পেটের মধ্যে যে বাচ্চারা রয়েছে তারা পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে, তেমনি যার অবস্থা এখন-তখন, যে লোক মরতে বসেছে, ওই যাকে বললাম মুমূর্ষু, সেও ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। আমি তুমি যেমন স্বপ্ন দেখি, ঠিক সেই রকম। দুঃখের স্বপ্ন, সুখের স্বপ্ন, ভয়ের স্বপ্ন, সাহসের স্বপ্ন, পাওয়ার স্বপ্ন, না পাওয়ার স্বপ্ন। সবাই স্বপ্ন দেখে।

অঙ্গনা : স্বপ্নের কথা শুনলে আমি কেমন যেন হয়ে যাই। শরীর শিরশির করে। এই দেখুন আমার লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

(হলধর এখনও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। তিনি অঙ্গনার দিকে তার শরীরের শিহরণ দেখার জন্য তাকালেন না।)

অঙ্গনা : সেই গাব্দা-গোব্দা বাচ্চা দুটোর কথা আর কিছু বলুন।

হলধর : আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এবার শেষ করছি।

মাঘ মাসের শেষ। কয়েকদিন আগে সরস্বতী পুজো হয়ে গেছে। তখনও কনকনে ঠাণ্ডা। পলাশ গাছের ভিড় মল্লিকদের বাগানবাড়িতে, গাছের চূড়ার লাল ফুলের থোকায় অন্ধকার হতে না হতে কুয়াশা বাসা বাঁধে। মনে হয়, সিঁদুরে মেঘ জমেছে।

অঙ্গনা : আপনি খুব কবিতা ভালোবাসেন, তাই না।

হলধর : কবিতা তোমাকে আজকে দিলাম ছুটি।

অঙ্গনা : এটাও নিশ্চয় কবিতা।

হলধর : আমায় কথাগুলো বলতে দাও।

অঙ্গনা : বলতেই হবে?

হলধর : আমাকে বলতেই হবে। আমি এমন একজনকে খুঁজছিলাম যাকে বলা যায়। তুমি এসে গেলে....

অঙ্গনা : ঠিক আছে শুনি।

হলধর : মাঘ মাসের এক রাতদুপুরে কাঠগোলায় আগুন লাগল। মুহূর্তের মধ্যে কাঠের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। উত্তরের বাতাসের ধাক্কায় আগুনের লকলকে শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে লাগল। চারদিকের লোকজন জল, বালতি নিয়ে ছুটে এল। তাদের সাধ্য কী সেই আগুন নেভায়!

অঙ্গনা : কি করে আগুনটা লাগল?

হলধর ঃ সেটা কেউ জানে না।

অঙ্গনা ঃ কিন্তু আপনি জানেন।

হলধর ঃ প্রশ্ন করো না। যা বলছি শোনো।

(হলধরের একটু থমকিয়ে যাওয়া ভাব। একটু দম নিলেন।)

হলধর ঃ দমকলের গাড়ি আসতে দেড় ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় একটা লরির চাকা ভেঙে পড়েছিল। অনেক ঘুরে আসতে হল। ততক্ষণে পুরো কাঠগোলাটা ছাই হয়ে গেছে।

অঙ্গনা ঃ কাঠগোলাটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেল!

হলধর ঃ এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটেছে। আমাদের বাসাটা ছিল কাঠগোলার পশ্চিমের দিকের গলিতে। উত্তর দিক থেকে শীতের বাতাস বইছিল, হঠাৎ বাতাসটা পুবদিকে ঘুরে গেল। আগুনের হলকা এসে পড়তে লাগল আমাদের বাড়িতে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলম। হঠাৎ দেখলাম কোনোভাবে দুটো কাঁথায় বাচ্চা দুটোকে জড়িয়ে অলি পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটে গেল। আমি পেছনে পেছনে 'অলি, অলি' বলে ছুটলাম। অলি ছুটতে ছুটতে গিয়ে থামল, আগুনের আঁচ থেকে অনেক দূরে? সুভাষ সরোবরের ওপারে একটা বড় গাছের নিচে।

অঙ্গনা ঃ সেখানে তো আগুনের আঁচ পৌঁছায়নি। শীতের শেষ রাতে পুকুরপাড়ে খুব ঠাণ্ডা ছিল না।

হলধর ঃ খুব, খুব ঠাণ্ডা। গাছের পাতা থেকে টপটপ করে হিমজল পড়ছে। ছুরির ফলার মতো ধারালো উত্তুরে হাওয়া বইছে। বাচ্চা দুটো ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল। একটু পরে আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

অঙ্গনা ঃ ছেলে দুটোর কিছু হয়নি তো।

হলধর ঃ নিমুনিয়া। তিনদিনের মাথায় একজন মারা গেল, সাতদিনের মাথায় অন্যজন।

(অঙ্গনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে, হলধরও নিঃশব্দ। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ভাব। হলধরই নিঃশব্দতা ভাঙল।)

হলধর ঃ আর অল্প একটু বাকি আছে। তোমার সেই মজার কথাটা এখনও বাকি আছে।

অঙ্গনা ঃ এর পরেও মজার কথা?

হলধর ঃ (অঙ্গনাকে গুরুত্ব না দিয়ে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো) এর পর অলি একদম বদলিয়ে গেল। কেমন চুপচাপ, ছাড়া ছাড়া, বাইরে থেকে সব ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে একটা এলোমেলো ব্যাপার। আসলে অলির ছেলে দুটো নেই, কিছুতেই মেনে নিল না। এখনও তার মনে মনে ছেলে দুটো আছে, তারা খুব বড়ো হয়নি, প্রায় সেই শিশু অবস্থাতেই আছে।

অঙ্গনা ঃ তাই ওই ঘর দুটো তাদের।

হলধর ঃ অলি নিজের হাতে ওসব ঘর পরিষ্কার করে, সাজায়। কাউকে ও দুটো ঘরে ঢুকতে দেয় না।

অঙ্গনা ঃ কিন্তু আমাকে?

হলধর ঃ অলি তোমাকে হয়তো মেয়ের মতো....

অঙ্গনা ঃ তিনি সেইজন্যে হয়তো আমার বৌদি বলা পছন্দ করছেন না।

হলধর ঃ হতে পারে।

(বাইরের দিকের দরজা দিয়ে রঞ্জনের প্রবেশ। একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে হলধরকে দেখে রঞ্জন বেরিয়ে যাচ্ছিল।)

হলধর ঃ কি খবর রঞ্জন? বাবা ভালো নেই, শুনলাম। কাজল বলল।

রঞ্জন ঃ বাবার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।

(অঙ্গনা রঞ্জনকে লক্ষ করছিল। রঞ্জন একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। হলধর ব্যাপারটা বুঝলেন।)

হলধর ঃ রঞ্জন, ইনি হলেন আমার বন্ধুর মেয়ে অঙ্গনা, আর অঙ্গনা, এ হল রঞ্জন। ওর বাবা ব্রজেশ আর আমি একসঙ্গে পড়তাম। ব্রজেশ খুব ভালো ছাত্র ছিল। ব্রজেশ দারুণ ছাত্র ছিল, পরে বেলেঘাটার কাঠগোলায় সেই পোড়ো জমিতে আমি ব্রজেশের সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম ফ্ল্যাটবাড়ি তুলেছিলাম, সেই সূচনা।

অঙ্গনা ঃ সেখানে আপনি ফ্ল্যাটবাড়ি তুললেন?

হলধর ঃ (রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে) তুমি কিছু বলতে এসেছ?

রঞ্জন ঃ বাবা বললেন, আপনি যদি আমার ড্রইংগুলো দেখে ভালো কিছু লিখে দেন।

হলধর ঃ সার্টিফিকেটে কোনো কাজ হয়, ইয়ংম্যান?

রঞ্জন ঃ কোনো কাজের জন্যে নয়, বাবা যদি দেখতে পেতেন আপনি আমার কাজের প্রশংসা করেছেন, জীবনের শেষ কটা দিন একটু

শান্তি পেতেন। আমার ড্রইং আপনি দেখেছেন?

হলধর : শোনো রঞ্জন, আমি তোমার সঙ্গে তোমার ড্রইং নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না।

রঞ্জন : আপনি দেখেননি আমার ড্রইং?

হলধর : দেখেছি।

রঞ্জন : আপনার পছন্দ হয়নি? তা হলে তো কখনও আমার কিছু হবে না। আপনিই যদি আমার কাজ দেখে খুশি না হন, আর কেউ কি খুশি হবে?

হলধর : (একটু এড়িয়ে যাওয়ার কায়দায়) রঞ্জন তোমার ওই নকশা-টকশাগুলো ঠিক আছে, তুমি আমার ওপরে নির্ভর করছ না কেন, আমার সার্টিফিকেট লাগবে কেন, তুমি আমার সঙ্গে থাক। তুমি কাজলকে বিয়ে করো। তোমরা দুজনে এখানে কাজ করো, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, টাকার টানাটানি হবে না।

রঞ্জন : বাড়ি গিয়ে বাবাকে আপনার কথা বলব। বাবা যদি অনুমতি দেন।

হলধর : বাবাকে বোলো হলধরকাকা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রঞ্জন : (একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে) আপনার যদি পছন্দ না হয়ে থাকে, আমি আমার ড্রইংগুলো ফেরত নিয়ে যেতে পারি।

হলধর : (একটু বিরক্ত হয়ে) ওই টেবিলের ওপরে আছে, নিয়ে যাও।

(রঞ্জন টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। অঙ্গনা এসে রঞ্জনের হাতটা চেপে ধরল।)

অঙ্গনা : নিয়ো না, তুমি এগুলো রেখে যাও।

(রঞ্জন অবাক হয়ে অঙ্গনার মুখের দিকে তাকাল।)

হলধর : ওকে নিয়ে যেতে দাও।

অঙ্গনা : আমি এই নকশাগুলো দেখতে চাই।

রঞ্জন : (অসহায়ভাবে) আপনি বুঝতে পারবেন?

হলধর : রঞ্জন তুমি এবার যাও।

(রঞ্জন বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার পাশে পাশে অঙ্গনা এগিয়ে এল। শেষ মুহূর্তে রঞ্জনের ডান হাতটা নিজের বাঁ-হাতে শক্ত করে মুঠো করে অঙ্গনা স্থির হয়ে দাঁড়াল। হতভম্ব হলধর!)

হলধর : অঙ্গনা, এটা কী হল? তুমি ওই প্ল্যান দিয়ে কি করবে?

অঙ্গনা ঃ আমি কিছু করব না। আপনি এগুলোতে সার্টিফিকেট দেবেন।

হলধর ঃ কি সার্টিফিকেট?

অঙ্গনা ঃ লিখে দেবেন যে, প্ল্যানগুলো ভালো হয়েছে। আপনি নকশা দেখে খুশি, সন্তুষ্ট হয়েছেন।

হলধর ঃ তা অমি দেব না।

অঙ্গনা ঃ কিন্তু আপনাকে দিতে হবে।

হলধর ঃ (অধৈর্যভাবে) কেন? কি জন্যে?

অঙ্গনা ঃ এক মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ, আপনার পুরোনো বন্ধু আপনার সার্টিফিকেট দেখলে খুশি হবে। একটি যুবক জীবনে প্রথম কাজ আরম্ভ করতে পারবে।

হলধর ঃ (অসহায়ভাবে) ঠিক আছে, একটা কলম দাও। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি। রঞ্জন একবার দাঁড়াতে পারলে আমাকে বসিয়ে দেবে।

অঙ্গনা ঃ কেন বসিয়ে দেবে?

হলধর ঃ একদিন আমি ওর বাবাকে বসিয়ে দিয়েছিলাম, আমার জন্যে ব্রজেশকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল, রঞ্জন তার প্রতিশোধ নেবে, নেবেই।

অঙ্গনা ঃ (সামনের টেবিলের দেরাজ খুলে একটা কলম বার করে) এই নিন। বেশ ভালো একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন, খুব প্রশংসা করে।

হলধর ঃ (দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে প্ল্যানে সার্টিফিকেট লিখতে লিখতে) আচ্ছা অঙ্গনা, সত্যিই এই ছ' বছর ধরে তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে?

অঙ্গনা ঃ নিশ্চয়।

হলধর ঃ তুমি আর কাউকে ভালোবাসনি?

অঙ্গনা ঃ তা দুয়েকজনকে।

হলধর ঃ জানো অঙ্গনা, তোমার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, দিন শুরু হচ্ছে, সূর্য উঠছে। কিন্তু আমার দিন শেষ। এবার আমার বিদায়ের পালা।

অঙ্গনা ঃ সার্টিফিকেটটা শেষ করে সই করুন। তাড়াতাড়ি করুন। বুড়ো ভদ্রলোক যে-কোনো সময় মারা যেতে পারেন।

(হলধর সই করছেন, এমন সময় বাইরের দরজা দিয়ে অলির প্রবেশ, হাতে কয়েকটা প্যাকেট।)

অলি : অঙ্গনা এই বড়ো প্যাকেটের জিনিসগুলো তোমার। বাজার থেকে আগে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছিলাম (অঙ্গনার দিকে লক্ষ করে) এই তো পরে ফেলেছ। বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে।

অঙ্গনা : থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি।

হলধর : অলি, বাইরের ঘরে কি কাজলকে দেখলে?

অলি : হ্যাঁ, টেবিলে বসে কাজ করছে।

হলধর : তা হলে সার্টিফিকেট দেয়া এই প্ল্যানটা ওকে দিয়ে দিই।

অঙ্গনা : (প্ল্যানটা হলধরের হাত থেকে নিয়ে) আমি দেব। কি যেন নাম মহিলার?

হলধর : কাজল।

অঙ্গনা : (বাইরের ঘরে যাওয়ার দরজার কাছে গিয়ে) কাজল, এই ঘরে একটু আসুন। মিঃ সান্যাল আপনাকে ডাকছেন।

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল : (একটু ত্রস্তভাবে) আমাকে আপনি ডাকছেন?

(হলধর কিছু বলার আগে প্ল্যানটা কাজলের হাতে তুলে দিল অঙ্গনা।)

অঙ্গনা : মিঃ সান্যাল রঞ্জনবাবুর এই প্ল্যানে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন।

হলধর : এখনই এটা নিয়ে রঞ্জনদের বাড়িতে চলে যাও। ব্রজেশ এই মুহূর্তে একটু স্বস্তি পাবে।

কাজল : আমি কী রঞ্জনকে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যেতে।

হলধর : (খুব কর্কশভাবে) না। আমাকে কাউকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না। আর রঞ্জনকে বলে দিয়ো, তাকে আর কাল থেকে কাজে আসতে হবে না।

কাজল : আমিও কাজে আসব না?

হলধর : রঞ্জন নতুন কোম্পানি করবে। তোমাদের বিয়ে হবে। ব্রজেশ অসুস্থ। এখন তোমার অন্য অনেক কাজ আছে।

কাজল : (চুপ করে থেকে, নরমভাবে) তাহলে যাই?

(কাজল বেরিয়ে গেল।)

অলি : মেয়েটা খুব চালাক।

হলধর : একটা হতভাগ্য মেয়ে।

অলি : তুমি ওদের সত্যি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে?

হলধর : তোমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না?

অলি : কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে ওদের ছাড়া চলবে না।

হলধর : (জানলার কাছে এগিয়ে, বাইরের নতুন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে) ওসব কথা বাদ দাও। পুরোনো ব্যাপার, নতুন বাড়িটার কথা ভাবো।

অলি : পুরুতঠাকুরকে ডেকে একটা গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করতে হয়। অন্য যারা ফ্ল্যাট কিনেছে, তাদেরও খবর দিতে হবে।

হলধর : সেটা তোমার ব্যাপার। আমার কাজ হল আজ বিকেলে ওই বাড়িটার চূড়ায় একটা পেতলের কলসি লাগিয়ে দিয়ে আসা। সেটা হলেই ওবাড়ি তৈরির সব কাজ শেষ হবে।

অঙ্গনা : পেতলের কলসি!

হলধর : সাদা চূড়ার ওপরে নীল আকাশের নিচে কলসিটা ঝলমল করবে। দূর দূর থেকে লোকেরা দেখতে পাবে।

অঙ্গনা : (উত্তেজিত হয়ে) কলসিটা আপনি নিজের হাতে বসাবেন?

অলি : (রেগে গিয়ে) কি বলছ অঙ্গনা, একটু উঁচুতে উঠলেই ওঁর মাথা ঘোরে, ওই চূড়ায় উনি উঠবেন না।

অঙ্গনা : সত্যি ওঁর মাথা ঘোরে? উনি সেই আমাদের ইস্কুলের গম্বুজের মাথায় উঠে গিয়েছিলেন।

অলি : সে কথা আমি শুনেছি। সেটা ঠিক করেননি, তাছাড়া তখন বয়েস কম ছিল।

হলধর : (দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে) আমি পারব, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

অলি : অসম্ভব। তিনতলার বারান্দায় দাঁড়ালে তুমি নিচের দিকে তাকাতে পারো না, তোমার পা কাঁপে, মাথা ঘোরে।

হলধর : আজ বিকেলে দেখবে সব সময়ে আমার পা কাঁপে না, মাথা ঘোরে না।

অলি : আজ বিকেলেই?

হলধর : আজকেই সবাইকে আসতে বলেছি। রঞ্জন, কাজলরাও হয়তো আসবে। অবশ্য যদি ব্রজেশ ভালো থাকে, ওদের তো আগে থেকেই বলা ছিল।

অলি : কিন্তু তুমি পারবে না। তুমি পাগল হয়ে গেছ।

(অলি ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।)

অঙ্গনা : (খুব উত্তেজিত) আপনি পারবেন? সত্যিই পারবেন?

হলধর : গির্জার চূড়ার নিচেই একটা ঘর আছে। শ্বেতপাথরের ঘর, সেই ঘরটায়, রাজকন্যা, তুমি থাকবে। দশদিক থেকে বাতাস আসবে। চূড়ায় পেতলের কলসটা রোদে-জ্যোৎস্নায় ঝলমল করবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক
(এই অঙ্কে একটাই দৃশ্য)

একই দিনের বিকেলবেলা।

হলধর সান্যালের বাড়ির ভেতরের দোতলার চওড়া বারান্দা। বারান্দার সামনের দিক থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে একতলায়। ভেতরের উঠানের চারদিকে নানা রকম গাছ। সেগুলোর ডালপালা বারান্দায় উঠে এসেছে।

আকাশে এলোমেলো মেঘ। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। একটু দূরেই নতুন বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। এখনও চারদিকে বাঁশ বাধা আছে।

বারান্দায় দেয়ালঘেঁষে পরপর দুটো কাঠের বেঞ্চি, একটা গোলটেবিল। বারান্দা ঘিরে লোহার গ্রিলের রেলিং। ওপাশে একটা ইজিচেয়ার রয়েছে।

অলি সান্যাল একটা চাদর জড়িয়ে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেদিকে ওই নতুন বাড়িটা।

একটু পরে অঙ্গনা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, তার পরনে সেই সকালের সালোয়ার-কামিজ। তবে এখন তার চুলে একটা লাল গোলাপ গোঁজা রয়েছে। তার হাতেও একটা গোলাপফুল।

অলি সান্যাল অঙ্গনার চুলে এবং হাতে গোলাপ দুটো লক্ষ করলেন।

অলি : অঙ্গনা তুমি বাগানে গিয়েছিলে?

অঙ্গনা : ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এই আপনার জন্যেও একটা ফুল নিয়ে এলাম।

(অঙ্গনা এগিয়ে গিয়ে প্রথমে অলির চুলে তার হাতের ফুলটা গুঁজতে যাচ্ছিল। তারপর কী ভেবে সেটা তাঁর হাতে তুলে দিল।)

অঙ্গনা : বাগানে কত ফুল ফুটেছে!

অলি : আমি কতদিন বাগানে যাইনি।

অঙ্গনা : গেলে খুব ভালো লাগবে।

অলি : আমার আর কিছু ভালো লাগে না। যা কিছু করি, অভ্যাসমতো, নিয়মমতো করি।

অঙ্গনা : (চুপ করে থেকে) আমি যদি আপনাদের এখানে আর কিছুদিন থাকি। আপনার অসুবিধে হবে?

অলি : অসুবিধে হবে কেন? খুব খুশি হব। তোমার যে ক'দিন ইচ্ছে হয় থাক।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ।)

অলি : তুমি যে আমার কাছে বারান্দায় এলে, এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি মিস্টার সান্যালের সঙ্গে চূড়ায় চড়তে যাবে।

অঙ্গনা : তা যাব কেন? আমি এখান থেকে দেখব, আপনার পাশে বসে।

(অঙ্গনা হেলান দেয়া কাঠের বেঞ্চের একপাশে গিয়ে বসল।)

অঙ্গনা : নিচে দেখলাম মিস্টার সান্যাল মিস্ত্রিদের সঙ্গে খুব চেঁচামেচি, রাগারাগি করছেন।

অলি : ওঁর বাইরের চেহারাটা ওরকম ভেতরে ভেতরে খুব নরম মনের মানুষ।

অঙ্গনা : আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। (কথা ঘুরিয়ে) আচ্ছা বৌদি, আপনার নতুন বাড়িতে যেতে ভালো লাগবে?

অলি : আমার ভালো লাগা কোনো ব্যাপার নয়। ও চাইছে, তাই আমি যাব।

অঙ্গনা : বাচ্চা দুটোর জন্যে আপনার খুব মন খারাপ লাগে?

অলি : বাচ্চা? আমার ছেলে দুটো? তাদের তো কিছু হয়নি। কেউ জানে না, কিন্তু তারা এখনও আছে। ওই বাড়িতেও তাদের জন্যে দুটো ঘর করা হয়েছে। সেখানে তারা খেলা করবে, হাসবে, কাঁদবে, হাত-পা ছুঁড়বে, হামাগুড়ি দেবে, হাঁটিহাঁটি পা-পা টলে টলে হাঁটবে। (অলির চোখে জল।)

(সিঁড়ি দিয়ে হরিদয়াল ডাক্তার উঠে এলেন।)

হরিদয়াল : মিসেস সান্যাল, এই খোলা বারান্দায় বসে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছেন?

অলি : এই বারান্দাটায় আজ খুব ভালো লাগছে বসে থাকতে।

হরিদয়াল : কিন্তু ব্যাপার কী? আপনি আমার কাছে লোক পাঠালেন আসার জন্যে।

অলি : আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

হরিদয়াল : চলুন ভেতরে যাই।

(অলি উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হলধর উঠে আসছেন।)

(অলি অঙ্গনার খুব কাছে গিয়ে প্রায় ফিসফিস করে।)

অলি : ও আসছে। অঙ্গনা, শুধু তুমি পারো ওকে থামাতে। শুধু তুমি না করলেই ও হয়তো চূড়ায় উঠতে যাবে না।

অঙ্গনা : (অলির গলা জড়িয়ে ধরে) তা কী সম্ভব!

অলি : (অঙ্গনার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আলগোছে ছাড়িয়ে নিয়ে) আমি ভেতরে যাই, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু কথা আছে।

হরিদয়াল : মিঃ সান্যালের কোনো ব্যাপার নাকি?

অলি : ভেতরে চলুন ডাক্তার।

(হলধর ওপরে উঠে এসেছেন। ওপরে এসে অলি এবং হরিদয়ালকে ভেতরে যেতে দেখলেন। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।)

হলধর : অঙ্গনা, লক্ষ করলে, আমি যেই এলাম, অলি চলে গেল।

(অঙ্গনা কেমন থমকিয়ে গেছে। কিছু বলল না।)

হলধর : অঙ্গনা, তুমি হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, তোমার আবার কি হল? আমি উঠোনের ওদিক থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

অঙ্গনা : বৌদিকে দেখতে পাননি?

হলধর : দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম, আমি এলেই অলি চলে যাবে।

অঙ্গনা : আমাকে কিছু বলবেন? বৌদি যে আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, এতে আপনার খারাপ লাগে না? কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন, আপনি জানেন? আপনার অস্বস্তি হয় না?

হলধর : অলির মুখোমুখি হলেই বরং আমার অস্বস্তি হয়। কখনও অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছ অলির সঙ্গে? সেই কতকাল আগে মরে যাওয়া ছেলে দুটো এখনও সে কোলে করে রেখেছে। আমাকে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু আমাকে সন্দেহ করে। আমি টের পাই, মনে মনে সব ব্যাপারে অলি আমাকে সন্দেহ করে।

অঙ্গনা ঃ আমি চলে যাব। আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।

হলধর ঃ (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) চলে যাবে?

অঙ্গনা ঃ হ্যাঁ, যাব।

হলধর ঃ আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

অঙ্গনা ঃ আমার এখানে কী করার আছে?

হলধর ঃ তোমাকে কিছু করতে হবে না, অঙ্গনা, তুমি শুধু থাকো।

অঙ্গনা ঃ শুধু থাকলেই হবে? তার পরেও আরও কিছু থাকবে।

হলধর ঃ কি থাকবে?

অঙ্গনা ঃ অলিবৌদি থাকবেন। আমি ওঁর কোনো ক্ষতির কথা ভাবতে পারছি না।

হলধর ঃ তুমি চলে গেলে আমার কী হবে?

অঙ্গনা ঃ কি হবে আবার? অলিবৌদির মতো স্ত্রী আপনার। চারদিকে এত কাজ। আপনার দিন চমৎকার চলে যাবে।

হলধর ঃ চমৎকার!

অঙ্গনা ঃ আপনি নতুন কী বানাচ্ছেন?

হলধর ঃ আর কী কিছু বানানোর আছে? আমার নতুন কিছু বানানো শেষ হয়ে গেছে। তুমি বুঝতে পারছ না? এবার আমি শূন্যে প্রাসাদ বানাবো। বানাবো ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান। এর পর থেকে তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। আমরা দুজনে মিলে বানাবো...।

অঙ্গনা ঃ (হলধরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) শূন্যের মধ্যে প্রাসাদ? আকাশের গায়ে দুর্গ, ঝুলন্ত বাগান?

(রঞ্জনের প্রবেশ, হাতে প্রচুর ফুল আর মালা।)

হলধর ঃ এগুলো আবার আনতে গেলে কেন?

রঞ্জন ঃ এ সব তো আমারই আনার কথা।

হলধর ঃ কাজল তোমাকে কিছু বলেনি?

রঞ্জন ঃ বলেছে। চাকরি তো যাচ্ছে আগামীকাল থেকে। আজ পর্যন্ত আমার চাকরি আছে।

হলধর ঃ তোমার বাবা তা হলে ভালো আছেন?

রঞ্জন ঃ না ভালো নেই।

হলধর ঃ আমার সার্টিফিকেটটা দেখে খুশি হননি?

রঞ্জন ঃ খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল।

হলধর : মানে?

রঞ্জন : সার্টিফিকেটটা কাজল নিয়ে যাওয়ার আগে থেকেই বাবা অজ্ঞান হয়ে আছেন। ডাক্তার বলেছেন, জ্ঞান বোধ হয় আর ফিরবে না।

হলধর : তা হলে রঞ্জন তুমি বাড়ি যাও। তুমি ব্রজেশের কাছে গিয়ে বোসো।

রঞ্জন : বাবার আর কাউকে দরকার নেই।

হলধর : কিন্তু এই অবস্থায় ব্রজেশের কাছে কারো থাকা দরকার।

রঞ্জন : কাজল আছে।

হলধর : তা হলে তুমিও যাও। দু'জনেই থাকো ব্রজেশের কাছে।

রঞ্জন : এখন আমি ফিরছি না। চূড়ায় কলস বসানো দেখে তারপর ফিরব।

হলধর : (সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে) ঠিক আছে থাকো।

অঙ্গনা : আমরা দু'জনে এখান থেকে দেখব। (তারপর রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে) আপনার ওঁকে অন্তত একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল।

রঞ্জন : ওঁকে নয়, আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।

অঙ্গনা : এটা ঠিক কথা নয়।

রঞ্জন : আপনাকে আমি একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। মিঃ সান্যালকে আপনি একেবারেই চেনেন না। ওঁর চরিত্র সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই।

অঙ্গনা : (হেসে ফেলল) আমার তো মনে হয়, আমি ওঁকে ভালো করে চিনেছি। আচ্ছা, আপনারা তা হলে এখানে আর কাজে আসছেন না কাল থেকে।

রঞ্জন : আমি আসছি না। কিন্তু কাজল, কাজল তো আসবে?

অঙ্গনা : (অবাক হয়ে) সে কি? আপনি না থাকলেও কাজল এখানে কাজ করবেন। আমার তো ধারণা, আপনি আছেন বলেই কাজল এখানে কাজ করছিলেন।

রঞ্জন : আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু আজ কাজল আমাকে বলল, মিঃ সান্যালকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

অঙ্গনা : আশ্চর্য! কিন্তু মিঃ সান্যাল কি তাঁকে রাখবেন?

রঞ্জন : কেন রাখবেন না? তিনিই তো কাজলের মাথা খেয়েছেন।

তাকে বশীভূত করে ফেলেছেন। এ ব্যাপারে ওঁর কোনো তুলনা নেই।

অঙ্গনা : কিন্তু আমার বিশ্বাস উনি আপনার জন্যেই কাজলকে আহ্লাদ দিচ্ছিলেন। আপনাকে ছাড়া হলধর বিল্ডার্স অচল হয়ে যাবে।

রঞ্জন : মিঃ সান্যাল এ কথা আমাকে কোনোদিন বলেননি। বলতে সাহস পাননি। উনি একজন ভণ্ড, কাপুরুষ।

অঙ্গনা : কাপুরুষ? হলধর সান্যাল কাপুরুষ! জানেন ওঁকে আমি দেখেছিলাম, একটা উঁচু, পিছল, গোল গম্বুজের ওপরে উঠে পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একবারও পা টলেনি, বুক কাঁপেনি।

রঞ্জন : সে ওই একবারই। সেও অনেকদিন আগে।

অঙ্গনা : কেন, উনি আজকেই ওই নতুন বাড়ির চূড়ায় উঠে কলস স্থাপন করবেন।

রঞ্জন : ওঁর সেই পতাকা ওড়ানোর গল্প আমরা অনেকবার শুনেছি। সে তো প্রবাদ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই একবারই। ওঁর পক্ষে ও রকম কাজ করা আর সম্ভব নয়। এখন আর সে সাহস নেই।

অঙ্গনা : আজকে মিঃ সান্যাল চূড়ার ওপরে উঠবেনই, আমি নিশ্চয় করে জানি। একটু পরে আমরা দু'জনেই সেটা দেখতে পাব। এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখতে পাব।

(অলির প্রবেশ, একটু চঞ্চল ভাব।)

অলি : রঞ্জন, সান্যালসাহেব কোথায়?

রঞ্জন : নিচে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছেন।

অলি : তুমি একবার গিয়ে ওঁকে ওপরে আসতে বলো। আমি বড়ো চিন্তায় আছি।

অঙ্গনা : এত কী চিন্তা করছেন বৌদি?

অলি : সান্যালসাহেব পারবেন না, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ওই চূড়ায় ওঠা। একটা অঘটন ঘটবে।

অঙ্গনা : কেন অঘটন ঘটবে। আগেও তো উনি চূড়ায় উঠেছেন। এবারও উঠতে পারবেন।

(হরিদয়ালের প্রবেশ)

হরিদয়াল : সান্যালসাহেব কই?

অলি : তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

হরিদয়াল : আপনি একটু বাড়ির মধ্যে যান।

অলি : আমার বাড়ির মধ্যে ভালো লাগছে না।

হরিদয়াল : ড্রইংরুমে কয়েকজন মহিলা অপেক্ষা করছেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটা দেখতে এসেছেন। সান্যালসাহেবের চূড়ায় ওঠার ব্যাপারটা খুব চাউর হয়ে গেছে।

অঙ্গনা : ওঁদের চলে যেতে বলুন।

অলি : না, অঙ্গনা। তা হয় না। আমি ভেতরে যাচ্ছি। তুমি ওঁকে বোঝাও, অত উঁচুতে উঠতে মানা করো। তোমার কথা উনি শুনবেন ওঁকে পাগলামি করতে দিয়ো না।

(হলধর ওপরে উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। অলি ভেতরে চলে গেলেন। সঙ্গে হরিদয়ালও চলে গেলেন।)

হলধর : আমাকে কে ডেকেছে?

অঙ্গনা : আমি।

হলধর : কিছু বলতে চাও?

অঙ্গনা : আপনার কি ভয় করছে চূড়া বেয়ে উঠতে?

হলধর : সেদিন যখন তোমাদের স্কুলের শতবার্ষিকী ভবনের গম্বুজ বেয়ে উঠে গিয়েছিলাম, তার আগে কোনোদিন আমি ওভাবে অত উঁচুতে বেয়ে উঠিনি। শুধু মনে জোর করে খেয়ালবশত উঠে গিয়েছিলাম।

অঙ্গনা : হ্যাঁ, উঠে গিয়েছিলেন।

হলধর : সেই অত উঁচু থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল আমি সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে, কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ফাল্গুনের সকালবেলার ঠাণ্ডা বাতাস, রোদের উত্তাপ, চারদিকে সবুজ গাছপালা, কেন্দ্রবিন্দু আমি। সোনালি সবুজ পতাকা ওড়াচ্ছি। কেমন যেন মনে হয়েছিল, আমি পারি। আমি পারি।

অঙ্গনা : আজকে মনে হচ্ছে না।

হলধর : আজ আর কিছু মনে হচ্ছে না। কোনো ভাব, কোনো আবেগ মনের মধ্যে আসছে না। কোথাও কোন টান বোধ করছি না।

অঙ্গনা : আমার জন্যেও না। আপনি না আমার জন্যে শূন্যে প্রাসাদ বানাবেন?

(হলধর চুপ করে রইলেন।)

অঙ্গনা : কাজল? কাজলের জন্যে টান নেই আপনার?

হলধর : কাজল? কাজলের কথা তোমাকে অলি বলল?

অঙ্গনা : আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

হলধর : আমার কাছে কোনো জবাব নেই।

(নিচে ড্রাম বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে।)

হলধর : রঞ্জন একটা ব্যাণ্ডপার্টি নিয়ে এসেছে। কোথা থেকে খবর পেয়ে বহু লোক হয়েছে, রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। আমাকে এবার যেতে হয়।

(ড্রামের বাজনা শুনে ভেতরের ড্রইংরুম থেকে মহিলারা বারান্দায় চলে এসেছেন। সঙ্গে অলি ও হরিদয়াল।)

(নিচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে রঞ্জন উঠে এল।)

অলি : বাজনার বন্দোবস্ত হয়েছে দেখছি।

হলধর : আমি নিচে যাচ্ছি।

রঞ্জন : একজন রাজমিস্ত্রি রাজি হয়েছে কলসি নিয়ে চূড়ায় উঠতে।

অলি : আমরা সবাই এখান থেকে দেখি।

হলধর : না, তা হয় না। আমাকে নিচে যেতে হবে। আমি লোকজনের সঙ্গে দাঁড়াই।

অলি : তা হলে যে লোকটা উঠবে, তাকে খুব সাবধানে উঠতে বলো। দুজন মিস্ত্রি চূড়া বানাতে গিয়ে ওপর থেকে পড়ে মারা গেছে।

(হলধর নেমে গেলেন।)

অলি : অঙ্গনা, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব। তুমি না হলে কেউ ওঁকে ঠেকাতে পারত না।

অঙ্গনা : আমি আর কী করেছি?
(মহিলারা একপাশে বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। অলি ও হরিদয়াল সেদিকে এগিয়ে গেলেন।)

রঞ্জন : অঙ্গনা, নিচে দেখছেন? ব্যাণ্ডপার্টি, লোকজন। আমি সব জোগাড় করেছি। আমি সবাইকে দেখাতে চাই হলধর সান্যাল একজন ধোঁকাবাজ, হলধর সান্যাল চূড়ায় উঠতে পারেন না, সে সাহস তাঁর নেই।

অঙ্গনা : (খুব ধীরে-সুস্থে) কিন্তু আমি জানি উনি চূড়ায় উঠবেন।

রঞ্জন : অসম্ভব।

অঙ্গনা : ওই দেখুন।

রঞ্জন : আশ্চর্য!

অলি : (আতঙ্কিত কণ্ঠে) ডাক্তার, ও তো সত্যিই চূড়া বেয়ে উঠে যাচ্ছে।

হরিদয়াল : চেঁচাবেন না। ওঁর মনোযোগ নষ্ট হলে সর্বনাশ হবে।

অঙ্গনা : সেই সেদিনের সকালবেলার মতো তরতর করে আমার রাজপুত্র শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

(হঠাৎ অলির কাঁধ থেকে সাদা শালটা তুলে নিয়ে) হিপহিপ হুররে হুররে।

হরিদয়াল : (শালটা কেড়ে নিয়ে) কি, হচ্ছেটা কি? এখন গোলমাল নয়। ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক।

(সবাই সামনের দিকে দমবন্ধ হয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে।)

অঙ্গনা : উনি চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি। হাত নাড়ছেন। কলসিটা—

(হঠাৎ নিচ থেকে একটা সমবেত আর্ত চিৎকার শোনা গেল। একটা কিছু পড়ার শব্দ।)

অলিও মহিলারা (একসঙ্গে) : সর্বনাশ? উনি পড়ে যাচ্ছেন।

রঞ্জন : (রেলিং ধরে কাঁপতে কাঁপতে) এ কী হল?

জনৈক মহিলা: (হরিদয়ালকে) ডাক্তার তাড়াতাড়ি যান।

(হরিদয়াল ছুটে নেমে গেলেন।)

(নিচ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সাহেব বেঁচে নেই।' আরেকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে।')

অঙ্গনা : আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

(অঙ্গনা মেঝেতে বসে পড়ল। ওদিকে অলিকে ধরাধরি করে মহিলারা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন।)

রঞ্জন : (নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে) কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।

অঙ্গনা : কিন্তু আপনি বলুন। আপনিও দেখলেন, রাজপুত্র কিন্তু চূড়ায় উঠেছিল।

রঞ্জন : রাজপুত্র?

অঙ্গনা : আমার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র।

যবনিকা

চন্দ্রাহত

প্রাণকৃষ্ণ নাগের সঙ্গে আরেকবার দেখা হলে ভালো হত। আমার বিশ্বাস এই কলকাতা শহরেরই কোথাও তিনি এখনো আছেন এবং এখনো কোনো কোনো কৃষ্ণা একাদশীর মধ্যরাত্রিতে কোনো নিঃসঙ্গ পথচারীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে তাকে চমকিত করেন।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলগিন রোড থেকে হেঁটে দক্ষিণ দিকে ফিরছি, কালীঘাটে বাসায় পৌঁছতে হবে। রাত বারোটার কাছাকাছি, শেষ ট্রাম একটু আগে চোখের সামনে ঘণ্টা বাজিয়ে বেরিয়ে গেছে, দু'একটা বাস এখনো আসবে, কিন্তু এত গভীর রাত্রির বাসে সিনেমা এবং নিমন্ত্রণ ফেরত যাত্রীদের কী ভীষণ ভিড় হয়, ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন; হেঁটে আসতে ভালোই লাগছিল।

ট্রাম কোম্পানি এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কৃপায় মধ্যরজনীর কলকাতা শহর একটি বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগার বলে ভ্রম হয়। ট্রাম রাস্তার উপরে ছোটো বড়ো অসংখ্য তাঁবু পড়েছে, লাল লণ্ঠন জ্বালিয়ে কুলিরা কাজ করছে, শোলার টুপি ও খাকি হাফপ্যান্ট পরা ওভারশিয়ার সাহেব নতুন খোঁড়া গর্তগুলির মধ্যে টর্চ ফেলে কী যেন অনুসন্ধান করছেন।

আমি যদুবাবুর বাজারের সামনে পার হয়ে গেলাম। এর পরে রাস্তা অনেকটা ফাঁকা। শুধু কিছু দূরে ল্যাম্পপোস্টের গা ঘেঁষে একটি ক্লান্ত বারবনিতা এত রাত্রে কোথায় যাবে যেন কিছু স্থির করতে পারছিল না। আমাকে দেখে একটু থমকে সে একাধিকবার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর রাস্তা পার হয়ে বিপরীত ফুটপাথে চলে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না, বাঁদিকের গলি থেকে, নাকি মাটি ফুঁড়ে প্রাণকৃষ্ণবাবু, অবশ্য তখনো আমি তাঁর নাম জানিনে, বেরিয়ে এলেন।

প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পথের পাশের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেলে কলকাতার রাস্তা অন্ধকার হয়ে যায়, কর্পোরেশন পরিবেশিত আলোয় অন্ধকার এবং তার সঙ্গে চারদিকের দালানগুলির ছায়া বিশেষ দূর হয় না। ল্যাম্পপোস্টের অস্পষ্ট আলোয় আমি ভদ্রলোককে ভালো করে লক্ষ করার চেষ্টা করলাম। অন্ধকারে তাঁর চোখ দুটি বিড়ালের চোখের মতো ঝকঝক করছিল। এরকম অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর কারো চোখে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের

গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ধুতি এবং একটি ময়লা হাফশার্ট। আমার কেমন যেন তাঁকে উন্মাদ বলে মনে হল।

মাঝ রাত্রিতে ফাঁকা রাস্তায় উন্মাদের সম্মুখীন হওয়ার ভরসা ছিল না, আমি ইতিউতি তাকাতে লাগলাম। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু অতি সহজ কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি মিনিট পনেরো সময় হবে?"

প্রশ্নের মধ্যে যে মূঢ়তা ছিল, প্রশ্নকর্তার কণ্ঠস্বরে তা ছিল না। রাত বারোটায় অপরিচিত ব্যক্তিকে এই ধরনের অনুরোধ কেউ এই কণ্ঠস্বরে করে না। মাতাল বা উন্মাদের কণ্ঠস্বর নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেন এই ভাবে প্রাণকৃষ্ণবাবু সেই একই অনুরোধ আরেকবার করলেন।

অন্যের অনুরোধ রক্ষা না করাই আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে কোথাও আগ্রহাতিশয্য দেখলে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে আসাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত—অনেক ঘা খেয়ে আমার এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার সম্মতির জন্যে কোনো রকম অপেক্ষা না করেই প্রায় পাঁচ হাত সামনে এগিয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবু আমাকে একবার আপাদমস্তক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে আদেশের সুরেই যেন বললেন "আমার সঙ্গে আসুন"।

আমার কী হল ঠিক বোঝানো যাবে না, কেমন সম্মোহিতের মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। রাস্তা পেরিয়ে অন্য ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে আমরা একটা পশ্চিমমুখী গলি ধরে হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে এগুতে লাগলাম। এক তরফা কথা চলতে লাগল। প্রাণকৃষ্ণবাবু বক্তা, আমি নীরব শ্রোতা। কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল, সমস্ত কথা লেখা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই রকম হবে ঃ

"আমার নাম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নাগ। আমি এক মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। আমি জীবনে একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করেছি। প্রথম যেবার লক্ষ করি, তখন আমার বয়স দশ এগারো হবে। এক আত্মীয়ের বিয়েতে বহু দূরে এক গ্রামে গিয়েছি। বিয়ের দিন রাত্রিতে খোলা ছাদে অনেক লোকের সঙ্গে শুয়েছিলাম। সে দিন একাদশী, তিথিটা আমার মনে ছিল, কেন না, আমার মা বিধবা, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, সেদিন নিমন্ত্রণ খেতে খেতে বারবার মনে হচ্ছিল, মা উপোস করে আছেন। সে যা হোক, তখন রাত অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছে, বাসর ঘরের গোলমাল, একতলার ঘর থেকে—তাও আর আসছিল না, ব্যাপারের বাড়ির সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আসছে চারপাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের নিশ্বাসের শব্দ, কারো কারোর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার যেন কেমন

অস্বস্তি লাগছিল, কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না। সন্ধ্যারাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই জন্যেই হয়তো। ছাদের নিচে একটা বুনোঝোপ থেকে কয়েকটা জংলি ফুলের সোঁদা গন্ধ, চারদিকে অন্ধকার খোলা মাঠ, পুবের দিকে দূরে খেজুরের ঝোপের মধ্যে হলুদ মতো এক টুকরো চাঁদ উঠে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর চাঁদ, বৈশাখ মাস আকাশ একেবারে তারায় তারায় নিশ্ছিদ্র। মাঝে মাঝে দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, সে হাওয়া কলকাতায় ভাবা যায় না—মনে হয় ন্যাড়া ছাদ থেকে গড়িয়ে ফেলে দেবে। আমি গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় সেই প্রথম সেই দেখলাম, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, সেই অল্প বয়সেও ও রকম অবাক কখনো আর হই নি।

ঘটনাটা ভুলেই প্রায় গিয়েছিলাম। তখন বয়েস হয়েছে। আর একবার দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরব নৌকোয় করে রেল স্টেশনে এসেছি। এসে দেখলাম ট্রেন আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে গিয়েছে। সেই ছোটো স্টেশনে কোনো ওয়েটিং রুম নেই, দরকারও ছিল না, স্টেশনের পাশে রেল-ব্রিজের গা ছুঁয়ে একটা জাম গাছের সঙ্গে নৌকো বেঁধে ছইয়ের উপরে বসে আছি। সেদিন রাত্রিতেও ঘুম আসছে না। নিচে পাটাতনের উপরে মাল্লারা সব ঘুমিয়ে। কাছে দূরে শেয়ালগুলো ভয়ঙ্কর ডাকাডাকি করছে, হঠাৎ ডাক থেমে গেল, কয়েকটা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল, তাও নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সহসা আমার যেন কী মনে হল, কি যেন অনুমান করে, আমি নদীর ওপারে যেখানে সীমানা দেখা যাচ্ছে—তাকালাম। আবার সেই টুকরো চাঁদ আর সেই আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য বিস্ময়!

অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণবাবু কথাগুলো বলছিলেন। আমরা হাঁটছিলামও খুব তাড়াতাড়ি, বিশেষ করে প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রায় দৌড়িয়েই চলেন, এর মধ্যে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে আমরা প্রায় গড়ের মাঠের কাছে এসে গিয়েছি।

"চলুন একটা ফাঁকা জায়গায় না গেলে ব্যাপারটা আপনাকে দেখানো যাবে না। এই এত বাড়ির ভিড়ে কিছুই চোখে পড়বে না।" তিনি গড়ের মাঠের দিকে এগুতে লাগলেন।

সত্যি কী দেখে তিনি এত বিস্মিত হয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু , সে বিষয়ে কোনো আভাস তাঁর এতক্ষণের কথার মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে অলীকতার স্পর্শমাত্র ছিল না। তাঁকে অবিশ্বাস করাও সম্ভব হল না, এমন কী একবার এ কথাও জিজ্ঞাসা করলাম না যে, তিনি কী দেখেছিলেন আর আমাকে কী আজ এই রাত্রিতে, তাই দেখাতে চাচ্ছেন।

রেড রোডের পাশে এক জায়গায় কিছু রাবিশ স্তূপাকার করে রাখা। তার

ওপরে উঠে প্রাণকৃষ্ণবাবু আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকলেন। স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি এগিয়ে গেলাম. এবড়ো-খেবড়ো স্টোন চিপস, ইটের টুকরো। সেখানে উঠে প্রাণকৃষ্ণবাবু যেন খুশি হননি বলে মনে হল। তিনি একবার নামলেন পাশের আরেকটি স্তূপের ওপর উঠে ভ্রূকুঞ্চিত করে পুবদিকের আকাশে কী পর্যবেক্ষণ করলেন কিন্তু এবারও সন্তুষ্ট হলেন না। সম্মুখে একাডেমির বাড়ি প্রায় পঞ্চাশ গজ আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, এটাই যেন তাঁর বিরক্তির কারণ বলে আমার মনে হল।

হঠাৎ-ই প্রাণকৃষ্ণবাবু আরেকটি অদ্ভুত কাজ করলেন। "গাছে উঠতে পারেন," বলে আমার জন্যে কোনোরকম অপেক্ষা করা প্রয়োজন না মনে করে, সামনের একটি রাধাচূড়া গাছে তরতর করে উঠে গেলেন। এতক্ষণে আমার ভীষণ ভয় হল. নানা ভৌতিক. বীভৎস ঘটনা মনে পড়তে লাগল। কিন্তু তিনি আমাকে সংশয় বা ভয়ের কোনো সুযোগ না দিয়ে নিচের দিকের একটি ডালে এসে আমার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন, "আর সময় নষ্ট করবেন না, শিগগির উঠে আসুন।"

গাছে চড়া বহুদিন অভ্যাস নেই, এ বয়েসে কারো বিশেষ থাকে না। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু প্রায় জোর করে টানাটানি করে তুললেন, বুকের মাঝখানে আর হাঁটুতে দুএক জায়গায় ছড়ে গেল। উপরের একটা ডাল ধরে নিচের একটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করে পুব দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু দূরে একটা পুলিসের ঘেরাটোপ কালো গাড়ি চক্কর দিয়ে গেল, আমি একটু আঁৎকে উঠেছিলাম, এখানে এ অবস্থায়, পুলিস বা আদালতে এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চৌরঙ্গী রোডে নির্মীয়মান বিশাল একটি বাড়ির লোহার খাঁচার মধ্যে একটুকরো, ফালি হলুদ চাঁদ, সেটাই দ্রষ্টব্য বলে মনে হল। চাঁদটির একটু ওপরে দুটি শীর্ণ নক্ষত্র খুব কাছাকাছি।

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবুর শরীর ভীষণ জ্বরের রোগীর মতো কাঁপতে লাগল। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে, "দেখুন. দেখুন কেউ বিশ্বাস করে না।"

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। সেই ম্লান তারা দুটির খুব কাছে চাঁদ পৌঁছেছে, এবং কী এক অনিবার্য আকর্ষণে থর থর করে কাঁপছে, ভীষণ হাওয়ায় ঘুড়ি যে রকম টাল-মাটাল খেতে থাকে, চাঁদটিও সেই রকম ভয়ঙ্কর ভাবে দুলছে, যেন অবিলম্বে ছিটকিয়ে মহাশূন্যে পড়ে যাবে, তারপরে একটা কাটা ঘুড়ির মতো অনির্দেশ ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, অধীর উত্তেজনায় প্রাণকৃষ্ণবাবু

অস্থির হয়ে পড়েছেন, ভয় হল গাছ থেকে পড়ে না যান, তাঁকে এক হাত দিয়ে জাপটে ধরে রাখলাম। আমারও উত্তেজনা কিছু কম হয়নি, আমি লক্ষ করে দেখলাম, পা-দুটো কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি না, ঠকঠক করে প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হচ্ছে দুজনে স্তব্ধ এই নিচে পড়ে যাব।

প্রায় মিনিট তিনেক পরে সব স্থির হয়ে গেল; চাঁদটি যেন একলাফে দশ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে, কিছু নিচে সেই নক্ষত্র দুটি স্থির, স্তিমিতপ্রায়।

আমি বিস্ময়ে হতবাক এবং অভিভূত, গাছ থেকে দুজনে ধীরে ধীরে নেমে বাড়ির দিকে ফিরলাম। বেশি সময় নয় মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার, আলিপুরের জেল থেকে একটা ঘণ্টার আওয়াজ এল—রাত একটা কিংবা দেড়টা হবে। ফিরবার পথে প্রাণকৃষ্ণবাবুকে যেন বিশেষ কুণ্ঠিত মনে হল। তাঁর দুই চোখে একটু আগের সেই উগ্র উজ্জ্বলতা অনুপস্থিত, তাঁকে এখন আর মোটেই অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ধীর পায়ে হাঁটছেন, মনে পড়ল, আসার সময় তিনি প্রায় দৌড়ে এসেছিলেন। এখন মাথা নিচু করে হাঁটছেন যেন দশজনের একজন, অতি সাধারণ মার্চেন্ট অফিসের কেরানি, কোনো বিনা কারণে অন্যের সময় নষ্ট করে দিয়ে এখন কিঞ্চিৎ লজ্জিত। আমি তাঁকে কোনো প্রশ্ন করারই সময় পেলাম না, হঠাৎ বাঁয়ের একটা গলি ধরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে কোনো কথা না বলে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে চোখ ফেরাতে গিয়ে তাঁর চোখে চোখ পড়ল, এইবার তার স্তিমিত চোখ, চোখের চাহনি আমার কেমন যেন বেশ পরিচিত মনে হল। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারলাম না।

প্রাণকৃষ্ণবাবু অদৃশ্য হওয়া মাত্র বিদ্যুতের মতো আমার মাথায় খেলে গেল এই চোখদুটি আমি এই মাত্র দেখেছি। সেই তারা দুটি যেখানে পৌঁছে একটু আগে চাঁদ থর থর করে কাঁপতে দেখেছি, তার সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণবাবুর চোখের তারা দুটির আশ্চর্য সাদৃশ্য, অস্বাভাবিক মিল রয়েছে। একই স্তিমিত বিষণ্ণতা প্রাণকৃষ্ণবাবুর চোখের তারায়। বাসায় ফিরে তাড়াতাড়ি করে ছাদে উঠে পুব দিকের আকাশে তাকিয়ে সেই তারা দুটির খোঁজ করলাম। কিন্তু আকাশের হাজার হাজার তারার মধ্যে সেই বিশিষ্ট তারা দুটি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে খুঁজে পেলাম না।

এর পরেও এই কাহিনীর কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রয়েছে। পর দিন সকালে কী একটা চিঠি লিখতে বসে তারিখের জন্য দেয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাতেই দেখলাম, গতকাল কৃষ্ণা একাদশী গেছে, এক ফালি কালো চাঁদের গায়ে ছোটো ছোটো হরফে একাদশী লেখা, গতকালের তারিখের জায়গায়। মনে পড়ল, প্রাণকৃষ্ণ নাগ যে প্রথম রাত্রির বর্ণনা আমাকে দিয়েছিলেন সেটিও এই একই তিথির একই

পক্ষের রাত্রি, দ্বিতীয় রাত্রির তিথি পক্ষের কথা তিনি অবশ্য আমাকে কিছু উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু পরবর্তী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে বাড়ির ছাদে একা একা বসে পুবদিকের আকাশে চাঁদ ওঠার সময় বিশেষ যত্নের সঙ্গে লক্ষ করে দেখেছি, সেরকম কিছুই ঘটেনি। স্থির, নিঃশব্দ, অচঞ্চল গতিতে চাঁদ আকাশে উঠেছে, সেই অস্বাভাবিক স্তিমিত তারা দুটিও আর চোখে পড়ে নি।

পরে একদিন অধ্যাপক উৎপল সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত কথা বলেছিলাম। আমার ছোটো ভাই তাঁর প্রিয় ছাত্র, আমাকে তিনি অবিশ্বাস করেন নি। জীবনের আধাআধি সময় তিনি চোখে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ দেখে দেখে চোখে ছানি পড়িয়েছেন। সব শুনে তিনি মৃদু হেসে, যদি আমার সঙ্গে আর কোনো দিন কোথাও প্রাণকৃষ্ণবাবুর দেখা হয়, তাঁর কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছেন। আমি যখন উঠছি তিনি একটি অপরিচিত ইংরেজি শব্দ স্বগতোক্তি করলেন, পরে বাড়ি ফিরে কৌতূহলবশত অভিধান খুলে দেখেছি, শব্দটার অর্থ চন্দ্রাহত, অর্থাৎ উন্মাদ। উন্মাদের নাড়ির সঙ্গে চাঁদের নাকি কোথায় এক সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণকৃষ্ণ নাগের কথা সঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি নিজেকে জানি, আমি উন্মাদ নই। হয়তো সব কৃষ্ণা একাদশীর তিথিতে নয়, হয়তো বহুদিন পরে পরে কোনো এক রাত্রিতে আকাশের চাঁদ কোনো এক অজ্ঞাত আকর্ষণে মহাশূন্যে দুটি ম্লান নক্ষত্রের পাশে কিছুক্ষণ ধরে অস্থির দুলতে থাকে, কোনোকালে কারো নজরে পড়ে না। বুদ্ধির অতীত কোনো কারণে, সেই সব নিশীথে এই পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষ সেই রহস্যের আন্দোলন তার রক্তে অনুভব করে অস্থির জেগে থাকে। আমি ছাড়া হয়তো এই রাজ্যের আর কোনো সাক্ষী নেই। আর কারোর সঙ্গে কি কোনো রাত্রিতে প্রাণকৃষ্ণ নাগের সঙ্গে দেখা হয় না?

আর তাঁর চোখের তারার সেই রহস্য, তারো কি কোনো সমাধান নেই?

আরশোলা এবং নিদারুণ বার্তা

রুদ্রনারায়ণ আচার্য মহাশয় বিভাগ পূর্ব বঙ্গদেশের এমন একটি জেলায় বাস করিতেন যেখানে আরশোলাকে তেলাচোরা বলা হইয়া থাকে। আরশোলাই আমাদের বর্তমান গল্পের বিষয়বস্তু। তাই পূর্বাহ্নে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিয়া লইতে হইতেছে।

প্রথমে আচার্য মহাশয়ের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। দেশে আচার্য মহাশয়ের বিরাট নারিকেল এবং সুপারিবাগান ছিল। নারিকেল এবং সুপারিবাগানের সুবিধা এই যে, এই প্রকার ফসল বৎসর বৎসর চাষ করিতে হয় না। কোনো পরিশ্রম নাই, লবণাক্ত মাটির আর্দ্র-সৌজন্যে অপর্যাপ্ত ফলন হয় এবং যথাকালে শুকাইয়া মাটিতে পড়ে। কোনো এক পরিশ্রমী পূর্বপুরুষের কল্যাণে বৎসর বৎসর পায়ের উপর পা তুলিয়া বংশধরদের চলিয়া যায়। যাহা কিছু পরিশ্রম বা অর্থব্যয় এই ফসলগুলি পাড়িয়া নামাইবার।

আচার্য মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। এই নামাইবার জন্যও তিনি কোনোরূপ পরিশ্রম বা লোকনিয়োগ করিতেন না। যতদিন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকরী আছে, শুকাইয়া ঝুনা হইলে নারিকেল-সুপারি আপন আগ্রহেই ভূমিতলে খসিয়া পড়িবে, তাহার জন্য অপব্যয় করা একান্তই নিরর্থক।

এই সময়ে একবার তাঁহাকে আয়কর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিতে হয়। আবেদন ছিল, এবার আয় ভালো হয় নাই, কিছু আয়কর পরবর্তী বৎসরে প্রদানের অনুমতি দেওয়া হউক। আয়কর সাহেব দেখিলেন, লোকটি আয়কর কমাইতে বলিতেছে না, শুধু সময় চাহিতেছে, কী মনে হইল, প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার ফসল কম হলে আয়কর কম হবে, তুমি সময় চাও কেন, আয়কর কমাবার জন্য প্রার্থনা করো।'

আচার্য মহাশয় ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন, 'ফসল ঠিক কম হয়েছে তা নয়, তবে এবার হাওয়া বড় কম।'

সাহেব অবাক, 'হাওয়া কম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', আচার্য মহাশয় জানাইলেন, 'এই হাওয়া লেগে শুকনো নারকেল-সুপারি মাটিতে পড়ে, এবার সেটা একটু কম পড়ছে।'

ইহার পরে কী হইয়াছিল তাহা এই কাহিনীর বিষয় নহে, তবে এই একটি

প্রাক্তন ঘটনার উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে, ইহাতে শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ আচার্যের সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

দেশ বিভাগের পরে আচার্য মহাশয় প্রথমেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়েই টালিগঞ্জ থানার অফিসঘরে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

আমরা ছাদে কাপড় মেলিয়া দিলে বিকালে যখন শুকাইয়া যাইত তখন আমাদের পরবর্তী প্রতিবেশী গোপনে সেগুলি একটি হোসপাইপ দিয়া ভিজাইয়া দিতেন। ইহাতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইত এবং প্রথম প্রথম সবই সহ্য করিতাম, বস্তুত বুঝিতেই পারিতাম না কেন আমাদের বস্ত্রাদি সারাদিনের রৌদ্রেও শুকাইত না। অবশেষে একদিন আমার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় মাতুলালয়ে বেড়াইতে আসিয়া নিকট প্রতিবেশীর এরূপ গর্হিত কার্য আবিষ্কার করিয়া ফেলে। আমরা উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রতিদিন রাত্রে পাঁচ ফোড়নের তরকারি খাইতে লাগিলাম। সায়াহ্নবেলায় যখন প্রতিবেশীদের বাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষক আসিতেন, সেই সময়ে তিনি যে ঘরে বসিয়া সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতেন সেইমুখি আমাদের বারান্দায় যথা-সমারোহে পাঁচ ফোড়নের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইত। ব্যঞ্জনের ঝাঁজে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের নাসারন্ধ্রে এবং কণ্ঠদেশে যে আকুতি উপস্থিত হইত তাহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও সঙ্গীত ওষ্ঠাগত হইত না। কিন্তু ইহাতেও কিছু হইল না। একদিন আমাদের অসাবধানতার সুযোগে শীতের অপরাহ্নে তাহারা আমাদের লেপগুলি ভিজাইয়া দিল।

বাধ্য হইয়া থানায় ডায়েরি করিতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম এক প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবল আবেগে ফুঁসিতেছেন। তাঁহার সামনে মোটা ধুতি ও নীল কোট পরিধানে এক ব্যক্তিকে পুলিস ধরিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির এক হাতে বর্শা এবং অন্য হাতে একটি প্রজ্বলিত পেট্রম্যাক্স। কিছুক্ষণ পরে বুঝিলাম এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তির সঙ্গী বা রক্ষী। প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ আচার্য মহাশয় কিছুতেই সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় পেট্রম্যাক্স এবং আলোবাহক একজনকে অগ্রবর্তী না রাখিয়া বাহির হইতে পারেন না, ইহা তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। তদুপরি ইহা দ্বারা আচার্য মহাশয়ের মতে, কোনোরকম আইনভঙ্গ হয় নাই। বর্শা অস্ত্র আইনে পড়ে না। বর্শার ফলা মাত্র ছয় ইঞ্চি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু যুক্তি তিনি প্রবল রোষে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে আমাকে সাক্ষী মানিতে লাগিলেন।

থানা অফিসার বিবেচক ছিলেন। সব শুনে তিনি আচার্য মহাশয়কে বলিলেন, 'কলকাতা, রাস্তায় পেট্রম্যাক্স নিয়ে ঘুরবেন না, আর এখানে রাস্তায় সাপ, শুয়োর,

বুনো শেয়াল কিছুই নেই যে একজন বর্শাবাহী লাগবে। আপনি আজ যান কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম করবেন না।'

কী ভাবিয়া আমিও সেদিন আর থানায় কোনো ডায়েরি না করিয়া চলিয়া আসিলাম। আচার্য মহাশয়, তাঁহার রক্ষী এবং আমি তিনজনেই একসাথে রাস্তায় নামিলাম।

পথে চলিতে চলিতে আলাপ হইল। আচার্য মহাশয় আর যাহা হউক লোক খারাপ নহে। তাঁহার কথাবার্তায় বুঝিলাম যে, তাঁহার কলিকাতায় থাকিবার মোটেই বাসনা নাই। দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গমা চলিতেছে, সেখানেও ফেরা সম্ভব নহে, কলিকাতারই কিছু দূরে গঙ্গাতীরে কোথাও বাড়ি করিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিতে চান।

কী কারণে জানি না, আচার্য মহাশয় আমার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন, এখনো করেন, নিয়মিত তাঁহার খবর পাই।

আচার্য মহাশয় সম্পর্কে এই পর্যন্ত পাঠ করিয়া যদি কাহারো কোনো ভুল ধারণা গঠিত হইয়া থাকে তাঁহাকে এখনই বলিয়া রাখা ভালো, আচার্য মহাশয়ের বুদ্ধির অভাব কখনোই ছিল না।

বর্ধমানের দিকে গঙ্গার ধার ঘেঁষিয়া বিঘা দেড়েক জমি লইয়া বাড়ি প্রস্তুত করিলেন। বাড়ির পিছনে গঙ্গা-সংলগ্ন নিচু জমিতে প্রথমে কচুর চাষ করিলেন, প্রচুর কচু ফলিল। কিন্তু একটি কচুও বিক্রয় না করিয়া, না খাইয়া সেখানে পঞ্চাশটি শূকর কিনিয়া পুষিতে লাগিলেন। শূকরের অত্যাচারে এবং নোংরায় বাড়ির এবং পাড়ার লোক অস্থির হইয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি শূকরের দুগ্ধের কারবার শুরু করিলেন। প্রচারপত্রে লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইলেন শূকর-দুগ্ধ যে-কোনো দুগ্ধ হইতে বেশি উপকারী। কিন্তু একাধিক কারণে এই ব্যবসা চলিল না। প্রথমত বহু বিজ্ঞাপন দিয়াও শূকরী দুহিবার যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেল না। অবশ্য আচার্য মহাশয় শেষভাগে নিজেই দুহিতে লাগিলেন কিন্তু ক্রেতার বড়ো অভাব হইল। বিশেষ কেহ শূকরের দুগ্ধ পানে উৎসাহী হইল না।

ফলে কচুক্ষেত এবং শূকরপাল অন্তর্হিত হইল। এইবার ওই নিচু জমিতে তিনি পেঁপে গাছ লাগাইলেন। প্রচুর ফলিল। কাঁচা পেঁপেগুলি কাটিয়া রোদ্রে শুকাইয়া তারপর চূর্ণ করিয়া এক প্রকার মশলা প্রস্তুত করা হইল। নাম দেওয়া হইল 'হজমি মশলা' এই দুষ্ট পাকস্থলীর দেশে সেই মশলা কেন যে জনপ্রিয় হইল না তাহা অনুধাবন করিতে একান্তই ব্যর্থ হইয়া আচার্য মহাশয় প্রায় ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন।

শূকর দুগ্ধ এবং হজমি মশলা উভয় দ্রব্যই আমাকে খাইতে হইয়াছিল। আচার্য মহাশয়ের অনুরোধ এবং আগ্রহে আমি তাঁহার বাড়িতে একাধিকবার গিয়াছি।

সম্প্রতি এক পত্র পাইয়া জানিতে পারি যে, তিনি এখন একটি বিশেষ গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। পত্রের পরে পরেই কয়েকটি এক্সপ্রেস চিঠি এবং দুটি তারবার্তা পাইলাম, আমাকে চলিয়া আসার জন্য বিশেষ অনুরোধ। বিগত কয়েকবারের অভিজ্ঞতা ভালো নহে, তবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

আচার্য মহাশয়ের বাড়ির সদরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী করতোয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আচার্য মহাশয় চিরকুমার। এই বৃদ্ধ বয়সে এই ভ্রাতৃ-কন্যাটি তাঁহার একচ্ছত্র সঙ্গিণী। আমাকে দেখিয়া করতোয়া স্মিতহাস্য করিল, 'আপনি তাহলে এসে গেলেন?' সে আমাকে কয়েকবারই দেখিয়াছে, জ্যেঠামহাশয়ের এই অনুগ্রাহকটিকে বিশেষ মমতার সঙ্গে দেখে।

আমি প্রশ্ন করিলাম—'এবার কী?'

মৃদু হাসিয়া করতোয়া জবাব দিল, 'আরশোলা'। ইতিপূর্বে শূকর দুগ্ধ এবং হজমি মশলা খাইয়া গিয়াছি, আরশোলা শুনিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভাবিলাম তখনই ফিরিয়া যাই। করতোয়া বোধহয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিল, বলিল, 'ভয় নেই, আসুন। আরশোলা খেতে হবে না।'

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইব এমন সময় আকস্মিক গুলির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। তাকাইয়া দেখি একতলার চিলেকোঠার ছাদে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আচার্য মহাশয় বন্দুকের আওয়াজ করিতেছেন। কী লক্ষ করিয়া করিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

করতোয়াকে আবার প্রশ্ন করিতে হইল। করতোয়া, বলিল, 'জ্যেঠামশায়, পাক্ষিক 'নিদারুণ বার্তা'র সম্পাদক নিবারণ সামন্তের বাড়ির দিকে ফাঁকা আওয়াজ করছেন। 'নিদারুণ বার্তা'য় ওঁর একটা থিসিসের যাচ্ছেতাই সমালোচনা করা হয়েছে। সে যাহোক, ভয়ের কিছু নেই।'

একটু পরেই আচার্য মহাশয় নামিয়া আসিলেন, ভীষণ উত্তেজিত। সেই টালিগঞ্জ থানায় প্রথম দিন যেরকম দেখিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া কিছুটা শান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া ভিতরের ঘরে গিয়া একতাড়া কাগজ লইয়া আসিলেন। তাহার পরে করতোয়াকে ডাকিলেন, 'করতোয়া, মা এটা একবার পড়ে শোনা তো।'

পিতৃব্যের অজ্ঞাতে আমার দিকে তাকাইয়া একটু মুচকি হাসিয়া নিয়া করতোয়া পড়িতে লাগিল। প্রবন্ধটির নাম 'কেশ-চর্চা এবং আরশোলা'। অত দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া লাভ নাই। সারাংশ এইরকম ঃ

'আরশোলাকে কোথাও কোথাও তেলাচুরা বলা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই

যে, ইহা মাথা হইতে নিদ্রাকালে তেল শুষিয়া লয়। অনেক সময় চুলও খাইয়া ফেলে। যে স্থানের চুল খায় সেখানে আর চুল গজাইতে চাহে না। ইহা প্রায় সকলেই জানেন।

আরশোলার যখন এবম্বিধ প্রকৃতির পরিচয় মানুষ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, ইহাকে অনায়াসেই মানুষের কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে। রজক, ক্ষৌরকার ইত্যাদি বাবদ প্রত্যেক গৃহস্থেরই এদেশে যথেষ্ট ব্যয় হয়। কিন্তু বিলাত ইত্যাদি দেশে কাপড় কাচিবার যন্ত্র, এমনকি দাড়ি কামাইবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে।

আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে এইগুলি খুবই *ব্যয়সাধ্য। সকলের ব্যবহার* করিবার আর্থিক যোগ্যতা নাই।

জীব-জন্তুকে শিক্ষিত করিয়া নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা যায়। বানর, হাতি, ঘোড়া, কুকুর এমনকি পাখিও নানা কাজ করিতে পারে। আরশোলাকেও উপযুক্ত ট্রেণিং দিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কার্য অসম্ভব নহে। যথাসময়ে মাথায় ছাড়িয়া দিলে উপযুক্ত পরিমাণ চুল খাইয়া লইলেই চুল কাটার কাজ হইয়া যাইবে। প্রথম দিকে শিশুদের মাথায় ছাড়িয়া এবং গায়ে সুতা বাঁধিয়া মাথায় ঠিকমতো চালাইলে পরে ভালো কাজ পাওয়া সম্ভব।

এক-একটি আরশোলা গড়ে নয়মাস বাঁচে, অর্থাৎ একটি সামান্য আরশোলা নয়বার চুল কাটা এবং দুইশত সত্তর বার (যাঁহারা দৈনিক দাড়ি কামান) দাড়ি কামানোর খরচ বাঁচাইতে পারিবে।.....

করতোয়া যখন প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছিল, প্রত্যেক অংশ শুনিতে শুনিতে আচার্য মহাশয়ের মুখভাব উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আমার প্রায় কিছুই বলিবার ছিল না। শুধু জানিতে চাহিলাম, 'এইরূপ ট্রেণিংপ্রাপ্ত কোনো আরশোলা......'

আচার্য মহাশয় আমাকে বাক্য সম্পূর্ণ করিতে দিলেন না। একটি কাঁচের বাক্স বারান্দা হইতে লইয়া আসিলেন। তাহাতে দশ-পনেরোটি আরশোলা এবং একটি প্লেটে অল্প একটু দুধ রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্লেটে কি, দুধ?'

উপরের ছাদে আরেকটি খাঁচা আনিবার জন্য আচার্য মহাশয় উঠিয়া গিয়াছিলেন, করতোয়া ছিল, সেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ, দুধ, দুধ খেলে ওদের বুদ্ধি হবে।' আচার্য মহাশয় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে করতোয়ার কথা ধরিলেন, 'দুধ হল স্নেহ পদার্থ, এতে বুদ্ধি হবে। তবে তেলই ওদের খাদ্য, তবে সেটা দিলে মাথার চুলের তেল আর ওরা খেতে চাইবে না।'

সন্দেহ নাই,অকাট্য যুক্তি। কিন্তু স্থানীয় পাক্ষিক 'নিদারুণ বার্তা'র মূর্খ সম্পাদক

নিবারণ সামন্ত আচার্য মহাশয়ের এই গবেষণাকে পাগলামি বলিয়া হাসি তামাসা করিয়াছে। আজ সকালেই 'নিদারুণ বার্তা'র বর্তমান সংখ্যা আচার্য মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। পাঠ করিয়াই ছাদে উঠিয়া নিবারণ সামন্তের বাড়ির দিকে মুখ করিয়া তিনবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছেন।

আরশোলার বুদ্ধি এবং নিবারণ সামন্তের বুদ্ধির অভাব বিষয়ে আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সেইদিন সারা দুপুর আলোচনা করিয়া বৈকালে করতোয়ার সঙ্গে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিলাম। কথা দিয়া আসিলাম, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আবার আসিব। আরশোলা দিয়া চুল কাটাইয়া যাইব। ততদিনে আরশোলাগুলি উপযুক্ত শিক্ষিত হইবে এইরূপ আশা করা গেল।

কিন্তু দুই সপ্তাহ লাগিল না, আচার্য মহাশয় গুরুতর অসুস্থ, করতোয়ার নামে প্রেরিত এক তার পাইয়া সাতদিনের মধ্যে আরেকবার যাইতে হইল।

আচার্য মহাশয়ের বিরূপ সমালোচনা করিবার পর নিবারণ সামন্ত একটু মর্মপীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাহা ছাড়া 'নিদারুণ বার্তা'র নয়জন ক্রেতার মধ্যে আচার্য মহাশয় একজন। তাই তিনি একদিন আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে একটি আপোস-রফায় আসিবেন ইচ্ছায় একদিন তাঁহার বাড়িতে আসেন। সামন্ত মহাশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় এইবার আরশোলা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকেন। সমান্তকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় প্রথমে উত্তেজিত হইলেও পরে তাহার আচরণের পরিবর্তন দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। আরশোলাগুলিকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা খাঁচা খুলিয়া দেখাইতে যান। কিন্তু ইতিমধ্যে দুধ-ক্ষীর ইত্যাদি স্নেহ পদার্থ খাইয়া আরশোলাগুলি যে ভীমরুলের প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে, ইহা সামন্ত বা আচার্য মহাশয় কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। খাঁচা খোলামাত্র পনেরোটি দুর্দান্ত আরশোলা তাঁহাদের দুইজনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। করতোয়া ঝাঁটা লইয়া ছুটিয়া না আসিলে সেই দিনই বোধহয় এই দুইজনকেই আরশোলার দংশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

বর্তমানে সামন্ত ও আচার্য মহাশয় দুইজনেই স্থানীয় হাসপাতালে পাশাপাশি শয্যায় চিকিৎসিত হইতেছেন। দুইজনেরই মুখ এত ফুলিয়া গিয়াছে যে প্রথম দর্শনে কে নিবারণ সামন্ত আর কে রুদ্রনারায়ণ আচার্য ঠাহর করা কঠিন।

করতোয়াকেও একটি আরশোলা দংশন করিয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছু হয় নাই, শুধু গণ্ডদেশ রক্তিম ও স্ফীত হইয়াছে।

চতুরঙ্গ

আমার জীবনে ভীষণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি একটা লোকের হাত কিছুতেই এড়াতে পারছি না।

অথচ লোকটা আমার কেউ নয়, আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, কখনো কিছু ছিল না। এই লোকটার কাছে আমার কোনো ধারদেনা নেই। লোকটারও নেই আমার কাছে। ধারের কথা বলি, একবার এক কাবুলি ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম কিন্তু তিনিও আমার পিছনে এমন করে লাগেন নি।

উত্তমর্ণ ছাড়া এমনভাবে পিছনে লেগে থাকতে পারে ইন্সিওরেন্সের দালাল, বিয়ের ঘটক কিংবা পুলিসের কেউ।

কিন্তু এই লোকটা আমার সম্মুখে একেক সময় একেক ছদ্মবেশে দেখা দিচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোনো ইন্সিওরেন্সের দালাল ছদ্মবেশে আক্রমণ করেছে এমন শুনিনি। অনেকে আত্মীয় কিম্বা বন্ধুর বেশে আসে বটে। একেবারে ছদ্মবেশী দালাল, যতদূর মনে হয় অসম্ভব।

বিয়ের ঘটক? কিন্তু বিয়ের ঘটক আমার কি করবে? গৃহে আমার নবীনা স্ত্রী, দুর্দান্ত পুত্র। হিন্দু কোড্ বিল পাশ হওয়ার পরে কী আর বিয়ের ঘটকেরা বিবাহিত ব্যক্তির অনুসরণ করে?

তা হলে বাকি থাকে পুলিসের স্পাই। পুলিস কী জন্যে? আমি অতি নিরীহ, সাদাসিধে মানুষ। সজনের ডাঁটা চুষে বউয়ের শাড়ি ইস্ত্রি করে, সস্তা সিগারেট খেয়ে গলা ব্যথা হলে নুন জল দিয়ে গার্গল করে নেহাত গোবেচারার মতো বেঁচে আছি। কোনো বেআইনি কিছু করি এমন সাহস নেই। একবার একটা অন্ধ ভিখিরির থালায় একটা অচল সিকি দিয়ে বিশ পয়সা তুলে নিয়েছিলাম, জ্ঞানত এই হল সবচেয়ে বড়ো পাপ কাজ। কিন্তু সেই জন্যে পুলিস আমাকে ওয়াচ করতে যাবে কেন?

কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এ বড়োই বিপদ হয়েছে আমার।

লোকটাকে প্রথম দেখি হাজরা পার্কের সামনে।

একটু আগে বলেছি আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। সে সদ্য কথা বলতে শিখছে। প্রথমেই যে পাঁচ-সাতটি শব্দ সে উচ্চারণ করতে শেখে তার মধ্যে একটি

হলো 'বাবা' এবং অন্য একটি 'ট্যাক্সি'। এই শব্দ দুটি সে অধিকাংশ সময়েই একত্রে উচ্চারণ করে।

'বাবা, ট্যাক্সি', তার এই শব্দ দুটির একত্রে মানে হল, 'বাবা, ট্যাক্সি ডেকে এনে চড়াও', অথবা 'বাবা ট্যাক্সি হও।'

আমি গরিব মানুষ, সদাসর্বদা ছেলেকে ট্যাক্সি চড়াতে পারি না তাই নিজেকেই ট্যাক্সি হতে হয়। ট্যাক্সি হওয়া মানে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে, রোদ হোক, বৃষ্টি হোক দিন দুপুর বা মধ্যরজনী হোক মাইল দেড়েক ঘুরে আসা, কোলে বা কাঁধে নিলে চলবে না; কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

সেদিন বাড়ি থেকে ট্যাক্সি হয়ে বেরিয়ে ছেলেকে কাঁধে নিয়ে মাইল খানেক হেঁটে হাজরা পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আমার পাশেই লোকটা চানাচুরের প্যাকেট নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে বেচছে। তারস্বরে চেঁচিয়ে খদ্দের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে, 'চানাচুর, এ বাবু চানাচুর, চানামোহনকা চানাচুর।'

চানাচুরওয়ালার নাম চানামোহন। নাম শুনে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম লোকটাকে। নিতান্ত সাধারণ হিন্দুস্থানী চেহারা, গলায় মাদুলি, কাঁধে গামছা, গোয়ালাদের মতো গোঁফ।

খাব মনে করে এক প্যাকেট চানাচুরও কিনে ফেললাম। কিন্তু ছেলেটা খেতে দিল না, কখন কাঁধের উপর থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই কুড়মুড় করে খেতে লাগল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরছি। মোড়ের মাথায় বাস থেকে নামতেই নামলো তুমুল বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি বারান্দার নিচে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

বৃষ্টির জন্যে গাড়ি বারান্দাটার নিচে খুব ভিড় হয়ে গেল। একটু পরে দেখি সেই ভিড়ের মধ্যে হাজরা পার্কের সামনের সেই চানামোহন ঘুগনি বেচছে। দুদিন আগে এই লোকটা চানাচুর বেচছিল। এখন ঘুগনি বেচছে। সে যা হোক, আমিও দশ পয়সার ঘুগনি কিনে খেলাম।

এই পর্যন্ত ভালোই ছিল। চানাচুরওয়ালার ঘুগনিওয়ালা হতে আপত্তি নেই। যদিও আমার মনে খটকা লেগেছিল ব্যাপারটায়। কেন না এমন তো খুব বেশি দেখি না।

পরের দিনই রবিবার। সকালবেলায় বাসায় বসে আছি।

আমার স্ত্রী এসে বললেন, 'রাস্তা দিয়ে রঙ মিস্ত্রি যাচ্ছে। ডাকব?'

বাড়িতে কয়েকটা জানলা দরজা বহুদিন হল ফেটে, চটে আছে : রঙ করানো দরকার, বললাম 'ডাকো।'

রঙ মিস্ত্রি আসতে দেখি চানামোহন, সেই গোঁফ, সেই মাদুলি, সেই কাঁধে গামছা, তাকে দেখে অবাক হলাম। কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারল কি না কে জানে?

সন্দেহ নিরসন করার জন্যে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি নাম তোর?'

লোকটা গোঁফের ফাঁকে মৃদু হেসে বলল, 'ফাগুলাল।'

এ যে চানামোহন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন বলছে ফাগুলাল। তার উপরে প্রথমে চানাচুরওয়ালা, তারপরে ঘুগনিওয়ালা এবং এখন একেবারে রঙ মিস্ত্রি, পুরো ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।

তবু যতই সন্দেহ বা দুশ্চিন্তা হোক না কেন রঙ মিস্ত্রিকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে এত কথা ভাববার অবসর নেই. সুতরাং দাম-দর ঠিক করে ফাগুলালকে জানলা রঙ করতে বলা হল।

রঙ লাগানোর জন্যে ফাগুলাল পুরোনো কাপড় চাইল, আমার স্ত্রী একটা পুরোনো ধুতি থেকে প্রায় অর্ধেক ছিঁড়ে তাকে দিল।

রঙ লাগাতে লাগল ফাগুলাল। একটা টিনের ছোটো থালায় করে রঙ নিয়ে এসেছে, একেবারে তৈরি রঙ; সেই রঙ ছেঁড়া ধুতির টুকরো দিয়ে ঘষে ঘষে জানলায় লাগল। আমি এক মুহূর্তও তাকে চোখের আড়াল করলাম না, ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেন না এর কি মতলব, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে না।

ভালোই রঙ করল কিন্তু ফাগুলাল। রঙ করে টাকা পয়সা নিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

এর-ও কয়েকদিন পরে।

আবার একদিন আমি ট্যাক্সি হয়ে বেরিয়েছি, কাঁধে পুত্র তবে সঙ্গে সেদিন স্ত্রীও আছেন।

যেতে যেতে হঠাৎ আমার স্ত্রী থমকে দাঁড়ালেন, 'এই দ্যাখো আমাদের সেই রঙ মিস্ত্রি এখানে কী সুন্দর বাটিকের ব্লাউজ পিস বেচছে!'

সত্যিই সেই লোকটা। গলায় মাদুলি, কাঁধে গামছা। গোয়ালাদের মতো গোঁফ সহাস্য বদনে কয়েকটা বাটিকের ছাপা ব্লাউজ পিস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটার গোঁফের ফাঁকের ওই হাসি আমার আরো রহস্যময় মনে হল। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যেন একটা বিরাট চক্রান্ত বা যড়যন্ত্র যা ওই জাতীয় কিছুর আভাস রয়েছে।

আমার পক্ষে আর নিজেকে দমন করা সম্ভব হল না। আমি স্পষ্টই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমিই এই দুদিন আগে আমাদের বাড়িতে জানলা রঙ করতে গিয়েছিলে না?'

লোকটা নির্বিকার ভাবে বলল, 'তা হবে।'

আমি আরো উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তোমার নাম কি?

লোকটা এবারো নির্বিকার ভাবে জানাল, 'বেনারসীপ্রসাদ।'

সর্বনাশ, ফাগুলাল থেকে আবার বেনারসীপ্রসাদ হয়ে গেল। এই রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে। আমার কেমন যেন রোখ চেপে গেল।

ইতিমধ্যে লোকটার হাতে যে দু তিনটি বাটিকের ব্লাউজ ছিল, একটি বাদে সবই বিক্রি হয়ে গেছে। শেষ ব্লাউজ পিসটিকে আর স্ত্রী ছাড়লেন না, নিজেই কিনে নিলেন।

এইবার লোকটা ফাঁকা। আমি সুযোগ ছাড়লাম না। ছেলে কাঁধে নিয়ে লোকটার পিছে পিছে হাঁটতে লাগলাম। একটু পরে হাঁটা থামিয়ে লোকটা একটু বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, বাবু?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন তো বাটিকের ব্লাউজ পিস বেচলে, এরপর কি করবে?'

লোকটা বলল, আর নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। আবার যদি করতে হয় তবে চানাচুর থেকে আরম্ভ করতে হবে।

'মানে?' আমার ভ্রূ-কুঞ্চনের জটিলতা দেখে লোকটা একটু প্রাঞ্জল হল।

আমাকে আর কষ্ট করে প্রশ্ন করতে হল না। লোকটাই বুঝিয়ে বলল, প্রথমে চানাচুর বেচছিলাম, এমন সময়ে জোর বৃষ্টি এসে সব ভিজিয়ে দিল। তখন কী আর করব, সব ঘুগনি হিসেবে বেচে দিলাম।'

আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলাম বললাম, 'তারপর।'

'তারপর আর কী, লোকটা বলে চলল, 'ঘুগনি বেচবার পর যেটুকু লেগে রইল থালায়, ওই তেল, মসল্লা, ডালের গুঁড়ো মতো কাদা কাদা, সেটা আর নষ্ট করে লাভ কী, একটা কৌটোয় ভরে পরের দিন ওইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রঙ মিস্ত্রি হয়ে। আপনার বাড়িতেই তো রঙ করে দিয়ে এলাম।

'এ্যাঁ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল আমার চোখ। কিন্তু বেশি বিস্মিত হবার আর সময় নেই। কাঁধের উপর ছেলে এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তদুপরি স্ত্রী-কেও কাছাকাছি দেখছি না। তিনি যে ইতিমধ্যে কোথায় গেলেন?

যাই হোক, আমার আর একটি প্রশ্নই বাকি ছিল। এইবার জিজ্ঞাসা করলাম ওই বাটিকের ছাপা কাপড় কোথায় পেলে?'

লোকটা হাসল, 'কোথায় আর পাবো? আপনারাই তো দিলেন সেই যে ছেঁড়া ধুতি দিলেন জানলায় রঙ লাগানোর জন্য।'

'ছেঁড়া ধুতি?' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, সেইটাই রঙ লাগানো হয়ে গেলে রোদে শুকিয়ে তিন টুকরো করে বেচে দিলাম।' 'তাড়াতাড়ি জবাব শেষ করে লোকটা আবার হাঁটা শুরু করল।

আমাকেও ফিরতে হবে। কিন্তু কী একটা খটকা যেন রয়ে গেল কোথায়? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইতস্তত করতে লাগলাম।

এমন সময়ে লোকটা নিজেই কেন যেন ফিরে এল। এসে আমাকে বলল, 'দেখুন বাবু, আমার নাম বেনারসীপ্রসাদ নয়, আসলে আমার নাম ভজুয়া।'

এই স্বীকারোক্তিতে আমি অবাক হলাম, বললাম, 'তাহলে বেনারসীপ্রসাদ বললে কেন?'

লোকটা হেসে বলল, 'তখন কাপড় বেচছিলাম কিনা।' এইবার সব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। যখন কাপড় বেচে তখন বেনারসীপ্রসাদ, যখন রঙ লাগায় তখন ফাগুলাল, যখন চানাচুর বেচে তখন চানামোহন, যখন ঘুগনি বেচে তখন? কি জানি?

না জানলাম। আমার আর জানবার প্রয়োজন নেই।

দূরে ভজুয়া হেঁটে যাচ্ছে ভজুয়া মানে বেনারসীপ্রসাদ মানে ফাগুলাল মানে চানামোহন।

আমি আবিষ্টের মতো, অভিভূতের মতো তার চলার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভীষণ ভিড়ের মধ্যে

এ জন্মের মতো কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। আবার কবে ফিরব, ফিরলেও জোড়াতালি দেয়া ছুটিছাটায়। অনেক বিরক্তি অনেক ভালোবাসা: সেই চোদ্দো বছর বয়সে ফরিদপুরের থেকে, তারপর একটানা এই গত পনেরো বছর। আজই শেষ দিন, জয়ন্তী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল।

এখনই উঠতে হবে। কত কিছু গোছানো বাকি আছে। কত টুকিটাকি, এক জায়গা থেকে সংসার বদল করে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া। ভাঙা কড়াই থেকে, বছরের তিন মাস বাকি, দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার কী ফেলে যাওয়া যায়, অথচ সব টেনে নেওয়াও সম্ভব নয়।

সকাল সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। পাশে সুকোমল এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। এই মুহূর্তে সুকোমলের উপর একটু রাগ হল জয়ন্তীর, বেশ ছিলাম কী দরকার ছিল রৌরকেল্লায় ভালো চাকরির। কলকাতার আড়াইশো টাকাতেই যেভাবেই হোক চলে যাচ্ছিল, কী হবে অতদূরে কিছু বেশি টাকায়? জয়ন্তীর উনত্রিশ বছরের জীবনের অর্ধেক কলকাতায় কেটেছে, সেই ভিক্টোরিয়া স্কুল, কলেজ, বেলগাছিয়ার সেই এবড়ো-খেবড়ো গলির মধ্যে তার বাপের বাড়ির পাড়ার বান্ধবীরা আর কোনোদিন কী তাদের সঙ্গে দেখা হবে? বড়ো বেশি মমতা, বোধ হতে লাগল জয়ন্তীর।

'এই ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো, কত কাজ বাকি রয়েছে,' উঠবে না জেনেও সুকোমলকে একটা ধাক্কা দিয়ে জয়ন্তী বিছানা ছেড়ে চলে গেল। সুকোমল পাশ ফিরতে গিয়ে চোখ বুজেই একটা হাত বাড়াল কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্তী নাগালের বাইরে।

সন্ধ্যার দিকে ট্রেন ছাড়বে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে হাওড়া অবশ্য খুব দূর নয়, তবু আজ শনিবার, বিকেলের দিকে ট্যাক্সি পাওয়া খুব ঝকমারি হবে। আজ কয়দিন ধরেই যথাসম্ভব গোছগাছ করা হচ্ছে। দুজনের সংসারে আছেই বা কী?

সুকোমল যতক্ষণ ইচ্ছে শুয়ে থাকুক, জয়ন্তী প্রথমে টুকিটাকি জিনিসগুলি গুছিয়ে নিতে লাগল। রান্নার বাসনকোসন সব কাল লোক দিয়ে ধুয়ে মেজে রেখেছে, আজ দুপুরে ওরা একটা হোটেলে খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু

জয়ন্তীর বাবা কাল এসেছিলেন, আজ যাওয়ার দিন বেলগাছিয়া থেকেই দুপুরে খেয়ে নিতে হবে, একটু দৌড়োদৌড়ি হবে শেষ মুহূর্তে, তবু সুকোমল আপত্তি করতে পারেনি।

কাল একটা বড়ো ক্যাম্বিসের ব্যাগ কিনে এনেছে সুকোমল। তাতেই ঘটি, বাটি, শিল, নোড়া খুচরো জিনিসগুলো এক এক করে তুলে ফেলল জয়ন্তী। এবার বড়ো ট্রাঙ্কটা গোছাতে হবে। ট্রাঙ্কটায় অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। বিয়ের ট্রাঙ্ক, বিয়ের পরে একবার গুছিয়ে ছিল, তারপর এরকমই চলে আসছে। সব জিনিসপত্রগুলো একে একে নামিয়ে ফেলল। বিয়ের সময়ে পাওয়া কিছু কিছু উপহার এখনো এই বাক্সটায় রয়ে গেছে, বছর তিনেক আগেকার এক মাঘনিশীথের কিছু মধুর স্মৃতি। সেই রাত্রির হিমেল হাওয়াও যেন এই বাক্সের মধ্যে কোথায় ছিল, জয়ন্তী তার শরীরে সেই শিহরণ অনুভব করল।

বাক্সটার সবচেয়ে নিচে একটা খবরের কাগজ পাতা, সেই সময়কার কাগজ, তিন বছরে একটু হলুদ হয়ে গেছে, বাক্সের রঙের সঙ্গে চটচটে হয়ে আঠার মতো কিছুটা আটকে গেছে। টেনে তুলতে গিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে বাক্সটার গায়ে লেগে রইল। এক টুকরো কাপড় জল দিয়ে ভিজিয়ে ঘষে তুলে ফেলতে হবে।

এখন সুকোমল বিছানা থেকে উঠল। চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে জয়ন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল—

'কি এখনো সব হল না? তুমি কোনো কাজের না।' এই অহেতুক মন্তব্য করে সুকোমল বাথরুমের দিকে চলে গেল।

জয়ন্তীর খুব রাগ হল, কোনো কাজ করবে না, বেলা নটায় ঘুম থেকে উঠে এই মাতব্বরি; ঠিক আছে, দেখাই যাক। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্তভাবে জয়ন্তী মাথা হেলিয়ে দিলে। সকাল থেকে বড়ো বেশি পরিশ্রম গেছে, আর এতই বা তাড়া কী আমার। যার গরজ সেই তাড়াতাড়ি করুক। জয়ন্তী একা ভাবতে লাগল।

সামনে থেকে তিন বছর আগের পুরোনো, ছেঁড়া খবরের কাগজের পাতাটা তুলে নিল জয়ন্তী ৭ ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৬৭ সালের পত্রিকার পঞ্চম পৃষ্ঠার ছোটোখাটো সংবাদ। তিন বছর সময়ে পৃথিবীটা একটুও পাল্টায়নি। সেই একই সব সংবাদ, 'মসজিদ হইতে পতনের ফলে বালকের মৃত্যু', 'বিধবা মারাত্মকভাবে আহত'—'দুইজন আততায়ীর কারাদণ্ড', 'কারামন্ত্রী কর্তৃক শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন' ইত্যাদি।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে জয়ন্তীর চোখটা আটকে গেল। সামান্য সংবাদ, চোখে পড়ার মতো নয়। তিন বছর আগে চোখে পড়েনি, পড়লেও অন্তত মনে

রাখেনি। কিন্তু এখন খবরটায় চোখ পড়তেই এই স্পষ্ট দিনের বেলায় তার ঘরে বসে জয়ন্তীর শরীর কেমন ছমছম করে উঠল, বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগল. কয়েক বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে।

ঘটনাটা তাহলে বেরিয়েছিল কাগজে, জয়ন্তীর চোখের সামনেই ঘটেছিল, সব মিলে যাচ্ছে, সেই শনিবার রাত্রি নয়টা হাতিবাগান বাজারের সামনে গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে তাহলে, তাহলে সেদিন ট্রামে এই লোকটাই চাপা পড়েছিল। সব কেমন গোলমাল বোধ হচ্ছে জয়ন্তীর, মাথাটা একটু ঘুরছে, দেয়ালগুলো গোল হয়ে যাচ্ছে। এ কি এতগুলো ইলেকট্রিক বাল্‌ব তো তাদের ঘরে ছিল না, কটা ইলেকট্রিক বাল্‌ব দুলছে—একটা, দুটো.....পাঁচটা, সাতটা....।

বিয়ের পর নিয়মিত প্রত্যেক শনিবার বিকালে জয়ন্তী বেলগাছিয়ায় তার বাপের বাড়িতে গেছে। কিন্তু প্রথম-প্রথম কয়েক সপ্তাহ সুকোমলও তার সঙ্গেই গেছে। কিন্তু তার পরে আর বিশেষ কোনো ব্যাপার না হলে যায়নি। তার চেয়ে ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলাতেই বেশি আগ্রহ তার। আর কতটুকুই বা পথ, বেলগাছিয়া থেকে ওয়েলিংটন, সোজা এক ট্রামে জয়ন্তী চলে আসতে পারে।

সেই প্রথমদিকে, সে বছরই ফাল্গুন মাসে ওই ফাল্গুনের গোড়াতেই হবে হাতিবাগান বাজারের সামনে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, জয়ন্তী এখনো মনে করতে পারে। বেলগাছিয়া থেকে ট্রামে উঠে ওরা দুজনে মিলে সবচেয়ে সামনে ডাইনের দিকের সিটটায় বসেছিল। জয়ন্তী লেডিস সিটে বসেনি. কখন সিট ছাড়তে হয় সুকোমল এই ভয়ে কখনোই জয়ন্তীর পাশে লেডিস সিটে বসে না। মাঘ শেষ হয়ে গেলেও তখনো হিমভাবটা রয়ে গেছে। বিশেষ করে সেদিন যেন একটু বেশি ঠাণ্ডাই, উত্তরের হাওয়া দিচ্ছিল। সন্ধ্যার শো সবে ভেঙেছে, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের দুই পাশের সিনেমা হলগুলো থেকে ক্রমাগত লোক বেরিয়ে আসছে। রাস্তায় বেশ ভিড়, দোকানপাট আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাত্রির শোতেও কয়েকটা হল হাউস ফুল যাচ্ছে, জানলার পাশে বসে জয়ন্তী সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ট্রামটা ঢিমে তেতালা চলেছে, স্কার্ফের কোণাটা জয়ন্তী একটু গলার কাছে টেনে নিল, একটু শীত-শীত করছে।

এই সময় জয়ন্তী লোকটাকে দেখল, অল্প আলোয় লোকটা গ্রে স্ট্রিটের দিক থেকে হাতিবাগান বাজারের দিকে আসছে, রাস্তা পার হওয়ার জন্যে একটু থমকে দাঁড়াল। জয়ন্তীদের ট্রামটা তখন ওই স্টপে দাঁড়িয়েছে, ট্রামটা ছাড়বে কিনা, সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবে কিনা লোকটা বোধহয় একটু ভাবল। হঠাৎ জয়ন্তীর

চোখে চোখ পড়ল লোকটার। যুবকই বলা উচিত, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের বেশি হবে না, জয়ন্তীর সমবয়সীই হবে, গায়ে একটা নীল রঙের বুশসার্ট হাতা আটকানো, ফুলপ্যান্টটা সাদা। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে জয়ন্তীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল, কেমন যেন চেনা চেনা, কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, নাকি বেলগাছিয়ায় সেই গলির মোড়ের হলুদ বাড়িটার দোতলায় থাকত, নাকি সেই ফরিদপুরের আমলাপাড়ার ছোটোবেলার কোন সঙ্গী? জয়ন্তী ঠিক করতে পারল না, লোকটাও কেমন বিমূঢ়ের মতো অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

জয়ন্তীর ট্রামটা ছেড়ে দিল। এমন সময় 'গেলো, গেলো, এই এই, রোককে, ট্রাম বেঁধে' রাস্তাসুদ্ধ লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটার পিছন দিক দিয়ে গ্রে স্ট্রিটের একটা ট্রাম খুব দ্রুতগতিতে বাঁক নিয়ে এসেছে—জয়ন্তী মাথা ঘুরিয়ে শুধু এইটুকু দেখতে পেল। জয়ন্তীদের ট্রামটা তখন এক স্টপ চলে এসেছে, পিছনের হই চইও আর শোনা যাচ্ছে না। সুকোমল বলল, 'আরেকটা অ্যাকসিডেন্ট হল। দৈনিক কত লোক যে ট্রাম বাস চাপা পড়ে মরছে।'

ট্রামসুদ্ধ লোক একসঙ্গে দুর্ঘটনা, তার কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। একাধিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার অতুৎসাহী প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণদাতাও সঙ্গে ছিলেন।

চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটা, ঘটতে দেখা কলকাতা শহরে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, দেখে, ভুলে যায়। তারপর আবার ঘটে, আবার ভুলে যায়। জয়ন্তীও ভুলে যেত এবং যে কোনো কারণেই হোক পরের দিন সাতই ফাল্গুন, রবিবার এই ছোটো সংবাদটা জয়ন্তীর চোখে পড়েনি। তা হলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু পরের শনিবার দিন রাত্রিতে ফিরবার সময় ট্রামে লোকটাকে আবার দেখেছিল জয়ন্তী। সেই নীল বুশ শার্ট সাদা প্যান্ট, সেই লোকটাই হাতিবাগানের এই স্টপটায় এসে তাদের ট্রামেই উঠল। জয়ন্তী দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল। যাক, তাহলে লোকটা কাটা পড়েনি। লোকটা কিন্তু সেদিনও একদৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়েছিল, জয়ন্তীর কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, সেদিনও সুকোমল সঙ্গে ছিল। লোকটা হঠাৎ সুকোমলের পাশে এসে দাঁড়াল। জয়ন্তী বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল, একবারও মাথা ঘোরালো না। কলেজ স্ট্রিটের কাছে এসে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, লোকটা নেই, কখন নেমে গেছে।

এরপরে, প্রায় প্রত্যেক শনিবারই একই সময়ে, একই জায়গা থেকে লোকটাকে ট্রামে উঠতে দেখেছে জয়ন্তী। কখনো জয়ন্তী একা ফিরেছে, কখনো সুকোমলের কিংবা আর কারো সঙ্গে। দুএক শনিবার হয়ত দেখতেও পায়নি। কিন্তু সেও

হয়তো জয়ন্তী নিজেই লক্ষ করেনি বলে। সেই একই পোশাক, নীল শার্ট, সাদা প্যান্ট, সেই একই দৃষ্টিতে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

কখনো জয়ন্তী বিরক্তি, খুব বিরক্তি বোধ করেছে, কখনো কৌতূহল। কে লোকটা? হয়তো এখানেই কোথাও থাকে, প্রত্যেকদিন এই সময় বাড়ি ফেরে, হয়তো আগে চিনত, একদিন জয়ন্তী চিন্তা করেছিল, লোকটা কি চায় প্রশ্ন করে জানতে হবে, কিন্তু করা হয়নি। কতরকমের পেশা আছে, লোকটা গোয়েন্দা বিভাগের কেউ হতে পারে, এইটুকু পথ ট্রামেই ওর ডিউটি; পকেটমার হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কত ভদ্র চেহারার লোক পকেট মারে, নাকি লম্পট? ধীরে ধীরে সে এসব কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছিল। প্রত্যেক শনিবার রাত নটার ট্রামে লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়া নৈমিত্তিক হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তীর কাছে।

গত শনিবারেই একটা ঘটনা ঘটল। জয়ন্তীর পাশে লেডিস সিটটা খালি ছিল, ট্রামে খুব ভিড়, পুজোর বাজার, সিনেমা ফেরত অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে। জয়ন্তী হঠাৎ দেখল তার পাশের সিটে সেই লোকটা বসে। জয়ন্তী জানলার কাছ ঘেঁষে একটু সরে বসল। এমন সময় কণ্ডাক্টর এসে টিকিট চাইতে জয়ন্তী নিজের টিকিট কাটল। লোকটাকে টিকিটের কথা বলতে ঘাড়টা একটু নাড়ল। কণ্ডাক্টারের বোধহয় তার দিকে তাকিয়ে কী একটা সন্দেহ হল, বলল, 'দেখি টিকিট।'

লোকটা খুব আলগোছে পকেট থেকে একটা মান্থলি বের করল।

কণ্ডাক্টর এবারেও বলল, 'দেখি।' এই সময় আর একজন মহিলা চলে আসায় লোকটাকে সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হল। ট্রামে ভিড় আরো বেড়েছে।

জয়ন্তী শুনতে পেলো কণ্ডাক্টর বলছে, 'আপনার নাম অমর চক্রবর্তী?'

লোকটা কী বলল। জয়ন্তী শুনতে পেল না। কণ্ডাক্টরের কর্কশ গলা শুনতে পেল, 'একষট্টি সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মান্থলি নিয়ে ঘুরছেন—দাঁড়ান, ও মশায় শুনুন, এই ধরুন, ধরুন মশায়, জোচ্চোর।'

'কি ব্যাপার, কি ব্যাপার?' সবাই মিলে কৌতূহলী হয়ে উঠল। ট্রামটা একটা স্টপে দাঁড়িয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে সকলের হাত ছাড়িয়ে কী করে লোকটা যেন কোথায় উবে গেল।

জয়ন্তী চোখ খুলতে দেখল, সামনে সুকোমল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজটা তখনো হাতে ধরা, দু বছর আট মাস আগের বাসি খবরটা চোখের সামনে কাঁপছে।

'গত শনিবার রাত্রি নয়টায় গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে অমর চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্যক্তি ট্রামে চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। ট্রামের ড্রাইভার.....

সুকোমলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তার সম্বিত ফিরল।

'কি, খুব টায়ার্ড? এক কাপ চা দাও, আমি সব গোছগাছ করে দেব।'

সুকোমলকে কিছু বললে, সুকোমল শুনলে নিশ্চয় হাসবে, ভাবতে ভাবতে চা করতে গেল জয়ন্তী।

বাংলাদেশ শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন উড়িষ্যার জমি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। চারদিকে অন্ধকার কেটে উর্ধ্বশ্বাসে এক্সপ্রেস ট্রেন চলেছে, দূরে দূরে ছায়াচ্ছন্ন গ্রামসীমায় কখনো দুএকটা স্তিমিত প্রদীপ শিখা। কামরার বিদ্যুৎ বাতিটাও কেমন অনুজ্জ্বল, পাশে বসে সুকোমল একটা ইংরেজি ডিটেক্টিভ বই পড়ছে। জয়ন্তী বাইরের দিকে তাকিয়ে। কলকাতার বাইরে রাত এত তাড়াতাড়ি ঘন হয়, জয়ন্তী কব্জিটা উল্টিয়ে একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল, নটা প্রায় বাজে।

সহসা জয়ন্তীর কী মনে হল, কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠল। হাতিবাগান বাজরের সামনে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে ট্রাম স্টপে সেই নীল বুশ সার্ট, সাদা ফুল প্যাণ্ট সেই লোকটা, অমর চক্রবর্তী এখন কী দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার অপেক্ষায় এক দৃষ্টিতে ট্রামগুলো একের পর এক খানাতল্লাসি করছে। তারপর, জয়ন্তী ভাবতে পারে না; কে অমর চক্রবর্তী, জীবিত হোক, মৃত হোক, তার সঙ্গে কি প্রয়োজন?

হঠাৎ জানলা দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই জয়ন্তীর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। প্লাটফর্মের একটা থামের পাশে অনেক লোকের সঙ্গে আবছা আলোয় একটা নীল জামা, দুটো স্থির চোখের দৃষ্টি এই দিকে।

জয়ন্তী চোখ বুজে একটা অস্ফুট কাতর চিৎকার করে উঠল।

'কি হল?' সুকোমল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'একটা নীল জামা পরা লোক এইদিকে .....জয়ন্তী আঙুল দিয়ে দেখাল। সুকোমল একটু তাকাল, তারপর বলল, 'তাই কি হল, ভূত দেখলে নাকি? নীল জামা, দেখছ না রেলের পোশাক. লোকটা রেলের কোনো ফায়ারম্যান টায়ারম্যান হবে বোধহয়।'

নবারুণবাবু সুখে থাকুন

আজ কিছুদিন হল নবারুণবাবু কিছুটা মোটা হয়ে পড়েছেন। নবারুণবাবুর বয়েস এই আগামী পয়লা অগ্রহায়ণে পঁয়তাল্লিশ পূর্ণ হবে। এক স্ত্রী, এক কন্যা। খুব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই তাঁর জীবনে। চিরকাল মাঝারি চাকরি করছেন, মাঝারি ধরনের উচ্চাশা তাঁর। খুব টানাটানিও নেই তাঁর, আবার খুব সচ্ছলতাও নেই।

ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিল নবারুণবাবুর দিন। কিন্তু এইসব মাঝারি মানুষদের মধ্যে জীবনে একটা ধাক্কা আসে, মোটা হওয়ার ধাক্কা। মেদবৃদ্ধির প্রাবল্যে শরীরের মধ্যদেশ ফুলে ওঠে। বিনা কারণে শুয়ে বসে সারাজীবন ধরে যে রকম চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তার কোনো পরিবর্তন না হলেও শরীরে অগাধ প্রাচুর্য কোথা থেকে চলে আসে, কেউ জানে না।

নবারুণবাবুরও ঠিক তাই হয়েছে। তবে তিনি সুরসিক লোক, তিনি এই বয়েসে এই মোটা হওয়ার একটা নাম দিয়েছেন ঃ মাঝারি মানুষের মাঝারি বয়েসের মাঝারি অসুখ। নবারুণবাবু নিজে এই অসুখ বাধাননি। তিনি যে খুব অলস, বা খুব বেশি খাওয়া দাওয়া করেন তাও নয়।। আসলে এই মোটা হওয়ার অসুখটা নবারুণবাবুদের বংশানুক্রমিক। তাঁর পূর্বপুরুষেরা অনেকেই তাঁদের বিস্তৃতির জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। তবে সেকালে মোটা হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে লোকেরা এত মাথা ঘামাত না, বরং সেটা ছিল সামাজিক মর্যাদার একটি বিশেষ প্রতীক। মা-ঠাকুমারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন ঘি, মাখন, দই, মিষ্টি খাইয়ে খাইয়ে তাঁদের স্নেহভাজনদের মোটা, আরো মোটা, আরো আরো মোটা করতে। তখনো শুরু হয়নি রক্ত পরীক্ষা। হার্টের অসুখ এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু একালে মোটা হওয়া বিপজ্জনক। পথে-ঘাটে, অফিসে-বাজারে, চেনা-আধোচেনা যার সঙ্গেই দেখা হোক, তিনি একটু ভুরু কুঁচকিয়ে নবারুণবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আরে, নবারুণবাবু যে, একদম চিনতেই পারিনি। সাংঘাতিক মোটা হয়ে গেছেন দেখছি।' তারপর একটু থেমে কিছুটা অভিভাবকত্বের ভঙ্গিতে পরামর্শদান, 'এত মোটা হওয়া ভালো নয়। সাবধানে থাকবেন। মনে আছে তো নগেনবাবুর ঘটনাটা?'

নগেনবাবুর ঘটনাটা আর কিছুই নয়, উভয়েরই পরিচিত নগেনবাবু নামে এক

ভদ্রলোককে বছর খানেক আগে রাস্তায় কুকুরে কামড়িয়েছিল। শুভানুধ্যায়ীর বক্তব্যের সারমর্ম হল নগেনবাবু অতটা মোটা না হলে দৌড়ে পালাতে পারতেন, পাগলা কুকুরের কামড় খেতে হত না, পেটে বড়ো বড়ো আঠারোটা ইনজেকশন নিতে হত না।

মোট কথা এই যে নবারুণবাবু নিজে মোটা হয়ে যাওয়ার জন্যে যতটা চিন্তিত তার চেয়ে অন্যেরা অনেক বেশি চিন্তিত। ফলে তাঁকে স্থূলতা কমানোর জন্যে বাধ্য হয়ে চেষ্টাশীল হতে হল।

ছাত্রজীবনের এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজারে দেখা হলে সে পরামর্শ দিয়েছিল দৈনিক একশোবার স্কিপিং করতে। বন্ধুর পরামর্শে, বিশেষ করে ওষুধ-ফষুধ খেতে হবে না। তাছাড়া ঘরের মধ্যেই স্কিপিং করা যাবে এই সুবিধের কথা ভেবে নবারুণবাবু সেদিনের বাজারের কিছু পয়সা বাঁচিয়ে সেই পয়সা দিয়ে একটা ভালো স্কিপিং-রোপ কিনে ফেললেন। বাড়িতে এসে কাউকে কিছু বললেন না।

কিন্তু স্কিপিং করার এত ঝামেলা একথা আগে কে জানত। নবারুণবাবু থাকেন একটা পুরোনো তেতলা বাড়ির দোতলায়। তাঁর ভারি শরীর নিয়ে তিনি পরদিন সকালে শোয়ার ঘরে লাফাতে গেছেন, প্রথম লাফের শব্দে তাঁর স্ত্রী চোখ খুলে আধো ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ দেখলেন, মালকোঁচা দিয়ে লুঙ্গি পরা নবারুণবাবু হাতে কী একটা লম্বা দড়ির মতো নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শূন্যে হাত তুলে। আগের দিন সন্ধ্যায় বাজার থেকে মাছ না আনায় নবারুণবাবুর সঙ্গে মালতীর, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর, খুবই কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এখন স্বামীকে শূন্যে হাত তুলে ঘরের মধ্যে আধো অন্ধকারে দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে মালতী বুঝতে পারলেন নবারুণ মনের দুঃখে ও প্রচণ্ড অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুকের রক্ত হিম করা একটি সুতীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে উঠলেন।

এরপরে ঘটনার গতি অতি দ্রুত। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এল। রাস্তায় দুজন খবরের কাগজের হকার কাগজ বিলি করছিল বাড়িতে বাড়িতে, তারা ছুটে এল, তাদের সঙ্গে মাদার ডেয়ারির দুধের ছেলে এবং সঙ্গে একজন ভিখিরি, যে শেষ রাত থেকে করুণকণ্ঠে জানলায় জানলায় রুটি ভিক্ষা করে, তারাও এল।

তাছাড়াও তিনতলা থেকে বাড়িওলা স্বয়ং নেমে এলেন। বাড়িওলার সঙ্গে আজ চার বছর মামলা চলছে নবারুণবাবুদের। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সবাইকে নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে বিদায় করা হল। কিন্তু বাড়িওলা চালাক লোক, তিনি স্কিপিং রোপ ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে মুহূর্তেই সব টের পেলেন, একবার ট্যারা চোখে পেটমোটা নবারুণবাবুর দিকে এবং আরেকবার রজ্জুটির দিকে তাকিয়ে সোজা থানায় ডায়েরি করতে গেলেন, 'স্যার আমার মোটা ভাড়াটে লাফিয়ে লাফিয়ে আমার পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলছে। বাড়ি ভেঙে পড়লে বহুলোক একসঙ্গে মারা পড়বে। মার্ডার কেস স্যার।'

নবারুণবাবুর বাড়িওলা এর আগে আরো আটবার নবারুণবাবুর নামে থানায় ডায়েরি করেছেন, সুতরাং তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তার চেয়ে আমরা নবারুণবাবুর রোগা হওয়ার গল্প বলি।

স্কিপিং রোপের পয়সাটা জলে গেল। এই বয়েসে রাস্তায় বা পার্কে স্কিপিং করা সম্ভব নয় অথচ বাড়িতে লাফালে বিপদ আছে, থানায় ডায়েরি করে রেখেছেন বাড়িওলা।

এ দিকে আরো মোটা হয়ে চলেছেন নবারুণবাবু। কিছু একটা করা দরকার। রোগা হওয়ার বিষয়ে তিনটে ইংরেজি পেপার ব্যাক বই তিনি পড়ে ফেলেছেন, অবশেষে মনস্থির করেছেন খাওয়া কমিয়ে শরীরের মেদ এবং ভুঁড়ি কমাবেন। অনেক পড়াশুনা করে নবারুণবাবু বুঝলেন শশাই একমাত্র খাদ্য; যাতে মোটা করার মতো কিছু নেই। সুতরাং শুধু শশা খেতে শুরু করলেন তিনি। দৈনিক দু কেজি করে শশা কিনতে লাগলেন।

সকালে দুধ চিনি ছাড়া এক পেয়ালা চা আর একটা শশা। দশটার সময় অফিস যাওয়ার মুখে একটা শশা সেদ্ধ, দুটো শশার সুপ। দুপুরে টিফিনের সময় আরেকটা শশা, এবার সামান্য একটু নুন দিয়ে। এর পরেও বিকেলে যদি খিদে লাগে তবে আরেকটা শশা। তারপরে রাতে শশার ডিনার। আবার শশা সেদ্ধ, শশার সরষেবাটা চচ্চড়ি, শশার ডালনা, অল্প একটু তেঁতুল দিয়ে শশার টক এবং সেইসঙ্গে লেবু-লঙ্কা দিয়ে শশার স্যালাড।

দিন দশেক এই রকম সশঙ্কভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর নবারুণবাবু আর মানুষ রইলেন না। দু পায়ে হাঁটতে তাঁর অসুবিধা হতে লাগল, হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে পারলে ভালো হয়। যখন তাঁর এই রকম অবস্থা, মালতী বাধ্য হয়ে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে বললেন, 'সর্বনাশ! এ বয়েসে এসব চলবে না। ভালো করে দুধ-মাছ-ডিম না খেলে কাজ করার শক্তি আসবে কি করে?' সুতরাং মালতী নবারুণবাবুর জন্যে কাজ করার শক্তি সরবরাহ করতে

লাগলেন। অপর্যাপ্ত স্নেহ পদার্থের সৌজন্যে এবং মালতীর রান্নার মাধুর্যে নবারুণবাবুর শরীর আরো উথলিয়ে উঠল। শশা খেয়ে যেটুকু অবনতি হয়েছিল, তার চারগুণ পুষিয়ে গেল।

এরপরে যা হবার তাই হল। রাস্তায় নবারুণকে দেখে পরিচিত ভদ্রজন চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। দশ বছর আগের সেই পাতলা দোহারা মানুষটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেদের সমুদ্রে। পুরোনো রসিকতা আছে যে ওজনের যন্ত্রে একজন অতি স্থূলাঙ্গ দাঁড়িয়েছে, কার্ড বের হল, 'এক সঙ্গে দুজন নয়, দয়া করে একজন একজন করে উঠুন।' নবারুণবাবুর অবস্থা ঠিক তা না হলেও, পর পর কয়েকবার তাঁর ওজনের কার্ডে, ওজনের সঙ্গে কার্ডে যে ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তাতে লেখা বেরোলো, 'আপনার উন্নতি অনেকেরই চক্ষুশূলের কারণ হয়েছে।'

এই ওজনের যন্ত্র বিষয়টিও খুবই রহস্যময়। মধ্যে শশা খাওয়ার সময় নবারুণবাবু প্রায় প্রতিদিনই এমনকি কোনো কোনো দিন প্রায় একাধিকবার ওজন দেখতে শুরু করেন। প্রায় নেশা হয়ে যায়। স্টেশনে, ডাক্তারখানায়, সিনেমাহলে যেখানেই ওজনের যন্ত্র দেখতে পান, সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত চলে যায় একটা খুচরো দশ পয়সা আছে কিনা? এই অভ্যাস এখন প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে। এর ফলে নবারুণবাবুর অভিজ্ঞতা হয়েছে বিস্তর, কোনো দুটো ওজনের যন্ত্রই কোনো সময় এক কথা বলে না। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বসুশ্রী সিনেমায় ওজন উঠল সাতাশি কেজি, পনেরো মিনিটের মধ্যে লেক মার্কেটের সামনের এক দোকানে মেশিনে সেটা কমে গিয়ে উঠল বিরাশি কেজি। তাছাড়া সব মেশিনের গায়েই লেখা আছে, 'চাকা না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' কোনো কোনো মেশিনে সেই চাকা আর থামে না। ঘুরছে তো ঘুরছেই। অতি দ্রুত বেগে তারপর ক্রমশঃ আস্তে, আস্তে আস্তে। নবারুণবাবু একবার একটা মেশিনের উপর আধঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন তবুও চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই। শেষে আর ওজন নেওয়ার ধৈর্য রইল না, আর ওই চাকা ঘোরাকালীন ওই ওজন নেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

সে যাই হোক, নবারুণবাবু ইতিমধ্যে আরো মোটা, আরো গোলগাল হয়ে গেছেন। তাঁর নিজের মাথাতেই এবার দুশ্চিন্তা ধরেছে কী করে সত্যি সত্যি হাল্কা হওয়া যায়। সত্যিই বেশ কষ্ট হচ্ছে আজকাল। একটু হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁফিয়ে পড়ছেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গেলে জিব বেরিয়ে যায়। কোথাও গেলে তারা একটু সচেতন ভাবে শক্ত চেয়ারটা এগিয়ে দেয়। রিক্সওলারা নবারুণবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয় সওয়ারি রিক্সায় তুলতে চায় না।

সুতরাং নবারুণবাবুকে আবার রোগা হওয়ার চেষ্টায় অবতীর্ণ হতে হল। কেউ

কেউ বললেন, সকালবেলা ঘণ্টাখানেক জোরে জোরে লেকে হাঁটাহাঁটি করো, দেখবে শরীর থেকে মেদ ঝরে যাবে। নবারুণবাবু বহু কষ্টে শেষ রাতে উঠে সেটা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু একজন বন্ধুর কথায় একদিন তাঁর ভুল ভেঙে গেল। সে বোঝাল, হাঁটতে চাও হাঁটো। কিন্তু তাতে রোগা হওয়ার আশা করো না। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে সে দেখাল লেকে গিয়ে দেখবে গত তিরিশ বছর এঁরা বাঁই বাঁই করে হাঁটছেন। অথচ এরাই কলকাতার সেরা মোটা লোক। তিরিশ বছর হেঁটেও এক ছটাক ওজন তো কমেইনি। সময় মতো যথাসম্ভব বেড়ে গেছে।

সুতরাং হেঁটে লাভ নেই। সকালে এক ঘণ্টা হাঁটা এবং তারপরে একঘণ্টা বিশ্রাম, শুধু শুধু দিনারম্ভেই দুটি অমূল্য ঘণ্টা নষ্ট। তার চেয়ে ওষুধ খাওয়া ভালো। অফিসে এক সহকর্মী একটা টোটকার কথা বললেন। লুই ফিশারের বইতে নাকি লেখা আছে গান্ধীজি খেতেন; সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক চামচে লেবুর রস আর এক চামচে মধু। এই দুটি নির্দোষ পানীয় একত্রিত হলে তার যে কী বিচিত্র, অবর্ণনীয় স্বাদ হয়, কী করে যে মহাত্মাজি দিনের পর দিন এই অভক্ষ্য গ্রহণ করতেন, ঈশ্বর জানেন। কিন্তু নবারুণবাবু সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। এক চামচে লেবুর রস এক চামচে মধু একসঙ্গে খেয়ে প্রথমদিন নবারুণবাবুর হাত পা ঝিম ঝিম করতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল। তারপরে মিনিট দশেকের মধ্যে বমি হতে লাগল। আর খালি পেটে বমি করা যে কী ভীষণ কষ্ট তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কলেজে পড়ার সময় নবারুণবাবু একবার বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বসে লুকিয়ে ব্রাণ্ডি খেয়েছিলেন, তাতেও সেই বয়েসে এতটা মাথা ঘোরেনি, এরকম বমি হয়নি।

অতএব অন্য পন্থা নিতে হল। তবে তাতে একটু খরচের ধাক্কা আছে। ঘনশ্যাম বাবু বলে এক ভদ্রলোক বউবাজারে থাকেন। তিনি শক্ত হাতে ম্যাস্যাজ করে ভুঁড়ি ও শরীরের জমানো মেদ ধোঁয়া করে দেন। যিনি ঘনশ্যামবাবুর ঠিকানা দিলেন, তিনি বললেন যে স্বচক্ষে দেখেছেন ঘনশ্যামবাবু মুচড়িয়ে টিপে দেওয়ার সময় ভুঁড়ি থেকে নীলচে আভা প্রায় ধোঁয়ার মতো, শীতের দিনে মুখ থেকে যেমন বেরোয়, প্রায় সেই রকম বেরোচ্ছে।

'ঘনশ্যামবাবুর খাঁই একটু বেশি। সপ্তাহে একদিন আধ ঘণ্টার জন্যে মাস মাইনে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। সেটা হল যদি তাঁর বাড়িতে গিয়ে ম্যাসাজ করানো হয়। আর নিজের বাড়িতে ঘনশ্যামবাবুকে নিয়ে আসতে গেলে মাসে দেড়শো টাকা লাগবে।

দেড়শো টাকা অনেক টাকা। সুতরাং নবারুণবাবু ঘনশ্যামবাবুর বাসায় যাওয়াই মনস্থ করলেন। বৌবাজারের গলির মধ্যে একটা একতলা বাড়ির উঠোনে টিনের চালার মধ্যে 'রাধেশ্যাম মেদনিধন ব্যায়ামগার।' রাধেশ্যাম হল ঘনশ্যামবাবুর বাবার নাম, তিনিই এই মেদনিধন প্রক্রিয়াটির আবিষ্কর্তা। রাধেশ্যামবাবু এখন স্বর্গত হয়েছেন তবে জীবিত অবস্থায় এ অঞ্চলের অসংখ্য চিনে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং বৌবাজারের স্বর্ণকারদের ভুঁড়ি তাঁর হাতের গুণে সমতল হয়েছিল।

ঘনশ্যামবাবুর হাতযশ নাকি আরো বেশি। ঘনশ্যামবাবুর নাম ও পেশা শুনলেই বেঁটে-খাটো, কালো, মোটা, গোলগাল যেরকম চেহারার কথা মনে ভেসে ওঠে তিনি সত্যিই সেইরকম দেখতে। তবে তিনি ন্যাটা, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে তার অসম্ভব জোর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিখিলবঙ্গ বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে তাঁর বাঁধা প্রোগ্রাম ছিল বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে একটা নতুন ক্রিকেট বল নিয়ে সেটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা।

মেদনিধন ব্যায়ামাগারে পৌঁছানোর পরে ভর্তি ফি পঞ্চাশ টাকা আর মাস মাইনে পঞ্চাশ টাকা মোট একশো টাকা দিয়ে শয্যাশায়ী হলেন নবারুণবাবু। শয্যা মানে কাঠের তক্তপোষের উপর কিঞ্চিৎ পুরোনো ও ছেঁড়া পাটি। জামাটামা খুলতে হল না, জামা আর গেঞ্জি পেটের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন ঘনশ্যামবাবু তারপরে ভুঁড়ির অর্ধবৃত্ত আস্তে আস্তে টিপে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বললেন, 'না এখনো নরম আছে, অসুবিধে হবে না। এককেজনের এমন শক্ত হয়ে যায় অথচ তেল চুকচুকে পিছলে চামড়া, কিছুতেই ধরা যায় না। তখন অবশ্য আমরা ভুঁড়ির উপরে আঠালো মাটি মাখিয়ে নিই।'

সুখের বিষয় নবারুণবাবুর ভুঁড়ির জন্যে আঠালো মাটি লাগল না। অল্প একটু আস্তে আস্তে টেপার পর, ঘনশ্যামবাবু নবারুণের ভুঁড়ির নিচের দিকে বুড়ো আঙুল চেপে ধরে সামনের চার আঙুল দিয়ে ভুঁড়ির যতটা পারলেন গোল করে প্যাঁচ দিয়েছিলেন, তারপর শুরু করলেন ঝাঁকি ও টান, আর সে কী ঝাঁকি, সে কী টান, ভুঁড়ির থেকে ধোঁয়া উঠল কিনা, কে জানে, কিন্তু চোখে ধোঁয়া দেখতে লাগলেন নবারুণবাবু এবং কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান হারালেন।

ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে আসতে ঘনশ্যাম একগাল হেসে নবারুণকে বললেন 'প্রথমবার ওরকম হয়, তাও তো আপনার তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরল। শ্যামচাঁদ আগরওয়ালা তো দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।'

সমস্ত ঘটনা তখন নবারুণের সহ্য ও বুদ্ধির বাইরে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললেন, 'দয়া করে আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিন।,'

ট্যাক্সি করে নবারুণ যখন বাড়িতে পৌঁছলেন তখন তাঁর মুখ চোখের এবং শরীরের অবস্থা দেখে বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। মালতী কপাল চাপড়াতে লাগলেন, মেয়ে ডুকরে কাঁদতে লাগল। পাড়ার দুজন শক্ত সমর্থ লোক এসে নবারুণকে কোলে করে দোতলার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এল। সবার প্রশ্ন 'কী করে কী হল?' নবারুণবাবু পেটে হাত দিয়ে দেখালেন, 'পেটব্যথা'। সকলেই খুব অবাক হয়ে গেল, 'বাবা, কী সাংঘাতিক পেট ব্যথা, হাত-পা পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না!'

অবশেষে ডাক্তারও এল। এইরকম ভীষণ পেটব্যথা দেখে ডাক্তার যখন অতীব চমকিত হলেন, নবারুণকে বহু কষ্ট করে ডাক্তারকে বোঝাতে হল, 'পেট ব্যথা ঠিকই। তবে পেটের ভেতরে নয়, পেটের বাইরে ব্যথা।'

এ কাহিনী আর বিস্তারিত করে লাভ নেই। দুচারদিনের মধ্যে নবারুণবাবুর পেট ব্যথা উপশম হবে। আবার রাস্তাঘাটে, অফিসে তিনি বেরোবেন। তার সঙ্গে আপনাদের দেখা হবে। দয়া করে তাকে আর রোগা হওয়ার পরামর্শ, উপদেশ দেবেন না। আধা মোটা মানুষ, মনের সুখে আছেন। ওঁর বাপ-ঠাকুর্দাও মোটা ছিলেন, সুখী ছিলেন। ওঁকে ছেড়ে দিন, আসুন আমরা কামনা করি, নবারুণকে রোগা হতে হবে না। নবারুণবাবু মোটা থাকুন, সুখে থাকুন।

সর্বানন্দের গল্প

(এক)
ভেজা চপ্পল

এই বর্ষায় সর্বানন্দ খুব সর্দি কাশিতে ভুগল। একটু জ্বর জ্বরও হয়েছিল। মুঠো মুঠো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেয়ে। বোতলের পর বোতল ব্রাণ্ডি গরম জল দিয়ে পান করে কোনো উপশম হল না।

কথায় বলে সর্দি চিকিৎসা করলে, ওষুধ খেলে সাতদিনে সারে; চিকিৎসা না করলে, ওষুধ বিষুধ না খেলে সারতে এক সপ্তাহ লাগে কিন্তু পরিতাপের বিষয় এক সপ্তাহে বা সাতদিনে সর্বানন্দের সর্দি, কাশি, ঘুষঘুষে জ্বর ছাড়ল না।

সবর্ণী একটু খুশিই হয়েছে। কারণ সর্বানন্দের নৈশ অভিযান বন্ধ হয়েছে, তবে সে বাসায় বসেই দেদার ব্রাণ্ডি পান করছে। তাতে অবশ্য সবর্ণীর আপত্তি নেই।

কিন্তু কদিন আর অকর্মার মতো বিছানায় শুয়ে থাকা যায়? এক সপ্তাহ ছুটি নেয়ার পর সর্বানন্দ অফিস যাতায়াত করছে। বৃষ্টি এখনো কম বেশি হয়ে যাচ্ছে, সর্বানন্দ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হাতে একটা ছাতা রাখছে মাথা বাঁচানোর জন্যে।

কিন্তু শুধু মাথা বাঁচনোই যথেষ্ট নয়। বৃষ্টি এলে পায়ের জুতো জোড়াও ভিজে যায়। সর্দিজ্বরে রোগীর পক্ষে ভেজা জুতো মারাত্মক। সর্বানন্দ চেষ্টা করে পায়ের জুতো না ভেজাতে। কিন্তু সব সময় সম্ভব নয়।

সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে মিনি বাসের জন্যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় ধুমসিয়ে বৃষ্টি এল। সে কী জলের তোড়, একেবারে যাকে বলে ছাতাভাঙা

অফিসের কাছের এই বাসস্টপটার অসুবিধে হলেও এর ধারে পাশে কোথাও মাথা গোঁজার জায়গা নেই। ফুটপাথ ধরে অন্তত একশো মিটার বড়ো কম্পাউণ্ড ওয়ালা পাঁচিল ঘেরা সাহেব কোম্পানির বাড়ি। তার পরেও কিছুটা ছুটে গিয়ে বড়ো রাস্তার মোড়। সেখানে দোকান টোকান, গাড়ি বারান্দা, ঢাকা জায়গা আছে।

জোর বৃষ্টি আসতে সর্বানন্দ মোড়ের দিকে ছুটল। একটু ছুটতেই হাওয়ার ঝাপটায় শৌখিন ছাতাটা উল্টে গেল। সেই অবস্থাতেই দৌড়ে মোড়ে পৌঁছিয়ে সর্বানন্দ একটা গাড়ি বারান্দার নিচে আশ্রয় পেল।

তখন জামা কাপড় ভিজে সপসপে। মাথার চুল দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা হয়েছে পায়ের জুতো জোড়ার। মোজা সুদ্ধ মোকাসিন জোড়া চিপলে অন্তত এক লিটার জল বেরোবে।

সর্বানন্দ বর্ষার ঝোড়ো, ঠাণ্ডা বাতাসে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে আশঙ্কা করতে লাগলেন এখনই অধিকতর কম্প সহকারে জ্বর আসবে। এই সময়েই গাড়ি বারান্দায় পিছন ফিরে তাঁর নজর গেল। এই ভিড়-ভাটার মধ্যে সেখানে চোখে গোল কাচের ভাঙা চশমা চোখে এক বুড়ো মুচি খুব মনোযোগ দিয়ে চপ্পল বানাচ্ছে। তার পিছনের দেয়ালেও পেরেকের সঙ্গে কয়েক জোড়া নতুন চপ্পল ঝুলছে।

পকেটের মানিব্যাগ বের করে সর্বানন্দ দেখলেন শ'দেড়েক টাকা আছে। তারপর চর্মকারের কাছ থেকে অনেক দামদর করে এক জোড়া চপ্পল কিনে ফেললেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়।

চপ্পল কিনে পায়ের ভিজে জুতো মোজাগুলো খুলে ফেললেন সর্বানন্দ। তারপর হাতব্যাগ থেকে সেদিনের খবরের কাগজ বের করে ভেজা জুতো-মোজা তার মধ্যে জড়িয়ে ব্যাগে রেখে দিলেন। এবার খালি পায়ে নতুন চপ্পল পরে নিলেন।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। একটা। মিনিবাস এসে যেতে সর্বানন্দ তাতে লাফিয়ে উঠলেন। শুকনো পায়ে, নতুন চপ্পল পরে বেশ আরাম লাগছিল।

কিন্তু বিপত্তি হল বাস থেকে নামার সময়। আবার ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। এখানেও বাসস্টপ থেকে নামার পর তাঁর বাড়ি প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালেন সর্বানন্দ।

একটু পরে খেয়াল হল পায়ে নতুন চপ্পল জোড়া রয়েছে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। সামনে একটা বকুল গাছ আছে। সেই গাছের নিচে বৃষ্টির ঝাপটা কম, সেখানে দাঁড়িয়ে চপ্পল দুটো খুলে হাতে নিতে গেলেন সর্বানন্দ। এরপর এটুকু পথ খালি পায়েই হেঁটে যাবেন।

কিন্তু পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে পারলেন না সর্বানন্দ। আঠার মতো আটকিয়ে গেছে চপ্পল জোড়া। ওপর দিকে পায়ের পাতা, নিচের দিকে পায়ের তলা সব আটকিয়ে গেছে চপ্পলের সঙ্গে।

বাড়িতে গিয়েও সুবিধে হল না। কিছুতেই চটি জোড়া পা থেকে খুলতে পারলেন না। তিনি আর সর্বাণী মিলে টানাটানি করলেন। তারপর সর্বাণীর বুদ্ধিমতো গরম জলের গামলায় পা দুটো চোবালেন তাতে বোধহয় ক্ষতিই হল, চপ্পল জোড়া আরও এঁটে আটকিয়ে গেল। তখন বিপরীত চিকিৎসা, ফ্রিজ থেকে বরফ বার

করে দু'পায়ের পাতায় ঘষা হল, বরফ জলে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আধঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা হল।

কিছু হল না। এক শিশি গ্লিসারিন, এক কৌটো নারকেল তেল পদসেবায় ব্যয় হল। কিছু হল না।

অবশেষে রাতে চপ্পল সুদ্ধ পায়ে সর্বানন্দ বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এবং কী আশ্চর্য! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সর্বানন্দ দেখেন সাপের খোলসের মতো চটি জোড়া পায়ের কাছে পড়ে আছে। সেগুলোকে অবশ্য পাদুকা বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে চামড়ার খেলনা নৌকো।

দুই
সবানন্দের বিপদ

শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ দত্ত ঘোরতর বিপদে পড়েছেন। সর্বাণীদেবী বারবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। রাজ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর সমস্বরে মানা করেছিল, খালি চোখে গ্রহণ দেখার পরিণাম কী হতে পারে সে বিষয়ে যথাবিহিত ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু একগুঁয়ে সর্বানন্দ কারো কথা শোনেননি।

অথচ কোনো কথাই শোনেননি সর্বানন্দ। সরাসরি পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় এতদিনে বুঝে গেছেন যে তরল, সরল সর্বানন্দের একটা চরিত্রের বড়ো দোষ যে তিনি খুবই একগুঁয়ে। কোনো ব্যাপারে একবার গোঁ ধরলে তিনি ছাড়তে চান না।

সর্বানন্দের মনে আছে উনিশো আশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই শেষবার যে কলকাতায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেবার এত হই চই হয়নি তবে লোকজন খুব বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অফিস-আদালত স্কুল কলেজ সব বন্ধ ছিল, গ্রহণের সময় রাস্তায় যানবাহন চলেছিল, লোকজন ছিল না, দোকানপাট বন্ধ ছিল, এমনকি আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু এবারের ব্যাপার আলাদা। সর্বানন্দ ভেবে পাননি এই পনেরো বছরে সূর্যরশ্মির এমন কী তারতম্য ঘটে গেছে।

সন্ধ্যায় পানীয়ের আড্ডায় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নবতোষ চক্রবর্তীকে সর্বানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'সূর্যের বেগুনি রশ্মিতে কি কোনো দূষণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে?'

অধ্যাপক নবতোষ একটু ভালো মানুষ গোছের লোক, ব্যাপারটা কিছুটা বুঝে

নিয়ে সর্বানন্দকে বললেন, 'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ, গতবার খালিচোখে দেখলাম কিছু হল না এবার সূর্যরশ্মি এত বিপজ্জনক কেন?'

সর্বানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ আমি ঠিক তাই ভাবছি।'

নবতোষ এবার একটা বাজে রসিকতা করলেন, 'জানো না, একজন শতায়ু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দীর্ঘ জীবনের রহস্য কী। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন, বোধহয় আপনাদের ওই সব জীবাণু, বীজাণু, ভাইরাস, জার্ম এসব আবিষ্কার হওয়ার ঢের আগে আমি জন্মেছিলাম তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

সর্বানন্দ এ শুনে বলেছিলেন, 'মানে?'

নবতোষ বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছ না। তোমার চোখ আর আকাশের সূর্য ঠিকই আছে কিন্তু এই পনেরো বছরে ডাক্তার আর বিজ্ঞানীরা অনেক গোলমেলে ব্যাপার সব আবিষ্কার করে ফেলেছেন।'

এই আলোচনার পর সর্বানন্দ খালি চোখে এবারও পূর্ণগ্রহণ দেখার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু খবরের কাগজে নানারকম বিপজ্জনক বিবৃতি পাঠ করে সর্বাণী তাঁকে যথাসাধ্য নিরস্ত করার চেষ্টা করেন।

সর্বাণী নানারকম বিকল্প ব্যবস্থাও করেছিলেন।

পুরোনো কাঠের আলমারি খুলে একটা কালো পাথরের থালা বার করে তার মধ্যে জল ভরে ছাদে রেখে দিয়েছিলেন। তার আগে সাড়ে চারঘণ্টা টানা রোদ্দুরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে দুজোড়া বিশুদ্ধ গ্রহণ চশমা কিনে এনেছিলেন। একটা পুরোনো এক্স-রে প্লেট পর্যন্ত জোগাড় করেছেন, পাশের বাড়িতে টিবি রোগী আছে, সেই বাড়িতে মাসে মাসে এক্সরে তোলা হয়, সেখান থেকে চেয়ে এনেছেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সর্বানন্দ খালি চোখে খোলাছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যগ্রহণ দর্শন করলেন। আগের বারের মতোই চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। ভাবলেন এবারেও নিশ্চয় কিছু হয়নি। তেমন কিছু টেরও পেলেন না।

কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে সর্বানন্দ ঘাবড়িয়ে গেলেন।

বলে কী? এখন নয় পাঁচ বছর পরে টের পাওয়া যাবে। পূর্ণগ্রহণ দর্শনে নির্ঘাত পূর্ণ অন্ধত্ব। যদিও পাঁচ বছর পরের ব্যাপার সর্বানন্দ এখনই ঘামতে থাকলেন। তাঁর মনে হতে লাগল চোখে অন্ধকার দেখছেন।

বিকেলে পানীয়ের আসরে আবার নবতোষের সঙ্গে দেখা। নবতোষ কিন্তু

একটা আশ্বাসের বাণী শোনালেন 'বিষে বিষ ক্ষয়'। 'এর পরের বার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তুমি খালি চোখে দেখ। এবারের দোষ কেটে যাবে।'

সর্বানন্দ অপেক্ষা করছেন পরের বারের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের জন্যে।

(তিন)
জয় বাবা শান্তিনাথ

সর্বানন্দের অফিসে তাঁর সঙ্গেই কাজ করেন শান্তিবাবু শান্তিলাল চৌধুরী। বছর দুয়েক আগে পাটনা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

শান্তিবাবু বাংলা ভালোভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণে কেমন একটা দেহাতি, হিন্দি ঘেঁষা টান। শান্তিবাবু অবশ্য বলেন তিনি বিহারি নন, তবে কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা পাটনার বাসিন্দা।

সর্বানন্দ এবং শান্তিবাবু একই বিভাগে কাজ করেন। প্রায় কাছাকাছিই দুজনে বসেন। অফিসের কাজকর্ম করতে করতে টুকটাক কথাবার্তা হয়, গল্পগুজব হয়। কখনো দুজনে টিফিন এক সঙ্গে ভাগ করে খান। এই দু-বছরে দু জনের মধ্যে একটা হালকা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

শান্তিলালের একটা বড়ো গুণ এই যে তিনি মদ খান না। মদের প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে চলেন। সর্বানন্দ কখনো-সখনো শান্তিবাবুকে তাঁর সঙ্গে নৈশ বিহারে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু শান্তিবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি এবং সরাসরি বলেছেন, 'আমি ড্রিঙ্ক করা হেট করি। আপনার সব ভালো, কিন্তু এই একটা খারাপ দোষ। ভাবী টোলারেট করে কি করে?'

ফলে আজকাল সর্বানন্দ শান্তিলালের কাছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। এই অফিসে আরও সাঙ্গপাঙ্গ আছে তাঁরাই তার সঙ্গী হন।

সে যা হোক, এর মধ্যে একদিন শান্তিবাবু সর্বানন্দকে বললেন, 'আজ আমার বাড়িতে সন্ধেবেলা চলুন। এমন জিনিস খাওয়াব, মদের নেশা ভুলে যাবেন।'

সর্বানন্দ অবাক। এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে গোছের মনের অবস্থা হল তাঁর। শান্তিবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার'? আপনার বাড়িতে কি পার্টি-টার্টি আছে না কি আজকে?'

শান্তিলাল বললেন, 'ও সব জিনিস আমাদের ঘরে চলে না। আজ আমাদের বাড়িতে শান্তিনাথের পুজো। চলুন বহুত মজা পাবেন।'

‘শান্তিনাথের পুজো?’ নিজের মনেই প্রশ্নটা করে ফেললেন, সর্বানন্দ, ‘আপনার নামে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকি নিজের বাড়িতে? আমি গিয়ে কি করব? ওসব পুজোটুজো আমার সয় না।’

শান্তিবাবু বললেন, ‘আরে বাবা, আমার নাম তো শান্তিলাল আছে, আমাদের ঠাকুরের নাম আছে শান্তিনাথ। দেবাদিদেব মহাদেব আছেন উনি। চলুন, মজা পাবেন।’

আজও সর্বানন্দকে শান্তিলালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে শান্তিনাথের পুজোয় যেতে হল। গিয়ে দেখলেন, পুজোর ছলে সেটা একটা গাঁজার আখড়া। শান্তিলালের বাড়ির লোকজন পাটনায়, তিনি জোড়াবাগানের একটা গলিতে একটা ঘরে একাই থাকেন। সেই ঘরে আরও পাঁচ-সাতজন দেশোয়ালি ভাই একত্র হয়েছে। তার মধ্যে একজন কাঁধে পৈতে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা ‘ব্যোম-ব্যোম’ করে পুজো করছেন, মাঝে-মধ্যে ‘জয় বাবা শান্তিনাথ’ বলে হাঁক ছাড়ছেন, বাকিরা সবাই তখন তাঁর সঙ্গে কোরাসে ধুয়ো ধরছেন।

হাতে হাতে গাঁজার ছোটো ছোটো কলকে ঘুরছে। একজনের টান দেওয়া হয়ে গেলে সে পাশের লোকের হাতে ছিলিম এগিয়ে দিচ্ছে। গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর পরিপূর্ণ। কটু ও মাদক গন্ধ থই থই করছে।

ধাপে ধাপে একটা ছিলিম সর্বানন্দের হাতেও এসে গেল। ভদ্রতার খাতিরে সর্বানন্দকে টান দিতে হল। প্রথমে একটু ঝাঁঝ লেগেছিল, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একটা ধাক্কা। ক্রমে সয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন এঁরা শুধু গাঁজাই টানছেন না, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন।

সেই গল্পগুজব শুনে সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন গঞ্জিকা সেবনের মাহাত্ম্য। মদ খেয়ে চুরচুর হয়েও ও ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয়।

সর্বানন্দের বাঁ পাশের কালোয়ার ভদ্রলোক বললেন, ‘কী সাংঘাতিক গরম পড়েছে এবার।’

ডানপাশের হিন্দি হাই স্কুলের মাস্টারমশায় বললেন, ‘এ আর কী গরম। বাহাত্তুরে সালের গর্মিতে আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে হাঁসগুলো পেট থেকে সেদ্ধ ডিম পাড়ত।’

এই কথা শুনে সামনের দশাসই ভদ্রলোক বজরঙ্গবলী ব্যায়ামাগারের কুস্তির শিক্ষক হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, ‘আরে মুঙ্গেরে আমার মামার বাড়িতে গরমের দিনে গোরুর বাঁটে একা একাই দুধ জ্বাল হয়ে ঘন হয়ে যায়, গরুর বাঁট ধরে দুইলে ঘন ক্ষীর বেরিয়ে আসে।’

ঝিম মেরে বসে ছিলেন শান্তিলাল, তিনি চোখ বোঁজা অবস্থাতেই বললেন, 'আমি তো আজকাল আর চায়ের জল গরম করি না। কলের জলে চা পাতা ছেড়ে দিই, তাতেই চা হয়ে যায়।'

সর্বানন্দ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর নয়। কেউ খেয়াল করছে না। এবার কাটতে হবে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ধোঁয়া ভর্তি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হতে তিনি শান্তিলালকে বললেন, 'এই গরমে আমি ধোঁয়া হয়ে গেছি।' এই বলে ধোঁয়া কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

(চার)
দার্জিলিং ভ্রমণ

সর্বানন্দের এক কাকা কাজ করতেন সেলস ট্যাক্স দপ্তরে। সারা জীবন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় চাকরি করে বেড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক, মহানন্দ দত্ত, একবার এক নাগাড়ে প্রায় সাত-আট বছর ছিলেন দার্জিলিং জেলায়, কখনো কার্শিয়াং-এ, কখনো কালিম্পঙে আর কখনো বা জেলা সদর শৈলসুন্দরী দার্জিলিং শহরে।

খুল্লতাতের সৌজন্যে কিশোর বয়েসে সর্বানন্দ বহুবার দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে এসেছেন, বিশেষ করে স্কুল কলেজের গরমের আর পুজোর ছুটিতে।

সেই থেকে শৈলসুন্দরীর প্রতি দুর্বলতা সর্বানন্দের। তাছাড়া তিনি জানেন পুজোর পরে পরে এই নভেম্বর মাসে দার্জিলিং সবচেয়ে সুন্দর। হাড় হিম করা ঠাণ্ডা বাতাস নেই। ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি নেই। ঝরঝরে দিন, ঝকঝকে আকাশ। চমৎকার ঠাণ্ডা।

সুতরাং এবার পুজোর ছুটিতে যখন কোথাও যাওয়া হয়নি তাই সর্বাণীকে খুশি করার জন্যে সর্বানন্দ ঠিক করলেন একটু পাহাড়েই ঘুরে আসা যাক। বারবারই সমুদ্রে এবং সমতলভুমিতে যাওয়া হচ্ছে, এবার দার্জিলিং। শৈশবের স্মৃতি তাঁকে ডাকছে।

কলকাতা থেকেই টেলিফোনে কার্শিয়াং, দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে তিনটে মোটামুটি কম পয়সার হোটেল বুক করা হল। আজকাল এই এক সমস্যা হয়েছে। ভদ্রস্থ, কম খরচের জায়গা পাওয়া কঠিন। হয় খুব দামি জায়গা আছে, তিন তারা, পাঁচতারা, একেবারে তারায় তারায় খচিত অথবা অবাসযোগ্য ডর্মিটরি, ইঁদুর-আরশোলার সঙ্গে সহাবস্থান তথা নর্দমার পাশে পাইস হোটেল।

এ দুটোর মাঝামাঝি প্রায় কিছু নেই। সুতরাং বেশ কষ্ট করে, অনেকের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে তিন জায়গায় তিনটে মোটামুটি মানানসই হোটেলে ঘর বুক করা হল, স্বামী-স্ত্রীর জন্যে যেমন হয় ডবল বেডের ঘর।

ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শেয়ার অ্যামবাসাডার গাড়িতে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে সর্বানন্দ-সর্বাণী কার্শিয়াং এসে নামলেন।

সর্বাণীর এই প্রথম পাহাড় ভ্রমণ। পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা পাইন গাছের পাতা ঝিরঝির করে দুলছে নভেম্বরের ঠাণ্ডা বাতাস মাখা রোদে। সর্বাণী কার্শিয়াং বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে অভিভূত হয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বললেন, 'এখনো তো দার্জিলিং রয়েছে, তারও পরে কালিম্পং। এখনই কী দেখলে।'

সে যা হোক, পায়ে হেঁটে কিছু দূরে নির্দিষ্ট হোটেল। সেখানে গিয়ে সর্বানন্দ-সর্বাণী দেখলেন, ঘর ঠিকই বুক আছে কিন্তু একটা ঘর নয়, দুটো ঘর বুক হয়েছে 'মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস এস দত্ত' নামে।

কোথাও ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে সর্বানন্দ একটা ঘর ক্যানসেল করে দিলেন।

দুদিন পরে দার্জিলিং পৌঁছে সেই একই ব্যাপার। হোটেলে দুটো ঘর মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস দত্তের নামে বুক করা। সিজনের সময়, ঘরের জন্যে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে, সুতরাং হোটেলওয়ালা বুকিং ক্যানসেল করতে মোটেই আপত্তি করলেন না।

আসল বিপত্তি হল কালিম্পঙে গিয়ে। সেখানেও হোটেলে ওই একই ব্যাপার। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস দত্তের নাম দুটো ঘর বুক হয়ে আছে।

সর্বানন্দ দ্বিতীয় ঘরটি ক্যানসেল করতে যাচ্ছেন, এমন সময় অন্য একটি দম্পতি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে হোটেলের কাউণ্টারে সর্বানন্দ সর্বাণীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তারপর সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস দত্ত?'

সর্বানন্দ অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ?'

নবাগত দম্পতি জানালেন, 'দেখুন আমরাও মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস দত্ত। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আমাদের ঘরটা ক্যানসেল করে দিচ্ছেন।'

সর্বানন্দ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন।

পাটনার দাদুর বাক্স

পুরোনো একটা বার্লির কৌটো। কৌটোর মুখটা শক্ত হয়ে আটকিয়ে আছে কৌটোটার সারা গায়ে জং ধরেছে। অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো হবে।

কৌটোর গায়ে ইংরেজিতে নীল অক্ষরে সাদা টিনের জমির ওপরে বার্লির নাম লেখা, নিচে বার্লি কোম্পানির মালিকের লম্বা সই ও তার ওপরে তাঁরই ছোটো ফটো। এক সময় এই বার্লিটা খুব বিখ্যাত ছিল। ঘরে ঘরে ব্যবহার হত।

সে ছিল বার্লির যুগ। কতরকমের বার্লি যে পাওয়া যেত বাজারে। ছোটো শিশুদের তখন দুধ বাদ দিলে বার্লি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না। তা ছাড়া সর্বত্র ছিল ভয়াবহ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার রোগীদের ভাত খাওয়া বারণ ছিল। এমনি কি জ্বর ছেড়ে গেলেও অনেকে বহুদিন খেত বার্লি। সেটাই ছিল শিশুর একমাত্র খাদ্য, রোগীর একমাত্র পথ্য। ছোটোবেলায় আমরা কত যে বার্লি খেয়েছি। গরম জলে অল্প নুন-লেবু বা দুধ চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া সেই পানীয় খেতে খেতে আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছিল। তবু এতদিন পরে এখন পুরোনো বার্লির কৌটোটা দেখে লেবু বার্লির জলের সেই পুরোনো স্বাদের স্মৃতিটা যেন অরুচিকর মনে হল না। বরং অনেক পুরোনো কথা স্মরণে এসে মনটা কেমন আনচান করে উঠল।

বার্লির কৌটোটা পেলাম পাটনার দাদুর বাক্সের মধ্যে। বাক্সটা বহু বছর আমাদের বাথরুমে ওপরে বক্সরুমের মধ্যে পড়েছিল। শীতের লেপ-কম্বল বছর বছর শীত ফুরিয়ে গেলে ওই বক্সরুমে রাখা হয়। এবার হঠাৎ কী মনে হল, লেপ-কম্বলগুলো তোলার আগে ভাবলাম, বক্সরুমটা অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি, এবার একটু গোছাই।

অনেক ভাঙাচোরা ভুলে-যাওয়া জিনিস বেরলো বক্সরুমটার অন্ধকার থেকে। তাতাইয়ের ছোটোবেলার ট্রাই-সাইকেল, মিনতির পুরোনো হারমোনিয়াম। বিজন একবার লখার মাঠের ছেলেদের কাছ থেকে একটা লোহার তরোয়াল কিনেছিল, আমি দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়ে ওই বক্সরুমে লুকিয়ে রেখেছিলাম। টুকটাক এইরকম কত দিনের কত জিনিস।

এরই মধ্যে পাটনার দাদুর বাক্সটাও ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম বাক্সটার কথা, পাটনার দাদুর কথা।

বাক্সটায় একটা ছোটো সস্তার তালা লাগানো। নিচে নামিয়ে একটা হাতুড়ি

দিয়ে জোরে আঘাত করতেই পুরোনো তালাটা খুলে গেল। বাক্সের ডালাটা তুলে দেখলাম নানা ধরনের ছোটোখাটো টুকটাক জিনিসপত্র, কোনোটাই তেমন দামি কিছু নয়। কিংবা এমন হতে পারে, এগুলো আমার চোখে এখন মোটেই দামি মনে হচ্ছে না, কিন্তু পাটনার দাদুর কাছে এগুলোর আলাদা মূল্য ছিল।

আমার ছোটোবেলা থেকে পাটনার দাদুকে আমাদের বাসায় দেখে আসছি। বাইরে কাছারিঘরে একটা তক্তাপোশে শুতেন। দিনের বেলায় মাথার কাছে মশারি-বিছানা গোটানো থাকত। তখন লোকজন কাছারিঘরে এলে ওই তক্তাপোশটায় বসত। তক্তাপোশটার মাথার দিকে বিছানার পাশে পাটনার দাদুর এই বাক্সটাও থাকত।

পাটনার দাদু আমাদের খুব নিজের আত্মীয় ছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন আমার এক কাকিমার মামা। পাটনায় সরকারি চাকরি করতেন যৌবনে। পঞ্চান্ন বছর বয়েসে রিটায়ার করে নিজের গ্রামে বসবাস করতে ফিরে যান। বিয়ে করেননি, কিন্তু ভাই-ভাইপোদের সঙ্গে এক সংসারে বেশিদিন পোষায়নি। আমাদের গ্রাম আর ওঁদের গ্রাম একটা ছোটো নদীর এপার-ওপার। একদিন সকালবেলা এক পয়সায় খেয়া পার হয়ে বাক্সটা নিয়ে ভাইদের ওপর গজগজ করতে করতে আমাদের বাসায় এসে যে উঠলেন আর কোথাও গেলেন না। তাঁর নিজের সরকারি পেনসনের সামান্য কিছু আয় ছিল, তাতে তার টুকটাক খরচ চলে যেত। দুবেলা আমাদের বাসায় খেতেন আর কাছারিঘরে শুতেন।

বিনিময়ে পাটনার দাদু আমাদের লেখাপড়া একটু দেখতেন, বাজারে যেতেন। আমাদের মেলাটেলায় নিয়ে যেতেন। কেউ বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করলে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে তদ্বির-তদারক করতেন পাটনার দাদুই। আমাদের অল্প কিছু ক্ষেতজমি ছিল, বাড়িতে কয়েকটা আম-কাঁঠাল-লিচু এইসব ফলের গাছ ছিল, কালক্রমে এ সমস্ত দেখাশোনার ভার পাটনার দাদুর ওপরেই বর্তে ছিল।

পাটনায় আগে কাজ করতেন, তাই আমরা বলতাম পাটনার দাদু। সম্বোধনটা চালু হয়েছিল আমার ঠাকুমা তাঁকে পাটনার বেয়াই বলতেন সেই সূত্রে।

পাটনার দাদু আমাদের বাড়ির সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি যে নিজের লোক নন, এটা টের পাইনি ছোটোবেলায়। যে কাকিমার সম্পর্কে তিনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন, সেই কাকিমাও খুব অল্পবয়সে মারা গেলেন, পাটনার দাদু আসার দুএক বছরের মধ্যেই। পাটনার দাদু কিন্তু আমাদের বাসায় রয়ে গেলেন।

একদিন দেশ ভাগ হল। আমাদের বড়ো সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে

গেল। সবাই যে যার মতো যে যেখানে পারল ছড়িয়ে পড়ল। দেশের বাড়িতে আমাদের নিজের বলতে আর কেউ রইল না। শুধু ওই পাটনার দাদু ছাড়া। তিনি একা আমাদের ছন্নছাড়া ভিটে আগলে পড়ে রইলেন।

তারপর কত কাণ্ড হল। দাঙ্গার পর দাঙ্গা, বন্যার পর বন্যা। কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো মিলিটারি রাজত্ব। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেল। কী করে যে পাটনার দাদু টিকে রইলেন কে জানে। তবে শেষ পর্যন্ত পাটনার দাদুকেও আসতে হল। সেটা সেই বাংলাদেশ যুদ্ধের বছর। সবে গোলমাল শুরু হয়েছে, আমরা সারাক্ষণ রেডিওতে কান পেতে রয়েছি। একদিন রাত সাড়ে দশটার সংবাদ শুনে সবে শুয়েছি, হঠাৎ দেখি দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে আর আমার ছোটোবেলার নাম 'খোকন-খোকন' করে ডাকছে।

দরজা খুলে দেখি বুড়োমতোন কিছু চেনা-চেনা আদলের কে একজন বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে। পাটনার দাদুর বয়স তখন আশি পার হয়ে গিয়েছে, তবু শক্ত চেহারা। এক মুহূর্ত পরেই চিনতে পারলাম।

সে একই বাক্স। যে বাক্স নিয়ে পঁচিশ বছর আগে তিনি আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। এখনকার এ বাড়ি সে বাড়ির মতো নয়, পণ্ডিতিয়ার ছোটো বাসা, তবু পাটনার দাদুকে জায়গা দিতে অসুবিধে হল না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত পাটনার দাদু বেঁচে রইলেন না। সেই বছরই মারা গেলেন। বাক্সটা পড়ে রইল বাইরের ঘরে । বেঁচে থাকতে একেকদিন বাক্সটা খুলে ওই বার্লির কৌটোটো খুলে আমাদের শুঁকতে বলতেন।

পাটনার দাদু যখন পালিয়ে আসেন, তখন ভরা বসন্ত। আমের মুকুল সদ্য গুটি হচ্ছে। আমাদের উঠোনের সবগুলো আমগাছে যত মুকুল হয়েছিল সে বছর, তার থেকে কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওই বার্লির কৌটোয় ভরে এনেছিলেন। আমাদের বোলগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঘ্রাণ ছিল। একেক সময় বাক্স খুলে কৌটোটা বার করে ওই শুকনো মুকুলের ঘ্রাণ নিতেন, আমাদেরও ডাকতেন আমাদের শৈশব-সৌরভের অংশ নিতে।

আজ এতদিন পরে পাটনার দাদুর বাক্স খুলে বার্লির কৌটোটা দেখে এত কথা মনে পড়ল। কৌটোর মুখটা খোলার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না, জং লেগে শক্ত হয়ে আটকিয়ে গেছে।

হাতুড়ি মেরে খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কী ভেবে থেমে গেলাম। এতদিন পরে সেই আমের মুকুলের সৌরভ ওই কৌটোর মধ্যে যদি না থাকে।

চাঁদ ধরার মন্ত্র

চারুপিসিমা আমাদের চাঁদ ধরার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। সুন্দর মন্ত্রটা ছিল, এখনো আবছা আবছা মনে আছে, পুরোটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু প্রথম লাইনটা মনে আসছে, দুবার বলতে হত প্রথম লাইনটা।

চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা,
চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমা।

বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এই মন্ত্র পড়ে ঠিক দুদণ্ডের জন্যে আকাশের যে কোনো জায়গায় চাঁদকে স্থির ধরে রাখা যেত। এক দণ্ড মানে চব্বিশ মিনিট, দুদণ্ড হল এক ঘণ্টার কিছু কম, পৌনে এক ঘণ্টার মতো।

সন্ধ্যাবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে একটা কালো পাথরের থালায় জল নিয়ে আমরা আমাদের দালানের পুবদিকের খোলা বারান্দায় এসে বসতাম। সামনে ছিল পরপর তিনটি কাঁঠাল গাছ আর সজনে গাছ। তিথি ও সময়মতো নানারকমের চাঁদ উঠে আসত ডালপালা, পাতার আড়ালে। আমরা পাথরের থালাটা বারান্দার এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসাতাম, যেখানে ওই কালোপাথরের জলে একটা ঝকমকে ছায়া পড়ত চাঁদের। তখন ওই জলের ছায়ার মধ্যে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে তিনবার চাঁদ-চন্দ্র-চন্দ্রমার মন্ত্রটা খুব নিষ্ঠা নিয়ে বলতে হত। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটা আটকিয়ে যেত গাছের ডালপালার মধ্যে। একবারে নট-নড়ন-চড়ন নট-ফট্, পাকা দু দণ্ডের জন্যে চাঁদ বেচারা বন্দি হয়ে যেত আমাদের কাছে। তারপর দু-দণ্ড শেষ হয়ে যেতে সন্ধ্যারাত পেরিয়ে যাওয়ার পর চাঁদ উঠে আসত গাছপালার ওপরে। আমারা তখন রান্নাঘরের মেঝেতে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসে কাঁসার বাটিতে দুধকলা দিয়ে ভাত খেতে খেতে দেখতাম, চাঁদ ডিঙিয়ে যাচ্ছে আমাদের পুরোনো বাড়ির ছাদের কার্নিশ, বুড়ো নারকেল গাছের লম্বা মাথা।

চাঁদ ধরা ব্যাপারটা খুবই শৌখিন ছিল, তখনকার আমাদের ভাষায় যাকে বলে হাউস করে মানে শখ করে আমরা চাঁদ ধরতাম।

চাঁদ-ধরার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ছিল তারা বাঁধা। আমাদের সেই মধ্য বাংলার নদী আর জলার দেশে কী যে বৃষ্টি হত। বর্ষা শেষ হয়ে যেত তাও বৃষ্টি

থামত না, কার্তিক মাসে কিংবা পৌষ মাসে বৃষ্টি এলে সে আর সহজে বিরাম হত না।

তখন আমরা তারা বাঁধতাম। সেটাও আমাদের চারু পিসিমাই শিখিয়েছিলেন।

এতকাল বাদে চারু পিসিমার নামটাই শুধু মনে আছে। চেহারাটা ভালো করে মনে পড়ছে না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কদমছাঁট চুল, আর সাদা থান একটু একটু করে মনে আসছে, কিন্তু মুখটা মনে পড়ছে না।

চারুপিসিমা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। সে বাড়ির আর কারো কথা খেয়াল হচ্ছে না। একটা হুলো বেড়াল, একটি ভোলাকুকুর, কয়েকটা পায়রা আর কাজের লোক, এ সব ছাড়া সে বাড়িতে কাউকে বিশেষ দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলা চারুপিসিমা এসে আমাদের বাড়িতে পুবের বারান্দায় বসতেন। মা-কাকিমার সঙ্গে গল্প করতেন। আমাদের চাঁদ ধরা, তারা বাঁধা শেখাতেন। আরও অনেক কিছু শিখেছিলাম তাঁর কাছে। আমি যে পুরুষমানুষ হয়েও আলপনা দিতে শিখেছিলাম, আম কাসুন্দি বা পুতুলের জামা বানাতে পারতাম, সেও চারুপিসিমার জন্যেই।

আপাতত তারা বাঁধার কথাটা বলি। আমাদের সেই বৃষ্টির দেশে একটা কথা ছিল 'হেসে যায়, কেঁদে আসে'। বর্ষার সারাদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে, শেষ বেলায় পশ্চিমের দিকে মেঘলা একটু কেটে গেল, একটু হাসিমুখ দেখিয়ে সূর্য ডুবে গেল। দু-একটা তারাও উঠল আকাশে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তা নয়। আজ হাসতে হাসতে সূর্য ডুবল, কাল কাঁদতে কাঁদতে সকালবেলা ফিরবে অঝোর বৃষ্টিতে।

এই 'হেসে যায় কেঁদে আসা'র একমাত্র প্রতিকার ছিল তারা বাঁধা। পিঁড়িতে ঘট বসিয়ে সেই ঘটে জল আর নারকেলপাতার কাঠি দিয়ে মন্ত্র পড়ে তারা বাঁধতে হত। কোনো অনাচার না হলে অব্যর্থ সেই মন্ত্র, পরদিন সকালে আর বৃষ্টি হত না। সূর্য হাসতে হাসতে ফিরে আসত ভোরের আকাশে।

চাঁদ ধরা, তারা বাঁধা এ সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এ বয়েসে এ সব আর কার মনে থাকে?

আমাদের বাড়ির পাশের জমিতে একটা অনেক উঁচু বাড়ি উঠছে। চারতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। আরো উঠছে। গতকাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখি ঘর জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে। জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম চারতলার মাথায় চাঁদ, আর একটু পরেই নিচে নেমে যাবে। জ্যোৎস্না আর এ ঘরে আসবে

না। কয়েকদিন পরে যখন বাড়িটা আরো উঁচু হবে, আমাদের ঘরে আর জ্যোৎস্নার আলো একেবারেই আসবে না।

আমি আর কী করতে পারি। এ শহরে আমাকে কে আর জ্যোৎস্নার ইজারা দেবে? মন খারাপ করে বিছানায় শুতে আসছিলাম, হঠাৎ ছোটোবেলার সেই চাঁদ ধরার কথা মনে পড়ল। আজ বিনা চেষ্টাতেই চারুপিসিমার মন্ত্রটা মনে পড়ল।

চাঁদ-চন্দ্র-চন্দমা
আজ কিন্তু নাই ক্ষমা।
বন্দি থাকো দুই দণ্ড
আজ তোমার এই দণ্ড।।

চাঁদটার দিকে তাকিয়ে পরপর তিনবার মন্ত্রটা পড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। আজ শেষবারের মতো চাঁদটাকে দু দণ্ডের জন্যে জানলায় ধরে রাখলাম। এই শেষ।

কালুকাক

'কালু' নামটা শুধু যে মানুষেরই হয় তা নয়। অনেক সময় গৃহস্থবাড়ির কালো রঙের পোষা কুকুরকে কালু নামে ডাকা হয়; যেমন লাল রঙের কুকুরকে সম্বোধন করা হয় লালি বা লালু বলে।

আমাদের বাড়ির কালু কিন্তু কুকুর বা মানুষ ছিল না। আমাদের কালু ছিল একটা জন্মান্ধ কাক।

কালু জন্মেছিল আমাদের ভাঁড়ার ঘরের পিছনে এক আদ্যিকালের বিশাল মহানিম গাছের ডালের বাসায়। সেই গাঢ় সবুজ পাতার মহানিম গাছের ডালে ডালে ছিল সাত রাজ্যের কাক আর শালিকের বাসা। চৈত্র-বৈশাখে কাকের ডিম ফেটে বাচ্চা বেরুত। বাসার ভেতর থেকে চিঁচিঁ করে বাচ্চাগুলো রোমহীন গলা বাড়িয়ে নিজেদের মা-বাবার কাছ থেকে খাবার চাইত। রাক্ষুসে খিদে ছিল তাদের। কাকের ছানাদের মা-বাবারা খাবার সংগ্রহ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

সে যা হোক, কাকেদের সমাজ-ব্যবস্থা খুব নিষ্ঠুর। কোনো অসদাচারী, পঙ্গু বা দুর্বল সঙ্গীর প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তারা ঠুকরিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। মেরে ফেলতেও দেখা গেছে।

আমাদের কালুর মা-বাবা এবং প্রতিবেশী অন্যান্য কাকেরা প্রথমদিকে বোধহয় ধরতে পারেনি যে কালু জন্মান্ধ, একেবারেই চোখে দেখতে পায় না। কালু যখন একটু বড়ো হয়েছে, তখন একদিন আমার বড়ো ঠাকুমা খুব ভোরবেলা ভাঁড়ার ঘরের পাশের জবা গাছ থেকে পুজোর জন্যে ফুল তুলতে গিয়ে দেখেন, উঠোনে একটা বাচ্চা কাককে একদল কাক খুব নিষ্ঠুরভাবে ঠোকরাচ্ছে। বড়ো ঠাকুমা একটা পাটকাঠি দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাকগুলোকে তাড়ালেন। সেগুলো আশেপাশের ঘরের চালে আর গাছের ডালে বসে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

বাচ্চা কাকটা কিন্তু রীতিমতো আহত হয়েছিল। প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল, চোখে দেখতে না পাওয়ার জন্যে উড়তে পারছিল না। আমার বড়ো ঠাকুমা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। খুব বেশি মায়া ছিল তাঁর শরীরে। তিনি কাকের বাচ্চাটাকে তুলে নিলেন হাতে, নিয়ে আমাদের দালানের পিছনের বারান্দার এক কোণে যেখানে পুরোনো ভাঙা আসবাবপত্র গাদা করে রাখা হত, তারই মধ্যে একটা তুলো-ছেঁড়া গদিওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

কাকের মতো একটা অস্পৃশ্য প্রাণীকে ছোঁয়ার জন্যে সেদিন বড়ো ঠাকুমাকে সেই সাতসকালে পুকুরে গিয়ে একশো আটটা ডুব দিতে হয়েছিল। পুজোর ফুল সব ফেলে দিয়ে পাশের বাড়ি থেকে অন্য ফুল নিয়ে আসতে হয়েছিল। তা হোক। কাকের বাচ্চাটা কিন্তু বেঁচে গেল। সে সারাদিন ঠুকঠুক করে দালানের বারান্দায় সিঁড়িতে হেঁটে বেড়াত। চোখে দেখতে পায় না বলে উড়তে সাহস পেত না। সন্ধ্যা হওয়াটা কী করে টের পেত, বোধ হয় অন্য কাকেদের চেঁচামেচি শুনে, সে তখন গুটিগুটি এসে তার চেয়ারের ছেঁড়া গদির ওপরে আশ্রয় নিত। বাড়ির বেড়ালেরা কেন যেন তাকে কেউ মারার চেষ্টা করেনি। আর যে কাকেরা তাকে ঠুকরিয়ে ছিল, সে বারান্দায় আশ্রয় নেওয়ার পর তাকে নিয়ে তারাও আর মাথা ঘামায়নি।

বড়ো ঠাকুমা কাকের বাচ্চাটার নাম রাখলেন কালু। ধীরে ধীরে কালু আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেল। আহ্লাদি নামের গোরু, ভোলা নামের কুকুর, আর রুপো নামের একটা সাদা বেড়ালের সঙ্গে কালুকাকও আমাদের সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে সে চোখে না দেখেই বড়ো ঠাকুমাকে চিনে ফেলল। বড়ো ঠাকুমা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেলে সে কী করে যেন বুঝতে পারত; তাড়াতাড়ি ছুটে বড়ো ঠাকুমার পাশে পাশে হাঁটত। খিদে লাগলে বড়ো ঠাকুমার ঘরের জানলার নিচে গিয়ে 'কঃ, কঃ কঃ' করে ডাকত। বারান্দার এক কোণায় সিঁড়ির নিচে কালুকে খাবার দেওয়া হত। কুকুর, বিড়াল বা গোরুর যত খাবার হয়, তার মধ্যে খড় আর ঘাস বাদ দিয়ে সবরকম খাবার কালু খেত।

রাতে বাড়ির উঠোনে কোনো লোক ঢুকলে সবচেয়ে আগে কালু টের পেত। সে 'কঃ কঃ' করে ডেকে সবাইকে সজাগ করে দিত। আরো কয়েকটা সঙ্কেত আওয়াজ ছিল। দুপুরে যখন বাড়ির বাজার আসত সে চেঁচিয়ে জানান দিত, ডাকপিয়ন এলেও ঐ রকম চেঁচাত।

বড়ো ঠাকুমার পরেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় কালুর। তখন আমার বছর দশ-এগারো বয়স। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই কালু কিভাবে যেন বুঝত, রীতিমতো দৌড়ে আমার কাছে আসত। আমি যখন রান্নাঘরে খেতে বসতাম, সে এসে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে দাঁড়াত। যখনই বাইরে থেকে বাড়ি ফিরতাম, কালু তার কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মোলায়েম করে আমাকে অভ্যর্থনা জানাত।

ভালোই ছিল কালু আমাদের সঙ্গে, আমাদের সংসারে।

একদিন এক ফকির এল আমাদের বাড়িতে। ফকিরদের বাড়ির মধ্যে অবাধ যাতায়াত। সে কালুকে দেখে এবং কালু জন্মান্ধ শুনে তারপর তার কার্যকলাপ

পর্যবেক্ষণ করে বলল যে, এটা হল ভূশণ্ডির কাক, ত্রিকালজ্ঞ পাখি। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই এর জানা।

ফকিরের কথা পাঁচকান হয়ে চাউর হয়ে গেল চারদিকে। তারপর থেকে ভিড় আর ভিড় আমাদের বাড়িতে। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসতে লাগল কালুকে দেখতে। এর অল্প পরেই একদিন অনেক রাতে কালুর চেঁচামেচি শোনা গেল। তারপরে বড়ো ঠাকুমার চিৎকার শোনা গেল, 'চোর চোর'। একটা লোক বারান্দা থেকে কালুকে চুরি করে নিয়ে গেল।

হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার। আমাদের পুরো বাড়ি, সর্বসাকুল্যে তেত্রিশজন সবাই জেগে উঠল। পরদিন থানায় এজেহার করতে গেল আমার দাদা আর ছোটো কাকা। কিন্তু দারোগাবাবু কাক-চুরির ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন না।

এ গল্পের আর সামান্য একটু শেষ অংশ আছে। এই ঘটনার বছর তিনেক পরে সন্তোষের রথের মেলায় গিয়ে দেখি, বাঁশের খাঁচায় একটা অন্ধ কাক নিয়ে এক জ্যোতিষি, তার কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, কাঁধে নামাবলী, সে লোকের ভাগ্য গণনা করছে। কাকটাকে দেখা কেমন চেনা-চেনা মনে হল। ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কালু! কালু'!

প্রথমে কাকটার কোনো ভাবান্তর হল না। কিন্তু দুবার ডাকবার পরে সে আড়মোড়া ভেঙে খাঁচার ভেতরে পাখা ঝেড়ে উঠে বসল। গলা উঁচু করে কী যেন, কাকে যেন খুঁজল, তারপর যতটুকু সম্ভব গলা নরম করে ডেকে উঠল, 'ক-ক-ক'। এখন বড়ো ঠাকুমা মারা গেছেন। দেশও ভাগ হয়ে গেছে। আমরা কে কোথায় যাব, তারও ঠিক নেই। আমাদের সংসারে ভাঙন শুরু হয়েছে। আমি আর কালুর ব্যাপার নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না। ধীরে ধীরে মেলার ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। মেলার অত হট্টগোলের মধ্যে কালুর 'ক-ক-ক-ক' ডাক আমার পিছে ঘুরতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি মেলা থেকে বেরিয়ে এলাম।

জ্যাকব

সে প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। কিন্তু আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমরা কেন জ্যাকবকে পুষতাম।

জ্যাকব ছিল আমাদের পোষা ঘোড়া। কিন্তু সে আমাদের কোনো দিন কোনো কাজে লাগেনি। আমরা কেউ কোনো দিন তার পিঠে চড়ে কোথাও যাইনি। কোনো মালপত্রও তাকে দিয়ে কোনোদিন বহন করানো হয়নি। তবে একটা কুকুর গৃহস্থবাড়ির যে কাজে লাগে, জ্যাকব সে রকম কাজে লেগেছে। জ্যাকব যতকাল ছিল, বাড়িতে কোনোদিন চোর আসেনি। পাড়া-প্রতিবেশী, বাইরের লোকজন যারা জ্যাকবকে জানত, সবাই তাকে ভয় পেত। ভিখিরিরা রীতিমতো সমীহ করত তাকে। এমনকি মহরমের সময় নিকারিপাড়ার যে তাজিয়া এসে আমাদের বাইরের উঠোনে ঢাল-সড়কি নিয়ে 'হায় হাসান হায় হোসেন' বলে বুক চাপড়িয়ে লড়াই দেখিয়ে টাকা নিয়ে যেত, তারা পর্যন্ত আসবার ঘণ্টা দুএক আগে লোক মারফত আমার ঠাকুর্দাকে খবর পাঠাত, যাতে বুড়ো কর্তা তারা আসার আগে জ্যাকবকে বেঁধে রাখে।

জ্যাকবকে বেঁধে রাখা [illegible] তত সহজ ছিল না। শুধু আমার ঠাকুর্দাকে আর আজিমাকে জ্যাকব একটু ভয় পেত, আর কাউকে সে মানুষের মধ্যে গণ্য করত না।

ঠাকুর্দাকে যে জ্যাকব শুধু ভয় পেত তা নয়। সে তাঁকেই মালিক বা প্রভু বলে ভাবত। ঠাকুর্দার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অপরিসীম। প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে একবার ভিতরের বারান্দার পাশ থেকে ঘাড় উঁচু করে ঠাকুর্দার শোয়ার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখত ঠাকুর্দা ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা। আর প্রত্যেক ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর্দার ঘরের কাছে একবার চিঁহি চিঁহি হ্রেষাধ্বনি করে সে চরতে বেরোত।

আর আজিমার সঙ্গে জ্যাকবের সম্পর্ক ছিল নিতান্ত স্নেহের। আজিমা আমার বাবার দূর সম্পর্কের জ্যাঠাইমা, বালবিধবা। আমার বাবাও তাঁকে যেমন দেখেছেন, আমরাও তাঁকে তেমনই দেখেছি। সাদা-থান, কদমছাঁট চুল, টকটকে গায়ের রঙ, কোনো দিন তিনি যুবতী ছিলেন না, কোনো দিন তিনি বুড়িয়েও যাননি।

আজিমা যখনই রান্নাঘরের বারান্দায় তরকারি কুটতে বসতেন, জ্যাকব এসে উঠোনে দাঁড়াত। তরকারি কুটতে কুটতে আলুর খোসা, বেগুনের বোঁটা, কপির ডাঁটা যা কিছু তিনি ছুঁড়ে দিতেন জ্যাকব নির্বিচারে তাই খেয়ে নিত। একবার

আজিমার ছুঁড়ে দেওয়া মানকচুর মাথা অন্যমনস্কভাবে চিবিয়ে জ্যাকবের মুখ তিন চারদিন ফুলে থাকে। তবুও সে উঠোনে এসে নিঃশব্দে আজিমার তরকারি কোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকত। আজিমা নিজে থেকেও কখনও কখনও ডাকতেন জ্যাকবকে। হয়তো আধ কড়াই ডাল বেঁচে গেছে কিংবা হাঁড়িতে রয়েছে অনেকটা বাড়তি ভাত। কুকুরকে যেভাবে ডাকে, আজিমা সেইভাবেই 'আয় আয় চু-চু' করে জ্যাকবকে ডাকতেন। বাড়ির বউ তো তাই গলা উঁচু করে ডাকতে পারতেন না, একমাথা ঘোমটা দিয়ে বাইরের উঠোনের দরজার কাছে গিয়ে নিচু গলায় ডাকতেন। কাছাকাছি কোথাও থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকব চার পায়ে ছুটে আসত।

চার পায়ে কথাটা অবশ্য ঠিক হল না। জ্যাকব একটু খোঁড়া ছিল, কোনো একটা পায়ে। কিন্তু ঠিক কোন্ পায়ে, সেটা আমরা কখনই ধরতে পারিনি। জ্যাকব নিজেও জানত কিনা সন্দেহ। কখনও দেখতাম, জ্যাকব সামনের ডান-পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, আবার কখনও হয়ত পিছনের বাঁ-পায়ে। হয়ত কাজ এড়ানোর জন্যে জ্যাকবের এটা এক ধরনের চালাকি ছিল। আবার এমনও হতে পারে, ওটা ছিল তার চলার স্টাইল। এমনিতেই আমাদের বাড়ির সবাই একটু বাঁদিকে খুঁড়িয়ে চলে। জ্যাকব হয়তো আমাদের দেখে দেখেই হাঁটার কায়দাটা রপ্ত করেছিল।

এসব অনেককাল আগেকার অল্পবয়সের কথা। জ্যাকবের সব স্মৃতি এখন আর তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুটো ছবি এখনও পরিষ্কার চোখে ভাসছে। একটা ছবি হল, আজিমার ডাক শুনে কাছারিঘরের পিছনের কচুর ঝোপ ভেঙে খোঁড়া পায়ে জ্যাকব ছুটে আসছে। আর দ্বিতীয়টাও আজিমাকে নিয়েই। কিন্তু সে দৃশ্যে আজিমা নেই। আজিমা তখন মারা গেছেন। কিন্তু জ্যাকবের সে বোধ নেই। আজিমার মৃত্যুর অনেকদিন পরে পর্যন্ত জ্যাকব সকালবেলায় আজিমার তরকারি কোটার সেই নির্দিষ্ট সময়ে রান্নাঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াত।

আজিমা হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে বারান্দায় মাদুরে বসে পাড়া-প্রতিবেশী বউ-ঝিদের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক গল্প করতে করতে বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে যান। এবং অল্প পরেই মারা যান। সেদিন সন্ধ্যাতেই নদীর ঘাটে শ্মশানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বাড়ির লোকজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই শবযাত্রী হয়েছিল। সেই শববাহকের দলের সঙ্গে জ্যাকবও খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়েছিল। বাড়িতে আজিমাকে যখন উঠোনে নামানো হয়, একটু দূর থেকে মাথা উঁচু করে জ্যাকব সবকিছু ক্রিয়াকর্ম লক্ষ করতে থাকে। তারপর যখন শবযাত্রা রওনা হয়, জ্যাকব তাদের অনুসরণ করে শ্মাশান পর্যন্ত আসে। সেখানে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আজিমাকে চিতায় ওঠানো হল, মুখাগ্নি করা হল, অন্ধকার শ্মশানে নদীর চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকব সব দেখেছে। তারপর শেষরাতে চিতায়

জল ছিটিয়ে সবাই যখন হরিধ্বনি করে ফিরে এসেছে জ্যাকবও তাদের সঙ্গে ফিরেছে, এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, জ্যাকবের মৃত্যুবোধ ছিল না। সে বুঝতেই পারেনি কী হয়েছে। তা না হলে সে কী আর পরেরদিনই সকালে রান্নাঘরের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ায়, আজিমা তরকারি নিয়ে কুটতে বসেছেন এই আশায়।

দুই

জ্যাকব প্রথমে ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের ঘোড়া। ঠিক ম্যাকেঞ্জি সাহেবের নয়। সে ছিল মিসেস ম্যাকেঞ্জি অর্থাৎ ম্যাকেঞ্জি-মেমের ঘোড়া। আমরা দেখিনি, কিন্তু বড়োরা দেখেছে জ্যাকবের পিঠে চড়ে ম্যাকেঞ্জি-মেম নদীর ধারের রাস্তায় টগবগ করে ছুটছেন। শুধু মেমসাহেবই নয়, জ্যাকবও নাকি তখন এমন খোঁড়া ছিল না, রীতিমতো টগবগে ছিল।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব ছিলেন সাহেব কোম্পানির পাটের এজেন্ট। আমাদের এলাকা ছিল পাটের জন্যে ভুবনবিখ্যাত। কলকাতা আর হাওড়ার হুগলি নদীর দুপাশের পাটকলগুলির পক্ষে কেনাবেচা করার জন্যে বহু সাহেব আমাদের অঞ্চলে যেতেন ও থাকতেন। পাটগুদামের পাশের জমিতে রীতিমতো টেকসই বাংলোবাড়ি বানিয়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব অবশ্য পাকাপাকি ভাবেই বসবাস করতেন আমাদের শহরে।

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাংলোর হাতায় একটা মরসুমী ফুলের বাগান ছিল। শীতে সে বাগান ছেয়ে যেত জিনিয়া, ডালিয়া আর গাঁদা ফুলে। গাঁদাফুল তিন রকম। কুঁড়ি গাঁদা, সেগুলো ছোটো আকারের, কুঁড়ির মতো—মনে হত, এখনও সম্পূর্ণ ফোটেনি। আর রক্তগাঁদা ছিল মাঝারি মাপের, তার পাপড়ি ছিল কালচে লাল রঙের। বড়ো, হলুদ রঙের বাগান আলো-করা গাঁদাফুল যেগুলো, সেগুলোকে বলা হত ভোলাগাঁদা।

কোনো এক পাটের ব্যাপারির সঙ্গে টাকা লেনদেনের একটা বাজে মামলায় জড়িয়ে পড়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কোম্পানি। কোম্পানির তরফে ম্যাকেঞ্জি সাহেব আমার ঠাকুর্দাকে উকিল রাখেন। সেই মামলার সূত্রেই এবং পরে আরও নানা কারণে ম্যাকেঞ্জি পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। খুব ছোটো বয়সের কথা হলেও এখনও অল্পস্বল্প মনে আছে, সরস্বতী পুজার সময় ঝুড়িভর্তি ডালিয়া, জিনিয়া আর গাঁদাফুল আমরা নিয়ে এসেছি ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগান থেকে।

ম্যাকেঞ্জি-মেমকেও অল্প অল্প মনে আছে। বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন। মা-ঠাকুমাদের পক্ষে ভাঙা ও কাঁচা ইংরেজিতে আমার এক পিসি মেমসাহেবের সঙ্গে কথোপকথন চালাতেন, ওই ইয়েস-নো-ভেরি গুড জাতীয়

কথাবার্তা। তবে ম্যাকেঞ্জি-মেম চলে যাওয়ামাত্র সারা বাড়িতে গোবরজল ছেটানো হত। আর ম্যাকেঞ্জি-মেমকে চা দেওয়া হত যে-পেয়ালায় সে-পেয়ালা রান্নাঘরে কেন, বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে পেত না। সে-পেয়ালা থাকত কাছারি-ঘরে বইয়ের আলমারির তাকে।

যুদ্ধ লাগল। তার কিছুদিনের মধ্যেই সাহেবরা চঞ্চল হয়ে উঠল। একদিন সারা জেলায় যেখানে যত সাদা চামড়ার সাহেব ছিল, তাদের মিটিং হল জেলাসদরে সাহেবি ক্লাবে। তারপর সাহেবদের ঘর ভাঙতে শুরু করল। প্রথম রওনা হলেন মেমসাহেবরা, ছোটো ছেলেপিলে নিয়ে দেশের দিকে। আবার কেউ নার্স হয়ে বা অন্য কোনো কাজে যুদ্ধে গেলেন।

আগে গেলেন ম্যাকেঞ্জি-মেম। তারপর একদিন ম্যাকেঞ্জি সাহেবকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে যুদ্ধে যেতে হল। তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রইল তাঁর বাংলো; আর অযত্নে নষ্ট হয়ে গেল ফুলের বাগান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর শীতের সময় একা একাই কিছু ফুল ফুটত সে বাগানে। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব যুদ্ধে যাওয়ার সময় অনেক জিনিসপত্র লোকজনদের বিলিয়ে দিলেন আর সেই সঙ্গে জ্যাকবকে দিয়ে গেলেন আমার ঠাকুর্দার হাতে। যাওয়ার দিন সকালবেলা জ্যাকবকে লাগাম লাগিয়ে আমাদের বাড়িতে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সহিস। এসে জ্যাকবকে কাছারিঘরের বারান্দায় খুঁটিতে বেঁধে সহিস ঠাকুর্দাকে বলল, 'ম্যাকেঞ্জি সাহেব ভেজ দিয়া।'

ম্যাকেঞ্জি সাহেব বোধহয় ঠাকুর্দাকে এই উপহারের কথা আগেই বলেছিলেন, ঠাকুর্দা সহিসকে বললেন, 'ঠিক আছে, রেখে যাও।' ঠাকুর্দা কাছারিঘরে মক্কেলদের নথিপত্র দেখছিলেন, একবার উঠে এসে জ্যাকবকে দেখে গেলেন।

কিন্তু সারা বাড়িতে তখন ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের বাড়িতে কখনও কখনও গ্রামাঞ্চল থেকে কোনো কোনো মক্কেল ঘোড়ায় চড়ে আসত। চৈত্র মাসে ভাগচাষিরা ঘোড়ার পিঠে করে ফসলের ভাগ দিতে আসত। কিন্তু এ আমাদের একেবারে নিজেদের ঘোড়া।

একটু পরে ঠাকুর্দা আর বাবা আদালতে যাওয়ার আগেই ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিদায় নিতে এলেন। তিনি বললেন, যে, 'খুব ভালো ঘোড়া, ভদ্র, শিক্ষিত। এর নাম জ্যাকব। কখনও কখনও খোঁড়ায় বটে, কিন্তু যখন খোঁড়ায় না, তখন খুব ছোটে। আমার মেমসাহেবের খুব প্রিয় ঘোড়া ছিল এটা। খুব বুদ্ধি এ ঘোড়ার।'

ম্যাকেঞ্জি সাহেব জ্যাকবকে রেখে চলে গেলেন। এর পরে তাঁর আর কোনো খোঁজ আমরা পাইনি। কিন্তু জ্যাকব আমাদের বাড়িতে রয়ে গেল। প্রথমে প্রথমে কিছুদিন নদীর ধারে তার পুরোনো মনিবের বন্ধ বাড়িতে গিয়ে জ্যাকব সময়ে

অসময়ে একটা পাক দিয়ে আসত। শেষে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল ও বাড়িতে আর কেউ নেই, তখন আর যেত না। তবে বহুদিন পর্যন্ত নদীর ধারে গিয়ে, সাহেবদের বাংলো বাড়িটা যেখানে ছিল, একেক সময়ে থমকে তাকিয়ে দেখত জ্যাকব, আর কী যেন ভাবত।

জ্যাকব যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে এল, বাড়ির প্রায় প্রত্যেকেই যেন খুবই উত্তেজিত হয়েছিল চতুষ্পদ বাহনের আগমনে, তেমনিই আমিও বেশ উৎফুল্ল হয়েছিলাম ঘোড়ায় চড়তে পাব এই আশায়। মক্কেলদের ঘোড়ার পিঠে চুরি করে চড়ে ঘোড়ায় চড়ার স্বাদ আগেই পেয়েছিলাম। এবার নিজেদেরই ঘোড়া হওয়ায় ভালো করে ঘোড়-সওয়ার হওয়ার শখ হল।

আমার সে শখ কিন্তু পূর্ণ হয়নি। আমাদের বাড়ির ধর্মকর্ম, ইহকাল-পরকাল সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন পটলমামা। তিনি সম্পর্কে বাবার মামা ছিলেন, নাকি মার মামা ছিলেন, নাকি কাকিমা-জেঠিমাদের কারও মামা ছিলেন, এতদিন পরে তা আর বলতে পারব না। এমনও হতে পারে যে, তিনি ঠাকুর্দা বা ঠাকুমার মামা ছিলেন। ঠাকুর্দা আর আজিমা তাঁকে নাম ধরে ডাকতেন। ঠাকুমা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। কোনো এক বা একাধিক অজ্ঞাত কারণে ঠাকুমা তাঁর সঙ্গে একদম কথা বলতেন না। এতদিন পরে এসব কথা লিখতে গিয়ে এই পরিণত বয়েসে এখন মনে হচ্ছে, পটলমামা সম্ভবত ঠাকুমারই দূর-সম্পর্কের কোনো অপোগণ্ড ভাই ছিলেন। সে যা হোক, এছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত মানুষ আছে, বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, রাস্তার লোক, বাজারের লোক, সবাই তাঁকে পটলমামা বলত।

তা বলুক, পটলমামা এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি এ সমস্তের বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি বহুবিধ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করে, যার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল তাঁর মনগড়া, আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর কথা যে সবাই সবসময় মান্য করত, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তাঁর একটা সুবিধে ছিল এই যে, তিনি পাঁজি দেখতে জানতেন, কখন গ্রহণ ছাড়বে, কখন লক্ষ্মীপুজো আরম্ভ করতে হবে, এসব বিধান তিনিই দিতেন। লাউ কিংবা মোচা খাওয়া সম্বন্ধেও তাঁর কঠোর সংস্কার ছিল।

পটলমামা জ্যাকবের বাড়িতে আসা ভালোভাবে নেননি। আমাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণমুখী। প্রথমেই বললেন, 'দক্ষিণমুখী বাড়িতে ঘোড়া পুষতে নেই। ঠাকুরপুরের ছোটো তরফ এই করেই নির্বংশ হয়েছিল।' আজিমার ধমক খেয়ে পটলমামা অবশ্য পরে স্বীকার করেন যে, ঠাকুরপুরের ছোটো তরফের বাড়ি দক্ষিণমুখী ছিল না, সেটা ছিল পূর্বমুখী। আর ঠিক ঘোড়ার জন্যে নয়, তারা নির্বংশ হয়েছিল শনিবারের বারবেলায় বেড়াল মারার জন্যে।

ঘোড়া পোষা সম্পর্কে পটলমামার নিষেধ খাটল না বটে, কিন্তু তিনি একটা মারাত্মক কথা বললেন। তিনি বললেন যে, ম্যাকেঞ্জি-মেমের গোপনীয়, দূষিত অসুখ ছিল। সেই পাপিষ্ঠা, ম্লেচ্ছা রমণী এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়াটাকেও দূষিত করেছে। এর পিঠে যে চড়বে, তারও ওই সব খারাপ অসুখ হবে। প্রথমে অধমাঙ্গে পরে উত্তমাঙ্গে সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে এ ঘোড়ার সওয়ার মারা পড়বে।

এই ভয়াবহ ঘোষণার ফল ফলেছিল। তার একটা কারণ ছিল এই যে, লক্ষ করে দেখা গিয়েছিল জ্যাকবের পিঠে একটু ঘায়ের মতো কী যেন আছে। ফলে কেউই আর জ্যাকবের পিঠে উঠতে সাহস করেনি। শুধু দু-একজন সেই আমরা যারা লুকিয়ে চুরিয়ে এক-আধবার প্রথমদিকে জ্যাকবের পিঠে উঠেছি, সারাজীবন দুশ্চিন্তায় কাটালাম এই বুঝি শরীর দিয়ে চাকা চাকা দূষিত ঘা বেরোল। তাহলে কী আর কাউকে, এমন কী ডাক্তারকে বোঝানো সম্ভবপর হত যে, ছোটোবেলায় ঘোড়ার পিঠে ওঠায় আজ গায়ে এই ঘা বেরিয়েছে।

জ্যাকব কিন্তু রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। শীত শেষ হতেই তার পিঠ বাদামি লোমে ছেয়ে গেল, ঘায়ের চিহ্নও আর রইল না। পরে আমরা দেখেছিলাম, প্রত্যেকবারই শীতের শুরুতে অনেক লোম ঝরে গিয়ে একটু ঘিয়ে-ভাজা-ভাব আসে জ্যাকবের। শীত কেটে গেলেই সেটা চলে যায়।

জ্যাকব আমাদের বাড়িতে এসেছিল অঘ্রাণের মাঝামাঝি। সে বছর পুরো শীতকালটা সে রান্নাঘরের পাশে যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা তার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। শুধু একদিন রাতে খুব বৃষ্টি আসায় সে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে আসে। রান্নাঘরে দাসী শুতো। পরেরদিন খুব ভোরবেলায় দাসী উঠোন ঝাঁট দিতে রান্নাঘরের দরজা খুলে বেরোতে গিয়ে দেখে জ্যাকব দাঁড়িয়ে। তার সে কী আর্ত চিৎকার! পুরো বাড়ির লোক শেষরাত্রির সুখতন্দ্রা ফেলে সে-চিৎকার শুনে ঘর খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। কাছারিঘরে দু-একজন মক্কেল প্রয়োজনে রাত্রিবাস করত। সেদিন রাহাজানির মামলায় দুজন সদ্য জামিনপ্রাপ্ত আসামীও ছিল। তারা দাসীর সেই আর্তনাদ শুনে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং আশঙ্কা করে যে, হঠাৎ যদি থানা-পুলিস হয়, আবার তারা বিপদে পড়বে।

দাসীর চেঁচামেচি শুনে মৃদুমন্দ চালে জ্যাকব রান্নাঘরের বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, রান্নাঘরের বারান্দায় তার ওঠা এদের পছন্দ নয়। এর পরে জ্যাকব আর রান্নাঘরের বারান্দায় ওঠেনি, ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠত। বাকি অন্য সময় সে নিজের মনে বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির বাইরে নানা জায়গায় আপনমনে ঘুরে বেড়াত। শুধু সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ি ফিরে এসে যজ্ঞডুমুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোত,

তারপর ভোর হওয়া মাত্র নিজেই বেরিয়ে পড়ত, বাড়ির সামনের মাঠে বা রাস্তার ধারে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেত।

যজ্ঞডুমুর গাছের তলাটা খুব প্রিয় ছিল জ্যাকবের। ওখান থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে নজর রাখত। বাড়ির মধ্যে কুকুর, বিড়াল কাউকে সহ্য করতে পারত না জ্যাকব। এমন কী ভিখিরি, বাউল, মুশকিল আসান দেখলেও তাড়া করে যেত। গাছতলায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার পর থেকে চোখ বুজে কান খাড়া করে ঘুমুত সে। রাতের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটোকাঁটা খেতে দু-একটা আটপোষা কুকুর ছুটে আসত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে যেত জ্যাকব। আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরে একপাল জংলি রাজহাঁস কবে কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। সারাদিন পাড়ার মধ্যে চরে বেড়াত আর সূর্যাস্তের আগেই মধ্যপুকুরে গিয়ে পিঠে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোত। বনবেড়াল আর শেয়ালের থাবা থেকে বাঁচবার জন্যে ওরা এটা করত, কারণ এসব জন্তু জলে সাঁতরিয়ে গিয়ে পুকুরের মাঝখানে ওদের আক্রমণ করতে পারে না। এই হাঁসগুলো রাতের বেলায় শত্রুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল, কিন্তু দিনের বেলায় পাড়ার মধ্যে ওদের যেখানে দেখত নৃশংসভাবে জ্যাকব তাড়া করে যেত। আমাদের বাড়িতে একদা হাঁসদের খুব সমাদর ছিল, আজিমা ওদের প্রত্যেকের নামকরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেককে আলাদা করে চিনতেন একেকদিন বলতেন, 'সবাই এল, রানি আর বাণী আজ এল না কেন?' যে কোনো কারণেই হোক, খুব সম্ভব আজিমার প্রতি শ্রদ্ধাবশত— পাড়ার ভিতরে রাজহাঁসদের সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, আমাদের বাড়িতে ঢুকলে জ্যাকব তাদের তাড়া করে যেত না, শুধু কটমট করে তাকাত।

আজিমা প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা এক বাটি লাল চালের ভাতের ফ্যান দিয়ে 'চই চই' করে ডেকে হাঁসদের খাওয়াতেন। 'চই চই' করামাত্র জ্যাকবও ছুটে আসত, খুব রাগের সঙ্গে সে দেখত রাজহাঁসদের পানভোজন। আজিমা জ্যাকবকে বলতেন, 'ওরা গেলে তুই খাবি।' জ্যাকব বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকত।

তিন

জ্যাকবের জন্যে আমাদের তেমন কোনো খরচ ছিল না। কোনোদিন তার জন্যে কোনো আস্তাবল তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তার জন্যে আলাদা কোনো খাবারের বন্দোবস্তও করা হয়নি।

জ্যাকব নিজের মনে চরে বেড়াত। বাড়ির মধ্যে, পাড়ার মধ্যে অনেক সময় বেশ দূরে নদীর ধারে বা ইস্কুলের মাঠেও ঘাস খেতে যেত। ইস্কুলের বোর্ডিংয়ের সামনের ফুলের বাগানে জ্যাকব ঢুকে পড়ে। বোধহয় গেটটা খোলা ছিল, সেই সুযোগে জ্যাকব ভেতরে যায়। বোর্ডিয়ের ছেলেরা তাকে খোঁয়াড়ে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও জ্যাকব যখন বাড়ি ফিরল না, আজিমা ঠাকুর্দাকে জানালেন যে, জ্যাকব আসেনি। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি চলে আসে, আজ কী হল? একটু পরে বাজার থেকে ফেরার পথে নতুন মুহুরিবাবু খবর আনলেন যে, জ্যাকবকে ইস্কুলের ছেলেরা ধরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। তখনই খোঁয়াড়ে গিয়ে ছয় আনা পয়সা দিয়ে জ্যাকবকে ছাড়িয়ে আনা হল।

জ্যাকবের জন্যে একবার এই ছয় আনা খরচ হয়েছিল। আরেকবার কোথায় যে তার কাঁটায় না ভাঙা টিনের বেড়ায় সারা শরীর কেটে, রক্তারক্তি করে জ্যাকব বাড়ি এসেছিল। সেবার দুটাকা ভিজিট দিয়ে সরকারি পশু হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ডেকে এনে জ্যাকবের চিকিৎসা করা হয়।

খুব রোদ্দুর হলে জ্যাকব আমাদের দালানের উত্তর দিকের ছায়ায় আমগাছের নিচে গিয়ে থাকত। কিন্তু এখান থেকে পুরো বাড়িটা নজর রাখা যেত না। তাই অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলে সে যজ্ঞডুমুরতলাই পছন্দ করত, নেহাত ঝড়বৃষ্টি হলে কাছারিঘরের বারান্দায় আশ্রয় নিত।

জ্যাকব কী করে যেন মক্কেলদের দেখলে বুঝতে পারত। সে তাদের কিছু বলত না। ডাকপিওন এবং খবরের কাগজওয়ালাকেও সে চিনে ফেলেছিল। এর বাইরে বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখলে সে তাড়া করে যেত। তার বিশেষ রাগ ছিল গোয়ালা, কলু এই জাতীয় লোকদের ওপরে, যারা মাথায় কিংবা কাঁধে বা বাঁকে করে কিছু নিয়ে আসত। নাক ফুলিয়ে, গরম নিঃশ্বাসের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে জ্যাকব তাড়া করে যেত। তার সেই হিংস্র মূর্তি যে দেখত, তারই বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

জ্যাকব অনেক সময় আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে যেত। আমরা ক্লাসে থাকতাম, জ্যাকব মাঠে ঘুরে বেড়াত বা রাস্তার ধারের ঘাস খেত। তবে খোঁয়াড়ে বন্দী হওয়ার ঘটনার পর আর সে ইস্কুলের দিকে যায়নি।

কোনো কোনো দিন বেশি মক্কেলের ভিড় থাকলে সেই মক্কেলদের ভিড়ের পিছনে বাবা ও ঠাকুর্দার সঙ্গে জ্যাকবও আদালতে যেত। আদালতের লম্বা বারান্দায় জ্যাকব উঠে খটখট করে হাঁটত। পেয়াদা-পেশকাররা তাকে অনেক সময় বারান্দা থেকে জোর করে নামিয়ে দিত আদালতের কাজে ব্যাঘাত হবে বলে।

বাড়ির মধ্যে এবং বাড়ির কাছাকাছি জ্যাকবের যে অখণ্ড প্রতাপ ছিল, বাইরে কিন্তু তা ছিল না, এসব ক্ষেত্রে সে যথাসাধ্য নরম হয়েই থাকত।

জ্যাকবের সব কথা বলা যাবে না, শুধু জ্যাকবের একটা খারাপ দোষের কথা না লিখলে এ উপাখ্যান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

জ্যাকবের চরিত্রদোষ ছিল। তার কাঁধের ঘা যে কোনো প্রাকৃতিক কারণেই হোক, তার একটু ছুঁকছুঁক বাতিক ছিল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক। কোনো মাদি ঘোড়ার প্রতি কোনো দুর্বলতা তার কখনও দেখা যায়নি। কোনো ঘোড়ার প্রতিই তার কোনো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু মহিলাদের প্রতি তার ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পাড়ার পুকুরে মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশে একটা মানকচুর ঝোপ ছিল। মশা আর মাছির অত্যাচার সহ্য করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোলুপ নয়নে স্নানরতা রমণীদের পর্যবেক্ষণ করত। তার সেই কামাতুর দৃষ্টি বহু রমণীই লক্ষ করেছিলেন, তাঁরা স্নানের ঘাট থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে বাড়ির পথে যেতে ঘোড়াটাকে কটাক্ষ করে যেতেন, 'কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে দেখছে! বদমাইশ ঘোড়া!'

এ রকম গালাগাল শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নামিয়ে মাথা সরিয়ে নিত জ্যাকব। অনেক সময় গভীর রাতেও নাকি নিশাচর হয়ে লোকের বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে জ্যাকব মাথা গলাত। এ ধরণের নালিশও কয়েকবার আমাদের কাছে এসেছে।

সবচেয়ে মারাত্মক হল, সেবার যখন কালীবাড়িতে হরি সংকীর্তন হল। এক সুন্দরী মাঝবয়সী বোষ্টমী মধুর গলায় কীর্তন গেয়ে আমাদের শহর মাত করে দিয়েছিল। বড়ো বড়ো ডাক্তার-উকিল অনেকেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। জ্যাকবও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনেক মানুষের ভিড়ে কালীবাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে জ্যাকবও মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণবীর গান শুনত।

অবশেষে সংকীর্তন পালা শেষ হওয়ার পরের দিন যখন বোষ্টমী ডুলিতে উঠে স্বগ্রামের দিকে রওনা হল, সেই ডুলির পিছুপিছু খোঁড়াপায়ে জ্যাকবকেও যেতে দেখা গেল।

আমরা খবর পেলাম ঘণ্টাখানেক পরে। বাড়ির বয়স্ক পুরুষমানুষেরা বাবা ঠাকুর্দা, মুহুরিবাবুরা তখন আদালতে চলে গেছে। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। আমি আর আমার দাদা দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে ছুটলাম বোষ্টমীর বাড়ির পথে। প্রায় আধঘণ্টা পরে জ্যাকবকে ধরতে পারলাম। আমাদের দেখে সে কেমন হকচকিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে ফিরে এল।

চার

ভালো-মন্দয়, সুখে-দুঃখে জ্যাকব আমাদের বাড়িতে অনেকদিন রয়ে গেল।

এর মধ্যে কিসে যে কী হয়ে গেল। কেউ কিছু ভালো করে বুঝবার আগেই জায়গাটা পাকিস্তান হয়ে গেল! চোদ্দোপুরুষের ভিটেয় আমরা পরগাছা হয়ে গেলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মন্বন্তরও আর নেই। চারদিক বেশ সুস্থির হয়ে এসেছে। এর মধ্যে শুরু হল হানাহানি, মারামারি, গোলমাল! আগুনের আঁচ আমাদের সেই ছোটো শহরেও গিয়ে লাগল।

তখন ঠাকুর্দা মারা গেছেন। আজিমাও অনেকদিন বেঁচে নেই। বাবাই সংসারের কর্তা। গোলমালের মধ্যে বাবা দিন সাতেক নানা জায়গায় ঘুরে একদিন ফিরে এলেন। এসে বললেন, 'সব দেখেশুনে এলাম। ওদিকেই প্র্যাকটিস করব। বাড়ি ঠিক করে এসেছি। খুব ছোটো, কী আর করা যাবে? এখানে থাকা যাবে না।'

ঠিক হল, প্রথমে দাদা আর পটলমামা যাবে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে আমরা পরে যাব। এর মধ্যে যা কিছু সম্ভব বিক্রিবাট্টা করে বাবা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নেবেন।

এসব অবশ্য হয়নি। কিছুই বিক্রিবাট্টা করা হয়নি। দেশও আমরা পুরোপুরি ছেড়ে আসিনি।

কিন্তু সে অন্য গল্প। এখন জ্যাকবের গল্পটা শেষ করি।

পাকিস্তান হওয়া মাত্র পাসপোর্ট-ভিসা চালু হল না বটে, কিন্তু সীমান্ত চৌকি বসল। সীমান্তের দুই পারে দুই দেশের চৌকি, সেখানে কাস্টমস আর পুলিসের ছাউনি।

আমাদের বাড়ি থেকে সীমান্ত খুব দূরে নয়। বাবা একদিন পটলমামাকে নিয়ে ওপারে নতুন ঠিক করা বাড়ি দেখিয়ে আনলেন। ফেরার পথে সীমান্তচৌকির পুলিস-ছাউনিতে আনসারবাহিনীর একজন চেনা লোক বাবাকে বলল, 'উকিল সাহেব, খুব বেশি এপার-ওপার করছেন!' বাবা এ কথায় কিছু মনে করলেন না, কিন্তু লোকটা আগে যখন আমাদের শহরে একটা গুড়ের গোলায় কাজ করত তখন বাবাকে 'উকিলবাবু বলত, এখন কেন 'উকিলসাহেব' বলল, এতে বাবার মনে খুব খটকা লাগল।

সেই দুর্দিনের যুগে মানুষের মনে এরকম কত খটকা লেগেছিল। তার কিছু কিছু এখনও ভাঙেনি। সে কথা থাক, বাড়িতে ফিরে এসে ঠিক হল, পটলমামা আর দাদা দুজনে দুটো সাইকেলে চড়ে ইণ্ডিয়ায় যাবে। দুটো সাইকেল ওপারে আমাদের নিজের দেশে পৌঁছে যাবে, এটা কম কথা নয়। এই সময় পটলমামা বললেন, 'জ্যাকবকেও নিয়ে যাই। ঘোড়াটা সারাজীবন কোনো কাজ করল না। ওর পিঠে চড়িয়ে কয়েকটা বাক্স-বিছানা ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাব।'

পটলমামা প্রথম থেকেই জ্যাকবকে পছন্দ করতেন না, এবার ওঁর এই পরামর্শ শুনে বাবা চটে গেলেন, বললেন, 'জ্যাকব এই বুড়ো বয়েসে মাল বইতে যাবে কোন দুঃখে? তবে তোমাদের সঙ্গে জ্যাকবও যাক, পথে তোমাদের দিকে নজর রাখবে। আর ইণ্ডিয়াতে গিয়েও নতুন বাসাটা পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে পারবে।'

একদিন সুপ্রভাতে দুটো সাইকেলে দাদা আর পটলমামা, সেই সঙ্গে পাশে জ্যাকব, এই ত্রয়ী ইণ্ডিয়ায় রওনা হল। অনেকদিন পরে সেই লাগামটা—যেটা পরে জ্যাকব আমদের বাড়িতে প্রথম এসেছিল, সেটা খুঁজে বার করে জ্যাকবকে

পরানো হল। রওনা হওয়ার আগে সকলের সঙ্গে জ্যাকবও কালীবাড়িতে প্রণাম করতে গেল।

প্রথমে পটলমামা, সাইকেলে, তার পিছনে দাদু, তার ডানহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরা, বাঁহাতে জ্যাকবের লাগাম। কিন্তু লাগাম দরকার হল না। জ্যাকব কী বুঝেছিল কে জানে, রওনা হওয়া মাত্র সে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মা বললেন, 'জ্যাকব বোধহয় যেতে চাইছে না। ওর লাগামটা খুলে দাও।'

লাগাম খুলে দেওয়ার পর দেখা গেল জ্যাকবের যেতে কোনো আপত্তি নেই, তার যা কিছু আপত্তি সেই লাগামে। একটু পরে দাদা আ:" পটলমামা আবার যেই রওনা হল, জ্যাকবও সেই সাইকেল দুটির সঙ্গে ছুটতে লাগল।

কিন্তু জ্যাকব ইণ্ডিয়ায় পৌছতে পারেনি। সেই যে আনসার বাবাকে বলেছিল 'উকিলসাহেব', সে দাদা আর পটলমামার সাইকেল দুটো আটকে দিল আর জ্যাকবকে দেখে বলল, 'এই পাট কোম্পানির ঘোড়াটা আপনারা চুরি করে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন? এটা নেওয়া যাবে না।'

পটলমামা এত সামান্য কারণে দমবার লোক নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের ওপারে ইণ্ডিয়ার সরকারি রিফিউজি ক্যাম্পে চলে গেলেন, সেখানে মাত্র দুটাকা ব্যয়ে একটা রিফিউজি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন জ্যাকবের নামে। কিন্তু তাতেও এখানে কাজ হল না। আনসার সাহেব জ্যাকবের রিফিউজি সার্টিফিকেট দেখে রাগে কুচি কুচি করে সেই সার্টিফিকেটের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন।

কী আর করা যাবে, কিছুই করার ছিল না তখন। দাদা আর পটলমামা সাইকেল দুটো খুইয়ে ওপারে চলে গেল, জ্যাকব ওখানেই রয়ে গেল। দাদা নাকি একবার বলেছিল, 'জ্যাকবকে বাড়িতে গিয়ে রেখে আসি।' পটলমামা বলেছিলেন, 'সে আরও হাঙ্গামা হবে। আর জ্যাকব নিজে নিজেই পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে। ওকে কে আটকাবে?'

কেউ আটকায়নি হয়তো, কিন্তু জ্যাকব আর বাড়ি ফেরেনি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকির তার-কাঁটা বেড়ার পাশে সে আপনমনে ঘুরে বেড়াত, আমরা এরপরে বহুবার যাতায়াতের পথে তাকে দেখেছি। জ্যাকবও আমাদের দেখতে পেয়েছে, দেখে এগিয়ে এসেছে কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যায়নি, শুধু আমাদের আসা-যাওয়ার পথের দিকে উদাস, অতল কালো চোখে তাকিয়ে থাকত।

বহুদিন ও-পথে আমাদের আর যাতায়াত নেই। জ্যাকব নিশ্চয়ই এতদিন আর বেঁচেও নেই।

তবু ওখান দিয়ে আর কখনও যদি যাই, নিশ্চয়ই জ্যাকবের খোঁজ করব।

ব্লটিং পেপার

এই গরমে কেউ কাশী যায়? যায়। অবশ্যই যায়। কাশী অর্থাৎ বেনারস যাওয়ার রেলের কামরাগুলো কি ফাঁকা থাকে? থাকে না। ভিড়ে গিজ গিজ করে। যে কোনো রেলের অফিসে সিট রিজার্ভ করতে গেলেই ব্যাপারটা টের পাওয়া যাবে।

প্রমথেশও টের পেয়েছিল। এবং টের পেয়ে খুশি হয়েছিল এই কারণে যে সে ছাড়াও এই ভরা গরমে আরও ঢের ঢের লোক আছে কাশী যাওয়ার। এরা সবাই কী আর কাজে-কর্মে, প্রয়োজনে কাশী যাচ্ছে, কেউ কেউ নিশ্চয়ই বেড়াতেও যাচ্ছে।

প্রমথেশ বেড়াতেই যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে একটু খ্যাপাটে ধরনের লোক। সংসারী মানুষ, অনতিযুবতী স্ত্রী, দুই কিশোরী কন্যা। একটি মাঝারি মাপের চাকরি। কাজকর্ম, সংসারধর্ম পালন ইত্যাদি প্রমথেশ প্রায় ঠিকঠাকই করে কিন্তু তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে একটা খ্যাপামি আছে। সে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ যাযাবর। সব সময়ে তার মন উচাটন, কোথায় যাই, কোথায় যাই? একনাগাড়ে দুই সপ্তাহের বেশি ঘরে তার মন বসে না। কিন্তু সব সময়ে বেরনো সম্ভব হয় না। তবে মাস দুয়েকের মাথায় সে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বাইরে বেরতেই হবে।

প্রমথেশের স্ত্রী ভাস্বতী। সে সব সময় সামলায়। প্রমথেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার হুটহাট বেরনো সম্ভব হয় না। দুই মেয়ে আছে, তাদের ইস্কুল আছে। বাড়িতে চাঁদা নামে একটা সাদা বেড়াল আছে, সে সারাদিন ভাস্বতীর পায়ে পায়ে ঘোরে। কোথাও বাইরে গেলে সেই বেড়ালের দেখাশোনা, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে যেতে হয়। এইরকম অজস্র ঝামেলা।

দুয়েক মাস অন্তর প্রমথেশ একাই বেরিয়ে পড়ে। কখনও কাছে-পিঠে দীঘায় বা মুকুটমণিপুরে। কখনও বা পুরী-দার্জিলিং। পয়সা ও সময় থাকলে দিল্লি, মুম্বই, মাদ্রাজ। কন্যাকুমারী, একবার নেপাল এবং আরেকবার বাংলাদেশেও গিয়েছিল। তবে প্রমথেশ স্বার্থপর নয়। যেখানেই যাক বাড়ির সকলের জন্য, এমনকি চাঁদা বেড়ালের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে। বেরিয়ে ফেরার সময় মিষ্টি নিয়ে আসার একটা রীতি আছে, সে রীতিটাও বেশ মান্য করে চলে প্রমথেশ।

কাশী থেকে আসার সময় এক হাঁড়ি প্যাঁড়া নিয়ে এসেছে প্রমথেশ। ভাস্বতীর জন্যে শাড়ি এনেছে, বেশ দামি শাড়ি। মেয়ে দুটির জন্যে শালোয়ার-কামিজ। আর

চাঁদা বেড়ালের জন্যে একটা কাঠের ইঁদুর, কাঠের ইঁদুরের ঘাড়টা হাওয়া লাগলেই নড়ে।

আজ ট্রেনটা প্রায় ঠিক সময়েই এসেছে। হাওড়া স্টেশনে একটা শেয়ার ট্যাক্সিতে কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড দিয়ে প্রমথেশ সকাল-সকালই বাড়ি এসে পৌঁছেছে। এখন খাওয়ার টেবিলে সে প্যাঁড়ার হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বসেছে।

এক মুঠো মানে বেশ কয়েকটা প্যাঁড়া বের করে সামনের প্লেটে রাখল প্রমথেশ। পায়ের নিচে চাঁদা বেড়াল ঘুরঘুর করছিল। তাকে একটা প্যাঁড়া দিল। চাঁদা প্যাঁড়াটা কুটকুট করে দাঁতে কেটে খেতে লাগল।

কিন্তু ভাস্বতী ভাবেনি হাঁড়ির মধ্যে প্যাঁড়া আছে, সে ধরে নিয়েছিল এটা রাবড়ির হাঁড়ি। সুতরাং প্যাঁড়া দেখে সে স্বগতোক্তি করল, 'ভেবেছিলাম রাবড়ি বুঝি।'

অনুচ্চ কথাটা কিন্তু প্রমথেশের কানে গেল। এবং সেই মুহূর্তে একটা গভীর অনুশোচনা তার মনের মধ্যে দেখা দিল।

এক সময় পিসিমা-জেঠিমার সঙ্গে, তার আগে ঠাকুমার সঙ্গে এবং এই সেদিন পর্যন্ত বাবা-মার সঙ্গে, যতদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন, বারবার গয়া-কাশী-বৃন্দাবন গিয়েছে প্রমথেশ তার অবিবাহিত বয়েসে। কু-ঝিক-ঝিক রেলগাড়ি। রঙিন স্টেশনে, বিচিত্র খাদ্য ও পসরা, এ সবের মধ্যে কাশীর প্রধান আকর্ষণই ছিল রাবড়ি। ঘন রাবড়ি দিয়ে হাতে গরম বড়ো বড়ো ফুলকো লালরুটি তার চেয়ে সুখাদ্য জগৎসংসারে কোথাও নেই।

ভাস্বতী রাবড়ির কথা জিজ্ঞেস করা মাত্র সরল ও সৎ প্রমথেশ থমকে গেল। সত্যিই তো এত কটা দিন কাশীতে থাকলাম, রাবড়ির কথা মনে পড়ল না।

এবার কাশীতে একদিনও রাবড়ি খায়নি প্রমথেশ, তার কোনো দোষ নেই। এক সময়ে কাশীর আকাশ-বাতাস ম-ম করত রাবড়ির উষ্ণ সৌরভে। ঘন দুধের মাদক ঘ্রাণ ভাসত বাতাসে। সন্ধ্যার পরে লোকেরা মন্দির থেকে ফেরার পথে ভাঁড় ভর্তি রাবড়ি আর হাতে গড়া রুটি নিয়ে যেত। তাই দিয়ে নৈশাহার হয়ে যেত রীতিমতো চেটেপুটে।

এবার প্রমথেশ গিয়ে উঠেছিল এক টুরিস্ট লজে। দুবেলা খেয়েছেও সেখানে। সেই ভাত-ডাল, রুটি-মাংস, সবজি এ সব জায়গায় যেমন হয় আর কী। রাবড়ি কেন, কোনো মিষ্টিই খাওয়া হয়নি। রাস্তাঘাটেও মিষ্টির দোকান নজরে আসেনি। তার বদলে সারি সারি ভুজাওয়ালার দোকান।

আসার দিন স্টেশনের কাছের পুরোনো মিষ্টির দোকানটা থেকে হঠাৎ খেয়াল করে এই প্যাঁড়াগুলো কিনে এনেছে প্রমথেশ। যতদূর মনে পড়ছে, সে দোকানেও রাবড়ি দেখেনি, দেখলে নিশ্চয়ই কিনে আনার কথা মনে হত।

এখন ভাস্বতী রাবড়ির কথা উল্লেখ করায় প্রমথেশ বলল, 'দ্যাখো, কী আশ্চর্য কাণ্ড! এবার কাশীতে কোথাও রাবড়ি দেখলাম না।'

ভাস্বতী প্রশ্ন করল, 'তুমি খুঁজেছিলে?'

প্রমথেশ বলল, 'না খুঁজিনি। কিন্তু ওখানে তো ষাঁড়, সন্ন্যাসী আর রাবড়ির জন্যে খোঁজাখুঁজি দরকার পড়ত না। প্রথম দুটো এখনও আছে কিন্তু রাবড়িটা গেছে।'

তারপর একটু থেমে প্রমথেশ বলল, 'কাশী থেকে রাবড়ি আনিনি তাই কী হয়েছে, আমি বড়োবাজারে সত্য নারায়ণ পার্কের কাছে একটা দোকান চিনি, দুর্দান্ত রাবড়ি বানায়, কাশীর রাবড়ির থেকে কোনো অংশে কম নয়।'

ভাস্বতী বলল, 'সে দোকানের রাবড়ি শেষ কবে খেয়েছ? অন্তত পনেরো বছর আগে। সে দোকান এখনও আছে তো?'

ভাস্বতীর আশঙ্কাই সত্যি হল।

একদিন বিকেলবেলা অফিস ছুটির পর প্রমথেশ বড়োবাজারে সেই রাবড়ির দোকানের খোঁজে গেল। বড়োবাজারের রাস্তাঘাটের সঙ্গে সুপরিচয় না থাকলে সেখানে হাজারো গলিঘুঁজির মধ্যে কোনো কিছু খুঁজে বের করা কঠিন। রাস্তায় কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না বা বলতে চায় না। সেই সব দুর্ভেদ্য গলির মধ্যে ট্যাক্সি, রিক্সা কিছু নিয়েই ঢোকা কঠিন। পায়ে হেঁটে, ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি করে সেই পুরোনো রাবড়ির দোকানটা খুঁজল প্রমথেশ। কিন্তু পেল না।

রাস্তাঘাট, দোকানপাটের চেহারা খুব একটা পাল্টায়নি। ঠিক জায়গাতেই প্রমথেশ শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু সেই প্রাচীন দোকানটা আর নেই। সেখানে ঝলমল করছে এক ভুজাওয়ালার দোকান। আজকাল যেমন হয়েছে সব পাড়ায় পাড়ায়, চানাচুরের চেন স্টোর, মার্কিনি বাণিজ্যের কালোয়ারি সংস্করণ।

ক্লান্ত, গলদঘর্ম হয়ে বাসায় ফিরে ব্যর্থ প্রমথেশ ভাস্বতীকে কিছু বলল না। তবে মনে মনে স্থির করল, কাশীর রাবড়ির মতো উচ্চমানের না হলেও সাধারণ মানের রাবড়ি কোনও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে আনতে হবে। ভাস্বতী তো আর দৈনিক রাবড়ি খায় না। বলতে গেলে দুচার বছরেও একদিন খায় না, সে সাধারণ রাবড়ি খেয়েই খুশি হবে।

কিন্তু রাবড়ি কেনা এত সোজা ব্যাপার নয়। পাড়ার আশেপাশে সমস্ত মিষ্টির দোকানে খোঁজ করল প্রমথেশ। কোথাও রাবড়ি পাওয়া যায় না। সন্দেহ হল, কোনো কোনো দোকানদারের প্রশ্নসূচক এবং বিস্ময়বোধক কথায়, নতুন যুগের মিষ্টিওয়ালারা অনেকে রাবড়ির নামই শোনেনি।

বাসায় এসে এ কথা বলতে ভাস্বতী বলল, 'বলছ, কাশীতেই রাবড়ি দেখলে না। কলকাতায় দেখতে পাবে, আশা কর কী করে?'

প্রমথেশের চেষ্টা কিন্তু কমল না। সে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। রাস্তাঘাটে, বাজারে যেখানেই বড়ো মিষ্টির দোকান দেখতে পায় সে গিয়ে রাবড়ির খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও রাবড়ি নেই।

অফিসে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করল প্রমথেশ।

সব অফিসেই দুচারজন সবজান্তা লোক থাকে তারা মেয়ের গানের মাস্টারের খোঁজ থেকে কোথায় জণ্ডিসের মালা পাওয়া যায়, কোন্ ঘোড়া এই শনিবারের রেসে অবশ্যই জিতবে—সব কিছুর হদিস দিতে পারে।

প্রমথেশের কথা শুনে বলাইবাবু বললেন, 'রাবড়ি পাবে তুমি ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজরের পিছনের রাস্তায়।' বলাইবাবু কালীঘাটের বাসিন্দা, তাঁর পক্ষে এটা অবশ্য জানা সম্ভব।

একজন আবার বড়োবাজারের কথা বললেন। কিন্তু প্রমথেশ আর বড়োবাজারে যাবে না। একবার গিয়ে যথেষ্ট নাজেহাল হওয়া গেছে। ন্যাড়া বেলতলায় কবার যায়?

তবে তালতলার হরেন চক্রবর্তী বললেন, 'আমাদের পাড়ার কাছেই জানবাজারে রাবড়ি পাওয়া যায়। রানি রাসমণির বাড়ির উল্টো দিকে দুটো পুরোনো দিনের হিন্দুস্থানি দোকান এখনও পাশাপাশি আছে।'

প্রমথেশ ঠিক করল জানবাজারেই আগে যাবে। অফিস থেকে হাঁটা পথে মাইলখানেকের মধ্যে পড়ে।

জানবাজারে গিয়ে হরেন চক্রবর্তীর নির্দেশমতো দোকান দুটো খুঁজে বার করতে বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। কিন্তু এ দুটো তো মোটেই মিষ্টির দোকান নয়, বলা উচিত দুধের দোকান। বড়ো বড়ো উনুন গনগন করে জ্বলছে। তার ওপরে বিশাল লোহার কড়াইতে টগবগ করে ফুটছে দুধ। সামনে কাঠের বেঞ্চিতে বসে কাচের গেলাসে দুধ খাচ্ছে খদ্দেররা।

প্রমথেশ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, 'হ্যাঁ, রাবড়ি পাওয়া যাবে। তবে অর্ডার দিতে হবে।'

স্বাভবিকভাবেই এবার প্রমথেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কতটা অর্ডার দিতে হবে এবং দাম কীরকম?' জানা গেল, অন্তত দশ কেজি অর্ডার না দিলে রাবড়ি বানানো সম্ভব নয়। কেজি প্রতি দাম পড়বে তিনশ টাকা করে।

দশ কেজি রাবড়ি এবং তিনশ ইনটু দশ মানে তিন হাজার টাকা। প্রমথেশের

মাথা ঘুরে গেল। সে দোকানের বেঞ্চিতে বসে এক গেলাস গরম দুধ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে ধীরে সুস্থে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু প্রমথেশের মাথা থেকে রাবড়ির চিন্তাটা কিছুতেই গেল না। রাবড়ির মতো অমন স্বর্গীয় সুখাদ্য, সেটা কেন বাজার থেকে উবে গেল।

উত্তরটা কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য পাওয়া গেল। আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মী, পুরোনো বন্ধু—বহু লোকের সঙ্গেই প্রমথেশ এ নিয়ে আলোচনা করেছে।

প্রমথেশের প্রবীণ প্রতিবেশী গোবিন্দলাল ঘোষ একদা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ের অনেক ফাঁকফোকর তাঁর জানা আছে। ভদ্রলোক এখন একটি স্টেশনারি দোকান চালান।

এই গোবিন্দলালবাবু একটি চমকপ্রদ খবর দিলেন। রাবড়ি বাজার থেকে উঠে গেছে তার একমাত্র কারণ হল যে বাজারে এখন আর ব্লটিং পেপার পাওয়া যায় না। প্রথমে ফাউন্টেন পেন এবং তার পরে ডট কলমের এই যুগে ব্লটিং পেপারের আর প্রয়োজন নেই, কাগজের কোম্পানিগুলো আর ব্লটিং পেপার বানায় না।

সংবাদটা শোনার পর প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলিয়ে নিয়ে প্রমথেশ গোবিন্দলালবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্লটিং পেপার? কিন্তু ব্লটিং পেপারের সঙ্গে রাবড়ির কী সম্পর্ক?'

গোবিন্দলালবাবু প্রাজ্ঞের মতো হাসলেন, বললেন, 'আপনার কি ধারণা যে রাবড়ি শুধু দুধ জ্বাল দিয়ে হয়? তাতে খরচা পোষাবে? রাবড়ি বানানোর সময় দুধ জ্বাল দিতে দিতে আস্তে আস্তে ব্লটিং পেপার ছিঁড়ে সেই দুধের মধ্যে দিতে হয়। তারপর যত ঘন হয়ে আসে চিনি দিয়ে সেই দুধ মাড়তে হয়।'

প্রমথেশ বলল, 'কিন্তু আমি অল্প বয়েসে দেখেছি, দুধের কড়ার ওপরে বাঁশের চোঙা দিয়ে ফুঁ দিয়ে কারিগরেরা রাবড়ি বানাচ্ছে। সর জমছে, তারপর সেই সর হাতা দিয়ে ভেঙে আবার ফুঁ দিয়ে সর বানাচ্ছে।'

গোবিন্দলালবাবু বললেন, 'ও সব লোকদেখানো ব্যাপার মশায়। আপনারা আজকাল যাকে বলেন বিজ্ঞাপন। ওপরের দিকে দুয়েক প্রস্থ সর হয়তো করা হয়, কিন্তু নব্বই ভাগই ব্লটিং পেপার।'

গোবিন্দলালবাবুর কথাটা প্রমথেশ অবিশ্বাস করতে পারল না। তাঁর কথার মধ্যে কার্যকারণ যোগ আছে।

সত্যিই তো বাজারে আজকাল ব্লটিং পেপার পাওয়া যায় না। ব্লটিং পেপার কারও প্রয়োজনই হয় না। সে নিজেই বহুদিন ব্লটিং পেপার দেখেনি।

প্রমথেশের আবছা মনে পড়ল, ছোটো বয়সে সেই ইস্কুলে পড়ার সময়ে সে যেন

শিখেছিল ব্লটিং পেপার কথাটা ভুল। ব্লটিং পেপার নয় হবে শুধু ব্লটিং। আজ কিন্তু বিলিতি ডিকশনারি খুলে দেখল, ব্লটিং পেপার কথাটাই আছে, শুধু ব্লটিং নয়।

তা হলে এখন ডিকশনারিতেই শুধু ব্লটিং পেপার রয়েছে। পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো সেই ব্লটিং পেপার, যাকে তারা বলত চোষ-কাগজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে রাবড়ি।

প্রমথেশ সেদিন রাতে শুয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা নিয়ে তলিয়ে ভাবল। আজ কয়েকদিন ধরে ভাস্বতী এবং মেয়েরা লক্ষ করেছে প্রমথেশ একটু অন্যমনস্ক। ভাস্বতীর ধারণা হয়েছিল সে হয়তো আবার বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছে।

ভাস্বতী সেদিন রাতে প্রমথেশকে প্রশ্ন করল, 'আজকাল তুমি কী এত ভাবছ বল তো, দূরে কোথাও বাইরে যাবে নাকি?'

প্রমথেশ বলল, 'না তা নয়। আমি ভাবছি ব্লটিং পেপারের কথা।'

ভাস্বতী অবাক হল, 'ব্লটিং পেপার? ব্লটিং পেপার দিয়ে কী হবে তোমার?'

প্রমথেশ বলল, 'জান আজকাল আর বাজারে ব্লটিং পেপার পাওয়া যায় না।'

ভাস্বতী আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, 'না পাওয়া গেলে আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে শুনি। ডট পেনে ব্লটিং পেপারের তো আর দরকার পড়ে না।'

সেটা প্রমথেশ জানে। কিন্তু তার মনে পড়ছে কাছারি ঘরে মুহুরিবাবু বাজার থেকে একটা বড়ো ব্লটিং শিট কিনে এনে সেটাকে যত্ন করে ছুরি দিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করতেন। তার থেকে অধিকাংশ টুকরো কাছারি ঘরে রেখে তিনটে টুকরো তাঁদের তিন ভাইকে দিতেন। সেই চোষ কাগজ পরম যত্নে ইস্কুলের খাতার মধ্যে রেখে দিত প্রমথেশরা। মাঝে মধ্যে সেটা চুরিও যেত।

অনেকদিন পরে পরীক্ষার হলের কথা মনে পড়ল প্রমথেশের। পরীক্ষার সময় খাতা আর প্রশ্নপত্রের সঙ্গে একচিলতে চোষ কাগজও সরবরাহ করা হত। চারদিনের আটটা পরীক্ষায় আট চিলতে চোষ কাগজ জমে যেত। নির্মম পরীক্ষা পর্বের সেটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ। যত ছোটোই হোক না কেন, আটটা চোষ কাগজ, সেটা কম কথা নাকি, সাত রাজার ধন আট মানিক।

চিন্তাশীল স্বামীকে একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে ভাস্বতী বলল, 'শুধু ব্লটিং পেপারের কথা ভাবছ কেন? এখন কি আর বাজারে কালির বড়ি পাওয়া যায়? স্টিলের নিব, কলমের হ্যাণ্ডেল? লোকের প্রয়োজনই পড়ে না। দোকানদাররাও আর বেচে না।'

সেদিন রাতে কেমন আবছা-আবছা ঘুম হল প্রমথেশের। স্মৃতি আর তন্দ্রা জড়ানো।

কোথায় গেল সেই সব দিন কালি, কলম আর ব্লটিং পেপারের। এই তো সেদিনের কথা, তার বালক বয়েসের কথা. খুব বেশি কাল তো হয়নি। প্রমথেশ সারারাত ধরে স্বপ্ন দেখল, সে দোয়াতে কালিতে চুবিয়ে 'রাবড়ি তৈরির গোপন প্রণালী' নামে একটা রচনা লিখছে ডান হাত দিয়ে নিব লাগানো কাঠের হ্যাণ্ডেলের কলমে। আর বাঁ হাতে ধবধবে সাদা চোষ কাগজে লেখার গায়ের অতিরিক্ত কালি চুষে নিচ্ছে।

স্বপ্নটা শেষ পর্যন্ত একটা গোলমেলে জায়গায় এসে পৌঁছে গেল, প্রমথেশ দেখল সে রাবড়ি ভর্তি বড় গামলায় কলম চুবিয়ে তাই দিয়ে লিখছে। কিন্তু সাদা কাগজে সাদা রাবড়ির দাগ পড়ছে না।

এই সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। সে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে স্থির করল ব্লটিং পেপার এবং তৎসহ রাবড়ির ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

সেদিন থেকে পূর্ণোদ্যমে প্রমথেশ লেগে গেল ব্লটিং পেপারের অনুসন্ধানে, পাড়াগাঁয়ে যাকে গোরুখোঁজা বলে একেবারে তাই আর কী। কিন্তু গোরুখোঁজার একটা দিগ্বিদিক আছে; আশপাশের দুদশটা মাঠ, খেত, গৃহস্থপাড়া, বাঁশঝোপ, বড়ো জোর পঞ্চায়েতের খোঁয়াড় পর্যন্ত কিন্তু অবলুপ্ত ব্লটিং পেপারের অনুসন্ধানের কোনও নির্দিষ্ট পন্থা থাকা সম্ভব নয়।

তবু প্রমথেশ চেষ্টার ত্রুটি করল না। সে প্রথমে ভেবে নিল, আগে কোথায় কোথায় ব্লটিং পেপার পাওয়া যেত। মুদিখানা, স্টেশনারি আর অফিসের কাগজপত্র, সাজসরঞ্জামের দোকান।

বেছে বেছে পুরোনো আর বড়ো দোকানগুলোয় খোঁজ করতে লাগল প্রমথেশ। যেদিন মানুষেরা শেষবারের মতো ব্লটিং পেপার কেনা বন্ধ করে দিল, সেদিন নিশ্চয় কোনো কোনো দোকানে কিছু স্টক অবশিষ্ট ছিল। সেই স্টকের অবশিষ্টাংশ, সে দুটো-চারটে-দশটা যাই হোক সেগুলো দোকানে নিশ্চয় আজও পড়ে আছে, দোকানদারেরা কোনো জিনিস ফেলে দেওয়ার লোক নয়।

অবশ্য প্রমথেশ আবার এটাও বিবেচনা করল যে, মিষ্টান্ন বিক্রেতারা সে গুলো সে সময়ে কিনে নিয়ে যেতে পারে এবং ওই অবশিষ্ট ব্লটিং পেপারগুলো দিয়েই সংসারের শেষ রাবড়িটুকু প্রস্তুত হয়েছিল।

সে যা হোক, প্রমথেশ হন্যে হয়ে খোঁজ চালিয়ে যেতে লাগল। খিদিরপুর বাজার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত. কত বিচিত্র সব দোকান সোলেমান ব্রাদার্স, মোক্ষদা ভাণ্ডার, ইম্পিরিয়াল স্টোর্স। বৌবাজার, চৌরঙ্গি অঞ্চলে ভিক্টর অ্যাণ্ড কোম্পানি, জয়হিন্দ বিপণি।

নাম দেখে অনেক সময় বয়স বোঝা যায়, মানুষের যেমন দোকানেরও তাই।

ভিক্টর মানে পঁয়তাল্লিশ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের পরে কোনো ইংরেজ ভক্তের দেওয়া নাম, ইম্পিরিয়াল---তারও দশ-বিশ কিংবা বেশি বছর আগেকার। জয়হিন্দ স্বাধীন ইত্যাদির জন্মসাল অনুমান করা কঠিন নয়। তবে এরই মধ্যে আদি ও অকৃত্রিম মোক্ষদা ভাণ্ডার বা গন্ধেশ্বরী স্টোর্স এমনকি সোলেমান ব্রাদার্সের বয়েস ধরা কঠিন।

বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হল প্রমথেশের। কেউ কেউ সংক্ষিপ্তভাবে 'নেই' বলে বিদায় দিল। কেউ কেউ দোকানের আলমারি, কাগজের র‍্যাক খুঁজে বলল, 'ফুরিয়ে গেছে।' কতদিন আগে ফুরিয়ে গেছে, আর কখনও পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। পারবেই বা কী করে?

গড়িয়াহাট বাজারের বড়ো মুদিখানা দোকানের এককড়িবাবু, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী 'ব্লটিং পেপার' শুনে কেমন ঝিম মেরে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, 'ব্লটিং, ব্লটিং পেপার। কতদিন পরে মনে করিয়ে দিলেন দাদা। এই ক্ষীরের পুর ভর্তি বড়ো বড়ো লাল পানতুয়া, কাতলামারি বিলের চিতল মাছ, খেরসাপাতি আম, পকেট ঘড়ি, ইস্টিমার'....ভদ্রলোক চোখ বুজে বলে যাচ্ছিলেন। বিনা কাজ ব্যয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়ল প্রমথেশ।

অন্য একটা দোকান থেকে অবশ্য এত সহজে পার পেল না। সে দোকানের নীতিই হল খদ্দেরকে কখনও ফিরিয়ে না দেওয়া, ''নেই' না বলা। শতাব্দী প্রাচীন জয় জয় মাতা গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার, শতাব্দীর থেকে এক দশক কম বয়সী দোকানের মালিক এখনও দোকানে দু'বেলা ঘণ্টাখানেক করে বসেন। তিনি ব্লটিং পেপার শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কয় শিট লাগবে।' এতটা প্রমথেশ আশা করেনি। সে বলল, 'দুশিট হলেই হবে।' দোকানি তখন একজন কর্মচারীকে ডেকে দুশিট ব্লটিং পেপার আনতে বললেন। কিন্তু ব্লটিং পেপার কোথায়? বৃদ্ধের বিশ্বাস কয়েকদিন আগেও ছিল। কিন্তু সেই কয়েকদিন তিরিশ বছর আগে চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি হল, কিন্তু পাওয়া গেল না। দোকানের সামনে প্রমথেশকে আশায় আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল ঘণ্টাখানেক।

অন্য একটা সাত্ত্বিক দোকানে ব্লটিং পেপার চাইতে তারা ভাবল টয়লেট পেপার। দাঁত খিঁচিয়ে তারা বলল, 'ও সব নোংরা জিনিস আমরা বেচি না মশায়।' কষ্ট করলে কেষ্ট অবশ্যই মেলে। একদিন প্রমথেশের ভাগ্যেও ব্লটিং পেপার মিলে গেল। এবং সে কোনো দোকানে বা বাজারে নয়, তার নিজেরই অফিসে একটা পুরোনো আলমারির মধ্যে।

অফিসের পুরোনো দলিলপত্র এই সাবেক কালের অতিকায় আলমারিটার

মধ্যে থাকে। একটা তিরিশ বছর মেয়াদি লিজের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। সেই লিজ-ডিডটা আলমারির মধ্যে খুঁজছিল প্রমথেশ। ঠিক ওপরের তাকে দলিলটা সহজেই পেয়ে গেল প্রমথেশ, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পাওনা হল যখন সে আবিষ্কার করল, দলিলের স্তূপের নিচে রয়েছে একগাদা ভাঁজ করা ব্লটিং পেপার। বার করে গুনে দেখল প্রমথেশ, সবসুদ্ধ আটটা রয়েছে। বহুকাল আগে তুলে রাখা আছে, তারপর আর ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি। অফিসে সেই কবে কালি-কলমের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

তা এতগুলো ব্লটিং পেপারের এখন মোটেই প্রয়োজন নেই প্রমথেশের। একটা হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট।

আলমারি থেকে লিজের দলিলটার সঙ্গে একটা ব্লটিং পেপারই বার করল প্রমথেশ। টেবিলে নিয়ে এসে সেটা একটু শুঁকল প্রমথেশ। তার মনে আছে, ব্লটিং পেপার ঠিক ঘ্রাণহীন ছিল না, কেমন একটা হালকা বোঁদা গন্ধ ছিল। সে গন্ধটা অবশ্য আজ সে পেল না। কেমন একটা পুরোনো-পুরোনো গন্ধ, তা অন্তত পঁচিশ ত্রিশ বছরের পুরোনো তো বটে। প্রমথেশের মনে পড়ে না সে এই অফিসে ঢোকার পরে ব্লটিং পেপারের ব্যবহার দেখেছে।

একটা আস্ত ব্লটিং পেপার অফিস থেকে নিয়ে যাওয়া চুরির পর্যায়ে পড়ে। ব্লটিং পেপারটা বেশ কুচিকুচি করে ছিঁড়ে সে একটা প্লাস্টিকের ঠোঙায় পুরে বাড়ি নিয়ে এল।

ভাস্বতী প্রমথেশের হাতে ঠোঙা দেখে ভেবেছে অফিস থেকে আসার পথে মোড়ের দোকান থেকে প্রমথেশ বোধহয় গরম সিঙ্গাড়া কিনে এনেছে। কখনও কখনও সে এরকম আনে। কিন্তু আজ ঠোঙাটা হালকা দেখে সেটা খুলে কাগজের টুকরোগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল ভাস্বতী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কী?'

প্রমথেশ বলল, 'ব্লটিং পেপারের টুকরো। বহু ভাগ্যে পেয়েছি।'

ভাস্বতী অবাক হল, 'এগুলো কী কাজে লাগবে?' এর জবাবে প্রমথেশ যখন বলল, 'এগুলো দিয়ে রাবড়ি তৈরি হবে', ভাস্বতী রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেল। সে ঠোঙার মধ্যে ব্লটিং পেপারের ছেঁড়া টুকরোগুলো অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, 'রাবড়ি? ব্লটিং পেপার দিয়ে রাবড়ি?'

সেদিন সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে প্রমথেশ ভাস্বতীকে রাবড়ির অন্তর্ধান রহস্য ব্যাখ্যা করল। ভাস্বতী সমস্ত কথা শুনে খুব একটা রোমাঞ্চিত হল এমন কথা বলা যাবে না, তবে বার কয়েক 'তাই নাকি', 'তাই নাকি' বলল।

পরের রবিবার দিন সকালবেলা প্রমথেশ মাদার ডেয়ারির দোকানে লাইন

দিয়ে চার লিটার দুধ কিনে আনল। অতটা দুধ এক সঙ্গে জ্বাল দেওয়া যায় এমন পাত্র এ বাড়িতে নেই। পাশাপাশি দুটো গ্যাসের উনুনে একটা গামলায় এবং একটা ডেকচিতে দুধ ভাগ করে জ্বাল দিতে লাগল প্রমথেশ, সামনে একটা থালায় কুচি করে ছেঁড়া ব্লটিং পেপার, তা ছাড়া কৌটো ভর্তি চিনি, ছোটো এলাচের গুঁড়ো—এই সব।

ভাস্বতী প্রথমে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল, সেও প্রমথেশের পাশে এসে দাঁড়াল। দুটি পাত্রে ধীরে ধীরে ব্লটিং পেপারের কুচি, চিনি আর এলাচ গুঁড়ো পরিমাণ মত মিশিয়ে ঘন করে তৈরী হল পৃথিবীর শেষ রাবড়ি।

প্রমথেশ টেস্ট করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে বলল, 'তুমি আগে খেয়ো না। গোবিন্দলালবাবুকে ডেকে আন। উনি আগে খেয়ে দেখুন, গোবিন্দবাবুর কথা মতোই যখন করা হল, আগে উনি চেখে বলুন কেমন হয়েছে।'

মিনিট পনেরো পরে গোবিন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রমথেশ বাসায় এল। তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বলল, 'আজ আপনাকে এমন একটা জিনিস খাওয়াব যা আপনি ভাবতে পারেন না।'

কৌতূহলী গোবিন্দবাবু জানতে চাইলেন, 'জিনিসটা কী?'

প্লেট ভর্তি উষ্ণ রাবড়ি নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাস্বতী বলল, 'পৃথিবীর শেষ রাবড়ি।'

গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাবড়ি পেলেন কোথায়?'

প্রমথেশ বলল, 'বাসায় ব্লটিং পেপার দিয়ে বানিয়েছি।'

গোবিন্দবাবু আশঙ্কান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্লটিং পেপার? ব্লটিং পেপার পেলেন কোথায়?'

প্রমথেশ বলল, 'অফিসের একটা পুরোনো আলমারির তাকে পেয়ে গেলাম। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। দেখেছেন না। পুরোনো ব্লটিং পেপার দুধের মধ্যে কেমন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নিন, একটু টেস্ট করে দেখুন। আপনি খেয়ে তারিফ করলে তারপর আমরা খাব।

গোবিন্দলালবাবু রাবড়ির দিকে তাকিয়ে প্রমথেশের অনুরোধ শুনে দরদর করে ঘামছিলেন। অবশেষে তাঁর হাত থেকে পৃথিবীর শেষ রাবড়ির প্রথম প্লেটটা মেঝেতে পড়ে গেল।

রম্যরচনা

বিবাহ সংক্রান্ত

এক ভদ্রমহিলা আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এনেছিলেন তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। যথাসময়ে আদালতে মামলা উঠলে সাশ্রুলোচনা বাদিনী বললেন, 'আমি টাকা পয়সা খেসারত, খোরপোষ বা ক্ষতিপূরণ কিছুই চাই না আমার এই দুষ্ট স্বামীর কাছে। শুধু এই মহামান্য আদালতে আমার বিনীত নিবেদন আমি এই বিয়ের আগে যে অবস্থায় ছিলাম, আমাকে সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।'

বাদিনীর এই কাতর আবেদনের অর্থ ওই আদালতের মাননীয় বিচারকের কাছে স্বাভাবিক কারণেই খুব প্রাঞ্জল বোধ হয়নি, তাই তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি বিয়ের আগে কী অবস্থায় ছিলেন, কী অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছেন।' বাদিনী শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে জানালেন, 'আমি এই বিয়ের আগে বিধবা ছিলাম হুজুর আপনি আমাকে সেই বিধবা অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।'

প্রাক্তন বিধবা বর্তমান বাদিনী বিবাহ বিচ্ছেদের পর আর বিধবা অবস্থায় ফিরবেন না, তখন তার স্ট্যাটাস হবে ডাইভোর্সড; সুতরাং তাকে বিধবা অবস্থায় ফেরাতে গেলে বর্তমান স্বামীকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়, বলাবাহুল্য জজসাহেব তা পারেন নি। আইনে স্বামী-রত্নকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কোনো বিধান নাই।

সেক্সপীয়ার সাহেব অবশ্য তাঁর মার্চেন্ট অফ ভেনিসে (২য় অংক নবম দৃশ্য) বিয়ে করা এবং ফাঁসি যাওয়া ভাগ্যের একই ব্র্যাকেটভুক্ত করেছিলেন (Hanging and wiving go by destiny)। আবার সক্রেটিসকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন মানুষ বেশি সুখী, যে বিয়ে করেছে নাকি যে অবিবাহিত, ওই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিলেন, 'কোনোদিকেই বিশেষ সুবিধে নেই। তুমি যদি বিয়ে করো তা হলেও অবশ্যই একদিন আফশোস করতে হবে। আর বিয়ে যদি না করো তা হলেও অনুতাপ হবে, বিয়ে করিনি বলে আফশোস করতে হবে।'

'আপনি কেন বিয়ে করেন নি? স্বামী নেই বলে আপনার কোনো কষ্ট হয় না?' এই দুই প্রশ্নের উত্তরে একদা এক মধ্যবয়সিনী চিরকুমারী, ইংরাজিতে যাকে স্পিনসটার বলে; তিক্ত হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার একটা তোতাপাখি আছে সেটা সারাদিন চেঁচায়, আমার একটা শুয়োর আছে যেটা সবসময় ঘোঁত ঘোঁত করে আর একটা হুলো বেড়াল আছে সেটা সারারাত বাড়ির বাইরে থাকে। এর উপরে আমার আর আলাদা করে স্বামীর দরকার কী?'

এই বিলিতি প্রৌঢ়া বিয়ে না করেও যথেষ্ট ভুয়োদর্শিনী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই কথিকাটির একটি বিপরীত সংস্করণ প্রচলিত আছে। সেটি নিশ্চয়ই অনেকে অবগত আছেন, নিজেও আমি একবার লিখেছি বলে সন্দেহ হচ্ছে তবুও প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ করছি।

কাহিনীটি এক নবীন পানিপ্রার্থীকে নিয়ে। সে তার ভাবী বধূ সম্পর্কে বন্ধুদের বলেছিল, 'যে আমার স্ত্রী হবে সে গান গাইতে পারবে, নাচতে পারবে, সে ঝলমলে হবে, স্মার্ট হবে, সব বিষয়ে কথা বলতে পারবে' এই ফিরিস্তি আরো দীর্ঘ হওয়ার আগেই সেই উচ্চাভিলাষী যুবককে তার এক বন্ধু থামিয়ে দিয়েছিল, সেই বন্ধু বলেছিল। 'বুঝতে পেরেছি, তুমি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ না। তুমি বিয়ে করতে চাইছ একটা টেলিভিশন সেটকে। তোমার চাহিদামতো গুণাবলীর সবই তার আছে। যা কোনো একজন মেয়ের মধ্যে পাবে না।'

নববধূর কাছাকাছি যখন এসে গেছি, তখন অন্ততঃ কিছুটা তার কথা বলি। মধুযামিনীতে সুন্দরী নববধূকে তার স্বামী গদগদ করে একটি বোকা প্রশ্ন করেছিল, 'হে রাজকন্যা, আমিই কি তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ? সুন্দরী রাজকন্যা ঠোঁট ফুলিয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি আমাকে এত সস্তা ভাবছ কেন বলো তো?' তারপর একটু থেমে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তা তোমাকে আর দোষ দিয়ে লাভ কী, সব পুরুষ মানুষই দেখলাম এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।'

নব বিবাহ সংক্রান্ত আরেকটি গল্প এর চেয়েও দুঃখজনক। ঠিক গল্প নয় একটি ঘটনা। বিয়ের দু দিনের মধ্যেই শরীর থেকে হলুদ আর আতরের গন্ধ মুছে যাওয়ার আগেই খটমটি লাগল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিপুল কলহ, বাদবিসম্বাদ। সামান্য কারণে এ ওকে দোষারোপ করছে, ও একে শাপ শাপান্ত করছে। এদিকে ডাক বিভাগের গোলমালে বিয়ের প্রায় দশদিন পরে নবদম্পতির কাছে গ্রিটিংস টেলিগ্রাম এল, মধুর নবজীবনে উভয়কে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রবাসী বন্ধু তারবার্তা পাঠিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, স্বামী-স্ত্রী কেউই সেই অভিনন্দন বার্তা গ্রহণ করল না। ইতিহাসে এই প্রথম, অভিনন্দন প্রেরকের কাছে বার্তাটি ফেরত গেল রিফিউসড বলে, (Refused) বলে, যেভাবে উকিলের রেজিস্টার্ড নোটিশ লোকেরা প্রত্যাখ্যান করে হুবহু সেইভাবে। এই দুর্যোগময় আবহাওয়া থেকে এবার আমরা একটু পিছনে তাকাই। বিয়ের আগের ব্যাপার। এক প্রণয়সফল যুবক তার বন্ধুকে জানাল, 'ভাই, এক সঙ্গে যে দুটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি।' বন্ধুটি উৎসাহ দিয়ে বলল, 'চমৎকার। চালিয়ে যাও।' প্রেমিক জানাল 'না ভাই, আর পোষায় না। এবার একটা বিয়ে তো করতে হয়।' বন্ধু তেমনিই তরলভাবে বলল, 'করে

ফেলো' 'এবার যুবকটি বলল, 'ভাই তোমার পরামর্শ কি?' পরামর্শদাতার ভূমিকা পেয়ে সোজা হয়ে বসল, জিজ্ঞাসা করল, 'তা তোমার প্রেমিকা দুটি কে কেমন?' প্রেমিকটি বিশদভাবে দুটি মেয়ের রূপগুণ বর্ণনা করল, যার সংক্ষিপ্তসার হল একটি মেয়ে সুন্দরী, বিদুষী বুদ্ধিমতী কিন্তু বড় গরিব, দ্বিতীয় মেয়েটি তেমন কিছু দেখতে নয়, লেখাপড়াও কম, খুব বুদ্ধিমতী নয়, তবে বড়োলোক। কোটিপতির একমাত্র মেয়ে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

পরামর্শদাতা সুহৃদ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ভাবল, তারপর বলল, 'দ্যাখো টাকা পয়সার কথা ছাড়ো। ওটা কিছু নয়। লেখাপড়া জানা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে লাখে একটাও পাওয়া যায় না। গরিব হোক, তবু তুমি ওকেই বিয়ে করো। জীবনে টাকার ব্যাপারটা বড়ো ব্যাপার নয়।' বন্ধুর সুপরামর্শ পেয়ে প্রেমিকপ্রবর আশ্বস্ত হয়ে বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বলল, 'ভাই তুমি আমার মনের কথা বলেছ। আমিও আজ কয়েকদিন ধরে শুধু ওই কথাই ভেবেছি। আমি ওই গরিব মেয়েটিকেই বিয়ে করব।' এবার পরামর্শদাতার পালা। প্রেমিকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার পর এবং তার অভিমত জানার পর সে বলল 'ভাই, এটা ঠিক খাঁটি মানুষের মতো কথা বলছ এবং তুমি একটা সৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ওই গরিব মেয়েটিকে বিয়ে করার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হয় না। আর এতে তুমি সত্যিই সুখী হবে।' এরপর কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতা, তারপর স্কন্ধদেশে অঙ্গুলি সঞ্চালন, তারপর একাধিকবার কণ্ঠ খাঁকরি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে শ্রীযুক্ত সুপরামর্শ বন্ধু বলল, 'ভাই, অন্য মেয়েটা কেন কষ্ট পাবে? ওই যে বড়োলোকের মেয়েটা ওর ঠিকানাটা দাওতো, আমি না হয় তাকে একটু দেখি।'

মাথা খারাপ

রাজেনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। যখন বোঝা গেল খুব তাড়াতাড়ি সারবার কোন লক্ষণই আর নেই, তাঁর আত্মীয়েরা এবং আমরা তাঁর প্রতিবেশীরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। রাজেনবাবু আজ মাসখানেক অফিস যাচ্ছেন না। ডালহৌসি স্কোয়ারের পাশে পৃথিবীর গোলাকৃতি ধারণ সম্পর্কে তাঁর সংশয় এখনো দূর হয়নি, তদুপরি তাঁর ধারণা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধের খবর কী?'

তখনো আমি কিছু জানি না, কোন্ যুদ্ধ, কিসের খবর কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু ভেবেচিন্তে আমি বললাম, 'চিনেরা তো চুপচাপ করে রয়েছে, ওদের মতিগতি বোঝা কঠিন।'

আর কদিন চুপচাপ থাকবে না থাকতে পারবে, জাপানিরা ওদের সব খেদিয়ে মঙ্গোলিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দেবে।' রাজেনবাবু বিশেষ বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

'কিন্তু জাপান এর মধ্যে কী করবে?' আমার গলার স্বরে সংশয় বোধহয় স্পষ্ট হল। রাজেনবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে বহু কথা বলে গেলেন। যার সারার্থ এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। খবরের কাগজওয়ালারা এই আঠারো-উনিশ বছর ধরে সংবাদ চেপে যাচ্ছে। তবে আর কতদিন চেপে রাখতে পারবে, মিত্র-শক্তির অবিলম্বে পতন অনিবার্য।

ব্যাপাবটা পরিষ্কার হল। আগেও যেন কোথাও শুনেছি না পড়েছি আরেক পাগলের কথা যার নাকি ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। সে যাহোক্, রাজেনবাবুর ডালহৌসি স্কোয়ারে তাঁর অফিসে যাওয়ার মূল অসুবিধে ওটা নাকি মিত্রপক্ষের এলাকা। পাড়ার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁরা ডালহৌসি অঞ্চলের কর্মচারী তাঁর প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তাঁর ধারণা তাঁরা গুপ্তচর। গভীর অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, হুঁ-হাঁ করে দু একটি কথা বলেন।

এই অবস্থায় রাজেনবাবুর স্ত্রী আমাকে একদিন বললেন, 'উনি তো আজ একমাসের ওপর অফিস যাচ্ছেন না। আপনি যদি ওঁর অফিসে গিয়ে একটু দেখেন এই দুদিনে চাকরিটা না যায়। কি যে করি।'

একদিন দুপুরে সময় করে রাজেনবাবুর অফিসে পৌঁছলাম। গিয়ে তাঁর সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'এই ইয়ে। রাজেনবাবুর ব্যাপারে একটা কথা জানাতে এসেছি।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে পিয়ন ডাকলেন, ডেকে কী একটা ইঙ্গিত করে বললেন, 'রাজেনবাবু?' আমি কিছু জানাবার আগেই পিয়ন বেরিয়ে গেল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড্রয়ার থেকে একটা পেন-নাইফ বের করে হাতের নখ কাটতে লাগলেন। আমি বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলাম। একটু পরে পিয়ন ফিরে এসে ইঙ্গিতে কী জানাল। সুপারিন্টেন্ডেন্টবাবু আমাকে জানালেন, 'রাজেনবাবু সিটে নেই।'

তখন আমাকে বলতে হল, 'উনি সিটে নেই, আমিও জানি, আজ একমাস সিটে নেই। সেটাই বলতে এসেছি।'

'ও, কোনো নালিশ আছে?' সুপারিন্টেন্ডেন্ট বেল বাজিয়ে পিয়নকে বললেন, 'এই, এঁকে বরদাবাবুর কাছে নিয়ে যা।'

পিয়ন আমাকে অফিসের মধ্যে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে গেল, তার সামনে বোর্ডে লেখা রয়েছে 'কমপ্লেইনটস'। বরদাবাবু নামে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল, খুব সদাশয়, হাসিহাসি মুখ। যা বললাম সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপরে একটা হাই তুললেন, একটা ডিবে থেকে নস্য বের করে নাকে দিয়ে আবার হাসিহাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। সন্দেহ হল, মাথা খারাপ নয় তো। কিন্তু চোখের চাউনি দেখে তা মনে হচ্ছে না। আধঘন্টা কথা বলার পরে বুঝলাম লোকটি বদ্ধ কালা।

আবার সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে ফিরলাম। ওঁকে বেল বাজানো, পিয়ন ডাকা ইত্যাদির কোনো সুযোগ না দিয়ে রাজেনবাবুর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললুম। সব শুনে তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন।

'তাহলে রাজেনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, আবার অনুরোধ করলাম, 'দেখবেন ওঁর চাকরিটার ক্ষতি না হয়। আমরা ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

'চাকরির ক্ষতি? এই অফিসে?' সুপারিন্টেন্ডেন্ট রীতিমতো অবাক হলেন, তারপর বললেন, 'এত সহজে এ অফিসে চাকরির ক্ষতি হয় না মশায়। বরদাবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে?'

আমি জানালুম হয়েছে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, 'ওই বরদাবাবু, আরে মশায় যেদিন ইলেকট্রিক ট্রেন

শুরু হয় সেইদিনই ঝুলে আসতে গিয়ে একটা পিলারে গুঁতো খেয়ে সাতদিন অজ্ঞান। তিনমাস পরে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু কানে একদম শুনতে পান না। বসিয়ে দিলুম কমপ্লেইন ব্রাঞ্চে, যার যা নালিশ যত ইচ্ছা জানাও, কিচ্ছু শুনতে পায় না। গালাগাল করো, মৃদু মৃদু হাসবে। বড়ো অমায়িক স্বভাব ভদ্রলোকের তার উপরে কানে কালা।....অত সহজে কী চাকরি যায়? ভবানীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। ডাহা তোতলা। ফোনের টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি। একটি প্রশ্নের-ও জবাব পাবে না কেউ। অফিসে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেছে।'

একটু থেমে সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রশ্ন করলেন, 'বরদাবাবু মাঝে মধ্যে মারধোর করছেন তো?'

হ্যাঁ কী না কী বলব কিছু বুঝতে না পেরে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, আর একবার নখ কাটলেন তারপর বললেন, 'রিসেপশন টেবিলটা দেখলেন না আমার ঘরে ঢোকার আগে? এখানে আগে ভরদ্বাজবাবু বসতেন, ওঁকে পেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকতে হত। ছ'মাস আগে এলে আমার সঙ্গে আপনার দেখা করাই হত না। তখনো উনি রিটায়ার করেন নি। ভরদ্বাজবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে বড়ো অসুবিধায় আছি। রিসেপশন সেক্সনের লোক নেই অফিসে। বুঝলেন, আমাদের একটি আক্রমণপরায়ণ উন্মাদ দরকার। যান তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজেনবাবুকে নিয়ে আসুন।'

এই সময় বাইরে দুমদাম শব্দ শোনা গেল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, 'সেরেছে, আজ আবার পেনসনের তারিখ। ওই ভরদ্বাজবাবু বোধহয় পেনসন নিতে এলেন।'

আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুতগামী হলাম। পিছনে রিসেপশন টেবিলের উপরে কে যেন একটা চেয়ার আছাড় দিল বলে মনে হল।

থানায়

বাড়িতে একটা ছোটোমতো চুরি হয়ে গিয়েছিল, তাই নিয়ে থানায় ডায়রি করতে গিয়েছিলাম। পাড়ার মধ্যে থানা কর্মচারীরা অনেকেই আমার পরিচিত। কাজ শেষ হওয়ার পরেও বসে গল্প করছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। খুব সন্ত্রস্ত- ভাবে তিনি থানায় প্রবেশ করলেন, ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজার কাছে একটা কোনা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন, এই রকম প্রায় দু-তিন মিনিট।

'থানায় ঢুকলেই লোকগুলো এমন সব ঘাবড়িয়ে যায়। যেন আমরা খেয়ে ফেলব।' আমার সম্মুখস্থ দারোগাবাবু অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে স্বগতোক্তি করলেন, তারপরে সদ্য প্রবেশকারী ব্যক্তিটিকে ডাকলেন, 'ও মশায়, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। কাকে চাই? চুরি-ডাকাতি-খুন কি হয়েছে?'

দারোগাবাবুর প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন বটে কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মুখের রং যাকে বলে চক-খড়ির মতো সাদা, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কথাকলি নাচে অত্যন্ত দক্ষ নটীরা যেভাবে সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করে প্রায় সেইভাবে মিনিটে অন্তত তিরিশের গতিতে সমস্ত শরীর কাঁপছে।

এসে টেবিলের উপর হাত রেখে দাঁড়ালেন। হাতের পাতা দুটো পদ্মপত্রে জলের মতো টলমল করছে, কিছুতেই স্থির থাকছে না। চিরটাকাল সসম্ভ্রমে বাইরে থেকে থানা পুলিসের সীমানা এড়িয়ে গেছেন, আজ খুবই দুর্বিপাকে পড়ে এখানে হাজির হতে বাধ্য হয়েছেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হত। এ আমার কর্ম নয়, এই গোছের একটা ভঙ্গি তাঁর আন্দোলিত, কম্পিত মুখের ছাপে অত্যন্ত স্পষ্ট।

দারোগাবাবু লোক খারাপ নন বরং বলা যেতে পারে বেশ ভালো লোক। পুলিসের লোক বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নন, হৃদয়ে বেশ মায়াদয়া আছে। তিনিও আগন্তুক ভদ্রলোকের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন, 'বসুন।'

ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতেই বসে পড়লেন। স্থির হওয়ার জন্যেই বোধহয় মিনিট খানেক সময় দিয়ে দারোগাবাবু ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক গ্লাস জল খাবেন?'

'জল', অকূল সমুদ্রে দ্বীপ দেখতে পেলে পুরাকালের নাবিকেরা যেমন আকুল

হয়ে উঠত, আগন্তুকের কণ্ঠে সেই আকুলতা ফুটে উঠল। জল এল, হাতের কাঁপুনি এখনো থামেনি। সবটা জল ঠোঁটের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেল না, কিছু বাইরেও ছড়াল। জল খেয়ে নিজের অজান্তেই অত্যধিক উত্তেজনায় ভদ্রলোক কাচের গেলাস টেবিলের ওপর এত জোরে নাড়ালেন যে, আর দেখতে হল না, গেলাসটা চৌচির হয়ে গেল

'দাম, আমি দাম.....' ভদ্রলোক বোধহয় বোঝাতে চাইলেন, গেলাসের দামটা তিনি দিয়ে দেবেন, কিন্তু গলা ফুটে এর বেশি কিছু শব্দ বের হল না।

অসীম নিস্তব্ধতা, একটা পুলিস ফাঁড়ির অফিস ঘরের পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব বলেই বোধহয়, তারই মধ্যে মিনিট দুয়েক অতিবাহিত হল। সবাই চুপচাপ, ঘরের মধ্যে যারা ছিল সবাই আগন্তুক দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

দারোগাবাবুই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, দায়িত্বও তাঁর। তিনি সরকারিভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার নাম?'

ভদ্রলোকের ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কী যেন বিড়বিড় করলেন, আমি পাশেই বসেছিলাম, আমার কানে এল, 'জনার্দন পাল, ২৬, গোপাল মুখার্জি লেন।'

দারোগাবাবু বোধহয় ভালো শুনতে পাননি, 'জোরে বলুন, কানে শুনতে পাচ্ছি না'।

এইবার ভদ্রলোক প্রায় স্পষ্ট করে বললেন 'গোবর্ধন পাল', অবশ্য ঠোঁট তেমনই কেঁপে চলেছে।

আমার কেমন যেন মনে হল, আমি বললাম, 'আপনি এইমাত্র জনার্দন পাল বললেন না?'

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, 'আজ্ঞে ওটা আমার বাবার নাম । এর পরেই দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করবেন তো, তাই বাবার নাম আর বাড়ির ঠিকানা মনে আছে কিনা, একটু ঝালিয়ে নিলাম।'

নিজের ওজন নিজে বুঝুন

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। সন্ধ্যার দিকে চৌরঙ্গি রোড ধরে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ সামনে এক ব্যক্তি এসে উদয় হলেন। দেখে একটু চমকে উঠেছিলাম, আগে-ভদ্রলোক-ছিলাম গোছের চেহারা। শীর্ণ, ময়লা জামা, ছেঁড়া চটি, চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত ভাব। অবশ্য একটু পরেই বুঝলাম আমার চমকানোটা অমূলক, লোকটি একজন সামান্য ভিখিরি, গুণ্ডা বা ছিনতাইকারী নয়।

ব্যক্তিটি আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা, দশটা পয়সা দেবেন, দু-দিন কিছুই খাইনি।' বুঝতে পারলাম লোকটি শুধু ভিখিরি নয়, নির্বোধও বটে, দু-দিন যদি না খেয়ে থাকে, তবে দশ পয়সায়, মাত্র দশ পয়সায় আজকের দিনে কী খেতে পাবে। আমি বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু-দিন যদি না খেয়ে থাকেন, তাহলে দশ পয়সা দিয়ে কি হবে?' উত্তরে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি বললেন, 'একটু ওজন নিয়ে দেখতাম, আমার ওজন কতটা কমেছে।'

একজন পথের ভিক্ষুকের এই রকম বৈজ্ঞানিক মনোভাব দেখে আমি এরপর কতটা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেটা বুঝিয়ে বলার নিশ্চয় দরকার নেই। তবে সেই মুহূর্তে আমারও মনে পড়ল বেশ কিছুদিন আমি নিজেও ওজন নিইনি, বহু কষ্টে শরীরের স্থূলতা মাস কয়েক আগে অনেকটা কমিয়েছিলাম, এখন সন্দেহ হচ্ছে আবার বুঝি মোটা হয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, আমার এই ওজন কমানোর ব্যাপারটা আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত-পরিজন অনেকেই বিশেষ সহজভাবে নেননি, অনেকেই আমার মধ্যদেশের দিকে ভ্রূকুঞ্চন করে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন. 'সত্যি রোগা হয়েছ, বলছ?' এমন কী আমার সহধর্মিণী পর্যন্ত এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। একবার তাঁর সামনে ওজন নিয়ে ওজন-যন্ত্রের কার্ডে দেখলাম আগের বারের চেয়ে দেড় কেজি ওজন কম। ভদ্রমহিলা ওজনের অঙ্কের দিকে না তাকিয়ে কার্ডের নিম্নাংশের আপ্ত বাক্যটি পড়তে লাগলেন, ইংরেজিতে লেখা সেই সদুক্তি, যার বঙ্গানুবাদ হবে, 'আপনি সৎ চরিত্রের, উদার দিলখোলা লোক। সকলেই আপনাকে ভালোবাসেন।' ভদ্রমহিলা নির্বিকারভাবে বললেন, 'এই কথাগুলো তোমার সম্পর্কে যেমন মিথ্যে, তেমনি মিথ্যে তোমার ওজনের হিসেব।'

এই সূত্রে এক স্থূলাঙ্গিনী মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর স্বামী তাঁর উপরে খুব অত্যাচার করেন, তিনি ক্রমশ কাহিল হয়ে যাচ্ছেন, ক্রমশ কিঞ্চিৎ রোগাও হয়ে যাচ্ছেন। এই রকম সময়ে এক বান্ধবীর সঙ্গে সেই মেমের দেখা। বান্ধবী তাঁকে অনেকদিন পরে দেখে বললেন, 'এ কি লরা, তোমার একি চেহারা হয়েছে!' লরা মেম তখন তাকে বললেন যে তাঁর স্বামীর অত্যাচারে তাঁর এই অবস্থা হয়েছে। এই বলে নিরালায় বসে চোখের জলে ভিজিয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণ পতি-নিন্দা করলেন, অত্যাচারের বিবিধ বর্ণনা দিলেন এবং সর্বশেষে বললেন যে স্বামীর অমানুষিক ব্যবহারে গত কয়েক মাসে তাঁর পনেরো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে। দরদী বান্ধবী তখন সুপরামর্শ দিলেন, 'তা হলে তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স করছ না কেন? তুমি যা যা বললে আদালতে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স পেয়ে যাবে।' তখন লরা মেম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ডিভোর্স করব, নিশ্চয়ই করব। তবে আরো কিছুদিন পরে।' বিস্মিতা বন্ধবী বললেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ যদি করতেই হয় তবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করা কেন?' স্থূলাঙ্গিনী লরা বললেন, 'আমার ওজনটা আর পনেরো-বিশ পাউণ্ড কমলেই আমি ওঁর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনব।'

নোবেল প্রাইজের সঙ্গে ধ্বনি সমন্বয় করে ইংরিজিতে একটা বাজে পান (Pun) আছে, নো বেলি প্রাইজ (No Belly Prize)। যে কেউ রোগা হচ্ছেন, খাদ্য কমিয়ে বা পরিশ্রম বাড়িয়ে ওজন ওরফে ভুঁড়ি কমানোর চেষ্টা করছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কি হে, তুমি কি নো বেলি প্রাইজের চেষ্টা করছ নাকি?'

আরেকটা মোটা দাগের বিলিতি গল্প আছে এক মোটা মেমসাহেবকে নিয়ে। সেই গজেন্দ্রগামিণী তাঁর ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব আজ আমার জন্মদিন।' ও প্রান্তে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হ্যাপি বার্থ ডে।' মোটা মেম বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার সাহেব আমি বড়ো বেকায়দায় পড়েছি, আমাকে শিগগির একটা রোগা হওয়ার জোরালো ওষুধ পাঠিয়ে দিন।' ডাক্তার সাহেব শুধোলেন, 'ম্যাডাম, জন্মদিনে রোগা হওয়ার ওষুধ দিয়ে কি হবে?' 'কি বলব ডাক্তার সাহেব? আমার বর আমাকে একটা উপহার দিয়েছে। কিন্তু সেটা এতই ছোটো যে আমি তার মধ্যে গলতে পারছি না।' মহিলার করুণ কণ্ঠে এই সংবাদ পেয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি পোশাকটা সঙ্গে করে চলে আসুন, দেখি কতটা কী করা যায়?' মোটা মেম আর্তনাদ করে উঠলেন, পোশাক? পোশাক কী বলছেন? আমার স্বামী আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছে, আমি সেই গাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারছি না।'

একদা বড়ো ওজনের মানুষ বলতে বোঝাতো ক্ষমতাবান, কৃতী মানুষদের। তখন মানুষদের সাফল্যের মাপকাঠিই ছিল তার ওজন। এখন একমাত্র যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর কোথাও ওজনের কোনো গুরুত্ব নেই।

চালু কথাই ছিল, নিজের ওজন বুঝে চলবে, নিজের ওজন বুঝে কথা বলবে। তখন ওজন মানেই ছিল গুরুত্ব। কিন্তু এখন সবচেয়ে সফল লোকেরা চাইছেন তাঁদের ওজন কমাতে, ছিমছাম, ফিটফাট হতে। অতিরিক্ত দেহ-ভার নাকি কর্মশক্তি, জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়।

কিন্তু এ-কথা বুঝি পুরোপুরি সত্য নয়। এখনো মাঠে-ময়দানে দেখি শেষরাতের অন্ধকারে আর বিকেলের ছায়ায় হাজার হাজার মোটা লোক যেমন হনহনিয়ে ছুটছে রোগা হওয়ার জন্যে, তেমনিই হাজার হাজার রোগা লোক ছুটছে মোটা হওয়ার জন্যে।

মোটা-রোগার কথায় মনে পড়ে, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পের মোটা নায়ক (তাঁর স্ত্রীও মোটা) বলেছিলেন, আমরা বাড়িতে মোটামুটি দু-জন। এরই প্রতিধ্বনি তুলে একদা আমার এক অসুস্থ বন্ধুর তন্বী সহধর্মিণী বলেছিলেন, 'আমরা রোগারুগী দু-জন।'

তবে মোটা-রোগা নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প দুই খ্যাতিমান সাহেবকে নিয়ে। এঁদের দু-জনের নাম আমার বারবার গুলিয়ে যায়, তাই জব্দ হওয়ার ভয়ে লিখছি না (বার্নার্ড শ এবং চেস্টারটন নয় তো? হে সুশিক্ষিতা পাঠিকা, ভুল হয়ে থাকলে, দয়া করে চিঠি দিয়ে বা ফোন করে অপমান করবেন না। আমার বিদ্যের দৌড় তো আপনি এতদিনে বুঝে গেছেন। আর কাণ্ডজ্ঞানের দৌড়ও প্রায় শেষ।)

সে যা হোক, বার্নার্ড শ যেমন রোগা ছিলেন, চেস্টারটন ছিলেন তেমন মোটা। একদিন কী একটা কথার মধ্যে চেস্টারটন বার্নার্ড শর দিকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখলেই মনে হয় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে।' ক্ষুর-জিহ্বা বার্নার্ড শ সঙ্গে সঙ্গে স্থূল চেস্টারটনকে বলেছিলেন, 'অবশ্য তোমাকে দেখলেই বোঝা যায় দুর্ভিক্ষের কারণটা কী?'

এত সব কথা বলতে গিয়ে ওজনের গল্পগুলো কিন্তু ঠিকমতো বলা হল না। অন্তত দুটো বলা যাক।

একবার এক প্রগলভা সুন্দরীকে কে যেন না বুঝে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি একটু মোটা হয়ে গেছেন নাকি?' প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা চোখ নাচিয়ে বললেন, 'বাজে কথা। এই জংলি শাড়িটার জন্যে এমন দেখাচ্ছে। জামাকাপড় খুলে আগেও আমার ওজন ছিল একশো চার পাউণ্ড, এখনো সেই একশো চার পাউণ্ড।' এ

ধরনের জবাবে ভদ্রলোক চমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'তাই নাকি?' মহিলা মোহিনী কণ্ঠে বললেন, 'কেন? সন্দেহ হচ্ছে? দেখবেন?'

এ গল্পটা সুরুচির [illegible] ছুঁয়ে গেল। এরই পাশের গল্পটা অনেক ছিমছাম। একটি অত্যন্ত রোগা, চোখে হাই পাওয়ার চশমা সত্যবাদী যুবক ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু আমার ওজন একাশি পাউণ্ড।' ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান জানতে চেয়েছিলেন, 'চশমাসুদ্ধু ওজনের দরকার কি?' ছেলেটি নিজের মোটা কাঁচের দিকে নির্দেশ করে বলেছিল, 'চশমা খুলে ফেললে যে আমি ওজনের স্কেলটা পড়তে পারি না।'

সবশেষে আমার নিজের ওজনে ফিরে আসি। ওজন কমানোর চেষ্টায় এখন আমার দমবন্ধ দিন কাটছে। কিন্তু আরম্ভটা হয়েছিল হালকা ভাবে। অন্য একটা অসুখের সূত্রে ডাক্তারবাবু বললেন, অতিরিক্ত মেদ আমার অসুখের কারণ। তিনি নিজেও আমার থেকে কম মোটা নন। কিন্তু আমাকে বললেন, 'আমাদের দশ কেজি ওজন কমাতে হবে।' প্রস্তাব শুনে আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আজ্ঞে নিশ্চয়, আপনি পাঁচ কেজি, আমি পাঁচ কেজি।' ডাক্তারবাবু খুশি হননি।

স্বামী-স্ত্রী

বিলিতি ঘুমপাড়ানি গানে আছে,

আলপিন আর সুচ। আলপিন আর সুচ। বিয়ের পরেই বাবা জীবনটা খুচখুচ॥

সুচ আর আলপিন। সুচ আর আলপিন।

বিয়ের পরেই বাবা জীবনটা [illegible]

কেন যে গ্রাম্য গীতিকার শিশুদের সরল চিত্তে কাঁচা বয়েসে বিয়ের মতো মধুর এবং পবিত্র বিষয়ে এরকম আশঙ্কা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানী বা চিত্ত সমীক্ষকেরা হয়তো আলোকপাত করতে পারবেন, আমার মতো হালকা চিন্তার মানুষের পক্ষে এ সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়া অনুচিত হবে।

শুধু এই ছেলেভোলানো গীতিকার নয়, এক কট্টর প্রবন্ধকার, যাঁর কথা আগেও উল্লেখ করেছি, সুচিন্তিত ভাষ্য দিয়েছিলেন যে, 'শুভ পরিণয় শুধু সেখানেই সম্ভব যেখানে স্ত্রী চোখে একেবারেই দেখতে পান না এবং স্বামী মোটেই কানে শুনতে পান না।'

এ রকম সুখী দম্পতি সচরাচর দেখা যায় না। আমরা অসুখী দম্পতিদের কাহিনীতে প্রবেশ করছি।

একবার ট্রেনে যেতে এক দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুজনেই আলাদা আলাদাভাবে চমৎকার। কিন্তু সারা রাস্তা দুজনে সামান্য সব বিষয় নিয়ে কলহ করতে লাগলেন। স্বামী যদি মাটির ভাঁড়ে চা খাবেন তবে স্ত্রী খাবেন কাগজের কাপে কফি। কোনটা বেশি খারাপ এই নিয়ে ঝগড়া। রেলের জানলা দিয়ে দাম-দর করে স্ত্রী এক ডজন চাঁপাকলা কিনলেন। পরের স্টেশনে স্বামী কিনলেন আটটা সিঙ্গাড়া। স্ত্রীর কলা স্বামী খেলেন না, স্বামীর সিঙ্গাড়া স্ত্রী স্পর্শ করলেন না।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। স্বামী বেচারা একবার একটু বোকা হেসে আমাকে বললেন, 'আপনার খুব অবাক লাগছে তাই না। আজ আট বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে আমরা দুজনে কিছুতেই কোনো বিষয়ে একমত হতে পারিনি।'

স্বামী বেচারার কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ জানালেন, 'আট বছর নয়, সাত বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। স্বামী ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন, 'সাত বছর হবে কি করে? সেভেনটি এইটের নভেম্বর থেকে এই জুন পর্যন্ত পৌনে আট বছর অন্তত হল।' স্ত্রী আবার প্রতিবাদ করলেন, 'সাড়ে সাতই হল না পৌনে আট।'

দুজনের সময়ের সামান্য হিসেব নিয়ে বাদানুবাদ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে আমার স্টেশন এসে গিয়েছিল, আমি নেমে পড়লাম।

সদাসর্বদা যে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ঠিক এরকম দু তরফা হয় তা নয়। টেলিফোন বুথে এক ভদ্রলোক নিঃশব্দে টেলিফোন ধরে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুথের বাইরে অন্য এক ব্যক্তি ফোন করার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন, 'দাদা কোনো কথা বলছেন না অথচ ফোনটা আটকিয়ে রেখেছেন। ছেড়ে দিন।' টেলিফোনধারী বললেন, ছাড়ার উপায় নেই। কথা বলারও উপায় নেই।' অপেক্ষারত ভদ্রলোক এবার উত্তেজিত, 'মানে? এসব কী ইয়ার্কি হচ্ছে?' টেলিফোনধাবী বললেন, খুব ঠাণ্ডা গলায়, 'কোনো ইয়ার্কি নয় দাদা। ও প্রান্তে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলছেন, তাই মনোযোগ দিয়ে শুনছি।'

আমেরিকার একটি ছোটো শহরে একটি 'দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়ন সমিতি' স্থাপন করেছিলেন এক পরোপকারী মার্কিনী। মার্কিনীদের সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের উপর খুব ঝোঁক। এই প্রতিষ্ঠানটিও একটি সমীক্ষা চালায়। একশোটি পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখে 'আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কী কী বিষয়ে মিল আছে।'

সমস্ত সমীক্ষার পরে শুধু মাত্র একটা বিষয়েই অধিকাংশ দম্পতির মিল পাওয়া যায়। সেটা আর কিছু নয় স্বামী আর স্ত্রী উভয়েরই একই দিনে বিয়ে হয়েছিল। এই একমাত্র মিল, দুজনের একই বিয়ের তারিখ।

এই সমীক্ষার ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ায় লিখে ফেললাম। পুনরায় দাম্পত্য সংলাপের মতো মধুর বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করছি।

কফি হাউসে এক বিবাহিতা তরুণী, হাতে শাঁখা কপালে সিঁদুর একা একা বসে কফি খাচ্ছিলেন। একটু পরে এক যুবক অন্য কোনো টেবিলে সিট খালি না পেয়ে ওই তরুণীর অনুমতি নিয়ে তাঁর টেবিলে সামনের চেয়ারে বসলেন।

যুবকটিও এক কাপ কফি খেলেন। তাঁর বোধহয় তাড়াতাড়ি ছিল। প্রায় এক চুমুকে গরম কফি পান করে তিনি বেয়ারার কাছে বিল চাইলেন।

বেয়ারাটি বিল নিয়ে এল, দু কাপ কফির দাম বিল করা হয়েছে।

সে এক প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থা। তরুণীটি উদ্ধার করলেন, বেয়ারাকে বললেন, 'দুটো বিল আলাদা আলাদা হবে। আমরা দুজনে একত্র নই।' বেয়ারা তাই করল, যুবকটি দ্রুত বিল মিটিয়ে চলে গেলেন।

যুবকটি চলে যাওয়ার পর মহিলাটি বেয়ারাকে ডাকলেন, 'তুমি আমাদের বিল

একত্রে দিলে কি করে?' বেয়ারা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা বুঝি দুজনে হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ।' তরুণীটি বিস্মিত হলেন, 'হঠাৎ তোমার এ রকম ধারণা-হল কেন?' বেয়ারাটি হাত কচলিয়ে বলল, 'আজ্ঞে দেখলাম আপনারা দুজনে কোনো কথা না বলে চুপচাপ মুখোমুখি গম্ভীর হয়ে কফি খাচ্ছেন। তাই ভাবলাম আপনারা নিশ্চয় হাজব্যাণ্ড-ওয়াইফ।'

স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ প্রসঙ্গে আরেকটা কফিপানের কাহিনী বলে শেষ করি।

সুদর্শনবাবু সকালবেলা থেকে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসে আছেন। পরপর তিন চারটে খবরের কাগজ, দুটো ইংরেজি-বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা টেবিলে হাতের বাঁপাশে। সুদর্শনবাবুর মুখে একটিও কথা নেই, চুপচাপ কাগজ পড়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই।

সুদর্শনবাবুর স্ত্রী সুদর্শনা স্বামীর টেবিলে এক কাপ কফি রাখলেন। সুদর্শনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই, কিছুক্ষণ পরে এক চুমুক, দু চুমুক করে কফি খাচ্ছেন আর কাগজও পড়ে যাচ্ছেন।

সুদর্শনা হঠাৎ চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কফিতে চিনি দিয়েছি?' সুদর্শনবাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ না নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ দিয়েছ। শুধু শুধু বিরক্ত করছ। চিনি না থাকলে আমি তো নিজেই বলতাম।

সুদর্শনা বললেন, 'ধন্যবাদ। চিনি যে দিয়েছি সে আমার বেশ মনে আছে। শুধু তোমার গলার স্বরটা কেমন সেটা ভুলে যাচ্ছিলাম, তাই প্রশ্নটা করলাম। সরি।'

বিশেষজ্ঞ

স্থান, দীঘার বিখ্যাত সমুদ্রতটের কাছাকাছি কাঁথি মহকুমার একটি গণ্ডগ্রাম। এই এলাকায় প্রচুর কাজু বাদামের চাষ হয়। কাজু মূল্যবান ফসল, বিদেশের বাজারে এর খুবই চাহিদা। কাজু বাদাম এখন দেশের মধ্যেও খুব জনপ্রিয়, যদিও দাম আকাশ ছোঁয়া। কাঁথি অঞ্চলে কাজুর সন্দেশ তৈরি হয়, সেও বিশেষ উপাদেয়।

এই সব নানা কারণে এখন কাজুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছে। দিল্লি থেকে বিশেষজ্ঞ এসেছেন সুদূর দীঘাতে কাজু চাষ পর্যবেক্ষণ করতে। সুখের বিষয়, বিশেষজ্ঞ মহোদয় বাঙালি, ইনি সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে ছয় মাসের কাজু চাষের ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমেরিকায় কাজুর চাষ হয় কিনা, সেখানে এর ট্রেনিং কী হবে—এসব প্রশ্ন আশা করি বিশেষজ্ঞ সম্পন্ন পাঠকেরা দয়া করে তুলে আমার অসুবিধে সৃষ্টি করবেন না।

সে যা হোক, বিশেষজ্ঞ মহোদয় সপারিষদ এক শীতের দুপুরে সমুদ্রের কাছের সেই গ্রামটিতে পৌঁছেছেন। এই ঠাণ্ডার দিনেও খালি গায়ে রোদ্দুরে বসে গ্রামের একজন কৃষক তামাকু সেবন করছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে সম্ভ্রান্ত লোকজন দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বেশ উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলেন, এসে যে গাছটায় এতক্ষণ কৃষক হেলান দিয়ে বসেছিলেন সেটার গায়ে নিজের মুখের পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ গাছটার গোড়া অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে নিড়িয়ে, খুঁড়ে দিয়েছিলেন?'

এই প্রশ্ন শুনে কৃষক কেমন থমকে গেলেন। কিছু বলার আগেই বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের একজন পারিষদ বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন, 'অক্টোবর, মানে ওই আশ্বিন মাসে গাছটার গোড়া টোড়াগুলো বেশ সাফ করে দিয়েছিলেন?'

কৃষক এবার বললেন, 'না।'

শূন্য পাইপটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিশেষজ্ঞ মহোদয় বললেন, 'তাই বলি', তারপর একটু থেমে আবার কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গাছটার ওপরের ডালগুলো এর মধ্যে কোনো দিন ভালো করে- পোকা মারা ওষুধ দিয়ে স্প্রে করে দিয়েছেন?'

কৃষকের মুখ দেখে বোঝা গেল তিনি সাতজন্মে এ রকম কিছু শোনেন নি, জেরার জবাবে থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, না তো।'

'তখনই বলেছিলাম,' বিশেষজ্ঞ মহোদয় কাতর আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সাধে এই অবস্থা,' তারপর অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে কৃষকের সামনে দু পা এগিয়ে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'আর কিছু না করুন। এই শীতের মধ্যে, বৃষ্টির আগে গাছের উপরের পাতাগুলো একবার ছেঁটে দেবেন তো?'

একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির এ রকম মারমুখো ভাব দেখে ইতিমধ্যে কৃষক রীতিমতো ঘাবড়িয়ে গেছেন এবং চার পা পিছিয়ে গেছেন। নিরাপদ দূরত্বে থেকে তিনি কোনো রকমে জবাব দিতে পারলেন, 'আজ্ঞে না তো।'

মাথায় হাত দিয়ে বিশেষজ্ঞ মহোদয় মাটিতে বসে পড়লেন, 'এই ভাবে নিজের সর্বনাশ করে! আমি অবাক হয়ে যাব যদি আপনি এই গাছে এক কেজির বেশি কাজুবাদাম পান।'

একটু দম নিয়ে কৃষক তাঁর হাতের হুকোতে দু তিনবার জোরে জোরে টান দিলেন কিন্তু আগুন নিবে গেছে, ধোঁয়া বেরলো না, নিরাশ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমিও খুব অবাক হব।'

এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ মহোদয়ের মুখে আর বাক্য জোগালো না। একজন পারিষদ তাঁকে সাহায্য করলেন, কৃষককে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও অবাক হবেন?'

এইবার কৃষক বেশ ধাতস্থ হয়েছেন, কোমর থেকে দেশলাই বের করে হুঁকোটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অবাক হব না? এটা হল শ্যাওড়া গাছ, এই শ্যাওড়ায় এক কেজি কেন যদি একটা কাজুবাদামও হয় নিশ্চযই অবাক হব, খুবই অবাক হব।'

উপরের গল্পটি সম্পূর্ণ বানানো। এর সঙ্গে কোনো জীবিত ব্যক্তি বা প্রকৃত ঘটনার কোনো সংযোগ নেই। যদি কোনো কারণে কোথাও কোনো মিল ঘটে যায় সে নিতান্তই আকস্মিক।

বরং বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে সেই সাঁতারের শিক্ষকের গল্পটি একবার স্মরণ করি। গল্পটি বাংলা ভাষায় অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী, মূল ইংরিজিটা বোধহয় পি. জি, ওডহাউসের, নাকি স্টেফান লীককের।

গল্পটা রীতিমতো চওড়া, অন্তত শিবরাম চক্রবর্তীর কলমে। বিস্তারিত বর্ণনা থাক, আসল ঘটনা এই রকম। সাঁতারের বিখ্যাত ইস্কুলের সাঁতার শিক্ষকেরও খুব খ্যাতি। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা রকম নির্দেশ দেন, তাঁরই নির্দেশে কতজন যে দক্ষ সাঁতারুতে পরিণত হয়েছে, অতি আনাড়ি অবস্থা থেকে, তার হিসাব নেই। একদিন হঠাৎ জলে পড়ে গেলেন শিক্ষক মশায়, তিনি তীর থেকে নির্দেশ দিতেন কিন্তু

সেদিন কী করে পাড় থেকে জলে পড়ে গেলেন। তারপর নাকানি চুবানি খেয়ে ডুবে মরেন আর কী, সেদিনই প্রকাশ পেল তিনি সাঁতার একদম জানেন না, জীবনে কখনো জলে নেমেছেন কিনা তাই সন্দেহ।

অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সাঁতার শেখাতে গেলে সাঁতার জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি। আমি গানের গ জানি না। গান সম্পর্কে আমার সুর জ্ঞান এবং কণ্ঠস্বর দুইই ভয়াবহ। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গো-মাংস যেরকম, আমার কাছে সারেগামাও তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একবার এক অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, বাজনা শুনে আমি বুঝতে পারলাম 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীতটি বাজানো হচ্ছে, আমি জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

আমি ছিলাম সেই সভায় প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি বা ওই রকম কিছু। পাশেই সভাপতি মহোদয় বসেছিলেন। তিনি আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'উঠছেন কেন?' আমি বললাম, 'আপনিও দয়া করে উঠুন। দেখেছেন না জাতীয় সঙ্গীত বাজছে।' সভাপতি মহোদয়ের দুই চোখ কপালে উঠল। বেশ চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাম সেপ্টেম্বর আবার কবে থেকে জাতীয় সঙ্গীত হল?' আমি আর কিছু বললাম না, চুপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সভাটি ছিল একটি সঙ্গীত বিদ্যায়তনের বার্ষিক উৎসব এবং আমাকে বড়ো সমঝদার ভেবে কর্তৃপক্ষ অতিথি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের তেমন দোষ দেওয়া চলে না। এ রকম ভুল সর্বত্রই হয়। যাঁকে আমরা কোনো বিষয়ে অথরিটি বলে ধরে নিয়েছি তিনি হয়তো সেই বিষয়ে একজন প্রকৃত হস্তিমূর্খ। দশচক্রে যে রকম ভগবান ভূত হয় তেমনি মূর্খও পণ্ডিত বলে খ্যাত হয়। তবে ওই দশচক্রের মূল চক্রটি উচ্চাভিলাষী মূর্খ নিজেই আবর্তন করান।

অজ্ঞদের গালাগাল করা রুচিসম্মত নয়, বিশেষজ্ঞের কথা হচ্ছিল সেই কথাই বলি। ইংরেজিতে বলা হয় কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের আরো-আরো-আরো জানতে জানতে অবশেষে এভরিথিং অফ নাথিং জানাই হল বিশেষজ্ঞদের বা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের স্বপ্ন। এই নাথিং কিন্তু ঠিক নাথিং নয়, দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজনের বিষয় হল মৌর্য যুগের স্বর্ণমুদ্রার সিংহের ডান পায়ের (সামনের) মধ্যমার দৈর্ঘ্য। ইনি কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত দশ হাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেলেছেন। ইনি ইতিহাসের লোক। এঁরই বন্ধু সাহিত্যের, তাঁর বিষয় হল

শিলাইদহের কুঠিবাড়ির মধ্যের ঘরের বড়ো শালকাঠের জলচৌকিটির পায়ার কাছে যে কালির দাগ লেগে ছিল সেই মসীচিহ্ন কি শিলাইদহ বোটে জলচৌকিটি নিয়ে সোনার তরী কবিতাটি লেখার সময়, (যদি নেয়া হয়ে থাকে), দোয়াত উল্টে লেগে গিয়েছিল? এই বক্তব্যের পক্ষে এবং বিপক্ষে তিনি একশো রকম তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন।

আজ কিছুদিন হল শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার সাহেবদের হাতে আছি। বিশেষজ্ঞ নিয়ে লেখা শেষ করার আগে তাঁদের সম্পর্কে কিছু না লেখা অনুচিত হবে।

আমাদের ছোটোবেলায় পারিবারিক ডাক্তার পায়ের গোড়ালি থেকে মস্তকের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গের চিকিৎসা করতেন। তিনিই বহু পরে একবার কানে ব্যথা হওয়ায় বললেন ই-এন-টি স্পেসালিস্টের কাছে অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণ-কণ্ঠ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে। এর অনেকদিন পরে একবার মিনিবাসে একটা লোক আমার নাকটা গুঁতিয়ে দিল, রীতিমতো ফুলে গেল। সেই ই-এন-টির কাছে গেলাম তিনি বললেন, 'আমি এখন শুধু কান করছি। আপনি ডঃ নাগের কাছে যান। তিনি এখন নাক করেন। ডঃ নাগকে গিয়ে দেখালাম। তারপর এই গত সপ্তাহে ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ মাথা ভার, একটা নাক, ডান নাকটা সম্পূর্ণ বন্ধ। আবার গেলাম ডঃ নাগের কাছে তিনি সব দেখে বললেন, 'ডান নাক আমার দ্বারা হবে না, আমি এখন শুধু বাঁ নাক দেখেছি।'

হে মাতাল, অমোঘ মাতাল

ইংরেজি প্রবাদ আছে পেয়ালা ও ঠোঁটের মধ্যে বহু কিছু ফসকিয়ে যায়। এক বিজ্ঞ মাতাল এই বিখ্যাত প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'তাই আমি আর পানীয় পেয়ালায় ঢালি না, সরাসরি বোতল থেকে মুখে ঢেলে খাই।'

বোতল বা পানীয়ের গল্প কত যে শুনলাম আর পড়লাম, আর তাই নিয়ে ছাই ভস্ম কত কী যে এ যাবত লিখলাম কিন্তু এর কোনো শেষ নেই। যাই লিখি না কেন এখন, এর কোনো গল্পই নতুন নয় আবার কোনো গল্পই পুরোনো নয়।'

প্রথমে সুরেশ আর পরেশের গল্পটাই ধরা যাক। সুরেশ এবং পরেশ দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কৃতবিদ্য মদ্যপ। বহু, বহু, গ্যালন মদ্যপানের পর অবশেষে দুজনে একদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয়, আর মদ খাওয়া নয়। ছেড়ে দেওয়া ঠিক করে তারপরে নানা দিক বিবেচনা করে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি সুরেশের কাছে রেখে দেওয়া হল, যদি দুজনের মধ্যে কেউ কখনো অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে ব্রাণ্ডিটা তাঁর কাজে লাগবে।

একদিন কোনো রকমে কাটল, দুদিনের মাথায় পরেশ আর সহ্য করতে পারলেন না, সুরেশের বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে বললেন, ভাই সুরেশ, শরীরটা বড়ো খারাপ লাগছে। ব্রাণ্ডিটা একটু বার কর তো। অনুরোধ শুনে সুরেশ করুণ মুখ করে বললেন, 'ভাই পরেশ ব্রাণ্ডি তো আর একফোঁটাও নেই। কালকেই আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম পুরো বোতলটা খেয়েও সুবিধে হয়নি, শরীরটা আজো কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

সুরেশ-পরেশের এই কাহিনীটি অবশ্যই কল্পিত, কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে মদের কিছু একটা যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের অজুহাতে মদ্যপান শুরু করে কত লোক যে প্রতিষ্ঠিত মদ্যপে পরিণত হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। বিলিতি মদ্যপানের আরম্ভেই অন্যের স্বাস্থ্যে পানের রীতি আছে। এবং সেই জন্যেই সাহেবি নিষেধাজ্ঞা আছে, 'দেখো অন্যের স্বাস্থ্যপান বেশি করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করো না।'

মদের গল্পে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে লাভ নেই। আমার নিজের একটা পুরোনো অভিজ্ঞতার কথা বলি।

কয়েক বছর আগে দমদমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন বাগানবাড়িতে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল। পান ভোজনের অতিরিক্ত অত্যাচার এড়ানোর জন্যে একটু

দেরি করেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম গৃহকর্তা তখনই প্রায় বেসামাল। আমরা নিমন্ত্রণ সেরে চলে আসবার অনেক আগেই তিনি দোতলার বারান্দার একপাশে একটা খাটিয়ায় শয্যাগত, হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

গৃহকর্তাকে বাদ দিয়েই বেশ অস্বস্তির মধ্যে আমরা আমাদের খাওয়াদাওয়া সারলাম। প্রচণ্ড মশা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মশার আক্রমণ বাড়তে লাগল। আমরা চলে আসার সময় দেখলাম ঘুমন্ত গৃহকর্তাকে মশায় ছেঁকে ধরেছে। ভদ্রলোকের খাসভৃত্য কাছেই ছিল তাকে বললাম, খাটিয়ার উপরে একটা মশারি টাঙিয়ে দিতে। ভৃত্যটি বলল যে, তার মনিব মশারির নিচে শোয়া পছন্দ করেন না।

ভোরবেলা উঠে বিছানায় মশারি টাঙানো দেখলে খেপে যাবেন।

আমি তবু বললাম, কিন্তু মশায় কামড়ে তো শেষ করে দেবে। চতুর ভৃত্যটি এতক্ষণে আসল কথাটি বলল, 'বাবুকর্তা যখন বাগানবাড়িতে আসেন এই খাটিয়াতেই এইভাবে মশারি ছাড়াই শোন। তাতে তেমন কিছু হেরফের হয় না।' আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে সে জানাল, প্রথম রাতে কর্তা এত বেঁহুশ থাকেন মশা কেন বাঘে কামড়ালেও টের পাবেন না। আর শেষ রাতের দিকে কর্তার মদমিশ্রিত রক্ত সন্ধ্যা থেকে পান করে মশাগুলো এতো বেহুঁশ হয়ে যায় যে তারা আর কামড়ায় না।

এরকম ক্ষেত্রে মদ বন্ধুরই কাজ করে, মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা কম কথা নয়। কিন্তু তবু মদ বন্ধু না শত্রু এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজো হয়নি।

এক পাদ্রী একবার তাঁর সাপ্তাহিক ভাষণে উপদেশ দিয়েছিলেন শত্রুকে ভালোবাসতে। কয়েকদিন পরে শ্রোতাদের একজনের সঙ্গে তাঁর রাস্তায় দেখা, সে একবোতল হুইস্কি হাতে বাড়ি ফিরছে। তিনি বোতলবাহককে বললেন, 'সর্বনাশ, মদ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছো, মদ তো মানুষের শত্রু।' লোকটি বোতলটাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে পাদ্রীকে বলল, 'কিন্তু পাদ্রীসাহেব, আপনিই না সেদিন বললেন, শত্রুকে ভালোবাসতে, তাইতো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

বন্ধুত্বের অন্যরকম একটা কাহিনী আছে। এক ভদ্রলোক আগে ব্যারাকপুরে থাকতেন, কিছুদিন হল বাসাবদল করে কলকাতায় চলে এসেছেন। এক শনিবার সন্ধ্যাবেলা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ব্যারাকপুরে গেলেন। যথারীতি আড্ডা, গল্পগুজব, তারপর প্রথমে এক বোতল, পরে আরেক বোতল হুইস্কি আনা হল, ভদ্রলোক আর তাঁর পুরোনো তিন চারজন বন্ধু মনের আনন্দে পুনর্মিলন উৎসব উদযাপন করলেন।

রাত যখন প্রায় এগারোটা, যখন সকলেরই অবস্থা টলমল, লাস্ট ট্রেনের আর দেরি নেই সবাই মিলে দুটো রিকশা ডেকে চললেন স্টেশনে। তাঁরা যখন স্টেশনে ঢুকেছেন তখন শেষট্রেন প্ল্যাটফর্মের থেকে ছাড়ছে। সবাই দৌড় দিলেন ট্রেনের দিকে।

এর পরের দৃশ্য, শূন্য প্ল্যাটফর্মে যাঁর কলকাতায় ফেরার কথা তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, দূরে দ্রুতগতিতে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর সেই ট্রেনে চলে যাচ্ছেন ব্যারাকপুরের বন্ধুত্রয়, যাঁরা সি-অফ করতে অর্থাৎ বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

মদ্যপানের পর সুষ্ঠুভাবে বিদায় গ্রহণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। কেউ টলতে টলতে বেরিয়ে যায়, কারো বেরনোর ক্ষমতা থাকে না, কার্পেটের এক প্রান্তে কিংবা সোফার ওপর পা ছড়িয়ে গড়ায়, কেউ অহেতুক ঝগড়া বাধিয়ে গালাগাল করতে করতে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো আসবে না জানাতে জানাতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আরো এক ধরনের লোক আছে, তারা খুব আমুদে আর বিলাসী হয়ে পড়ে, এদের কেউ কেউ অন্যের ঘাড়ে বা পিঠে উঠে বেরোনোর চেষ্টা করে। আবার এমন মাতালও পাওয়া যায়, অন্যকে ঘাড়ে বা পিঠে তোলাতেই তার আনন্দ। এরা অনেকসময় আনন্দের আতিশয্যে পার্টিস্থ কোনো মহিলাকে কাঁধে তুলতে চায়, তখনই বিপত্তি।

তবে এসব বিপত্তির ব্যাপারে অনেক মদ্যপই যথেষ্ট সচেতন। এক খ্যাতনামা মাতালকে দেখেছি, নাম বলা বারণ, তিনি পার্টিতে এসে দু পেগ পান করার পরই সবার কাছে 'গুড বাই গুড নাইট' বলে বিদায় প্রার্থনা করেন, খুবই বিনীতভাবে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'সেকি আপনি এখনই, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন নাকি?' তিনি মধুর হেসে জবাব দেন, 'না তা নয়, তবে যখন যাব তখন তো আর বিদায় গ্রহণ করার মতো অবস্থা থাকবে না তাই আগেই বিদায়ের ব্যাপারটা সেরে নিচ্ছি।'

কোন্ বাণিজ্যে

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী যিনি, তিনি সর্বদাই ব্যবসা করেন। শয়নে-স্বপনে পথে-ঘাটে সর্বদা, সব সময়ে তাঁর ব্যবসার চিন্তা। এমন কী মৃত্যুর মুহূর্তেও সে চিন্তা তাঁর মাথা থেকে যায় না।

মৃত্যু পথযাত্রী ব্যবসায়ীকে নিয়ে গল্পের অন্ত নেই। একটি পুরোনো গল্প স্মরণ করা যেতে পারে। একজন বড়ো দোকানদার মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের মুহূর্ত খুব দূরে নয়। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে সকলের খোঁজ নিতে লাগলেন।

প্রথমে বড়ো ছেলের খোঁজ পড়ল, 'অমল কোথায়?' অমল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল 'এই যে বাবা, আমি এখানে। অতঃপর বিমল, কমল ইত্যাদি অন্যান্য পুত্রের অনুসন্ধান করলেন, দেখা গেল সকলেই সমান পিতৃভক্ত, শেষ শয্যার পাশে সকলেই দণ্ডায়মান। ছেলেদের রোলকল শেষ হয়ে যাওয়ার পর নাতিদের অনুসন্ধান করলেন বৃদ্ধ। দেখা গেল তারাও সকলেই ওই ঘরের মধ্যে দাদুর কাছেই রয়েছে। মৃত্যু পথযাত্রী এবার ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, একজন মুমূর্ষুর পক্ষে যতটা কণ্ঠস্বর বাড়ানো সম্ভব তার থেকে বেশি বাড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে? তা হলে দোকানে কে রয়েছে? তোমরা সবাই দোকান খালি করে এখানে চলে এসেছ? আমার মরার পরে ব্যবসা তো লাটে উঠবে দেখছি।'

আরেক মৃত্যু পথযাত্রীর কাহিনী জানি, সেটি কিঞ্চিৎ বীভৎস রসের। এক ব্যবসায়ী তাঁর অংশীদারকে খুন করেছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির আগের দিন জেলখানার এক কর্মচারী কথায় কথায় তাকে বলে যে কাল তাঁর ফাঁসি দিতে সরকারের প্রায় পাঁচশো টাকা খরচ হবে। শুনে সেই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী জানতে চাইলেন, 'এত কেন?' তখন সেই কারা-কর্মী হিসেব দিয়ে বললেন, 'জল্লাদ আর তার সহকারীরা পাবে তিনশো টাকা, দড়ি ও অন্যান্য ফাঁসির সরঞ্জাম, ফাঁসি কাঠে তেল লাগানো ইত্যাদি বাবদ একশো টাকা, আপনার ফাঁসির পোশাক, মুখ ঢাকা কালো কাপড় এসব বাবদ আরো একশো।'

খরচের বর্ণনা শুনে ব্যবসায়ী রীতিমতো স্তম্ভিত। তিনি বহুক্ষণ ধরে গম্ভীরভাবে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'জেল কর্তৃপক্ষ যদি একটা দড়ি আমাকে দু টাকা

দিয়ে কিনে দেয় আর আমাকে একশো টাকা দেয়, তাহলে আমি নিজেই গলায় দড়ি দিতে পারি, আমারও কিছু লাভ হয়, সরকারেরও কিছু সাশ্রয় হয়।'

ব্যবসার বিষয়ে বলতে আরম্ভ করে চলে গেলাম একেবারে জেলখানার ভিতরে ফাঁসির কাঠগড়ায়। এ সব বীভৎস ব্যাপার পরিত্যাগ করে এবার আসল ব্যবসার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ধর্মতলার মোড়ে দুজন ফলওয়ালা পাশাপাশি বসে। যে সময়ের যে ফল, বর্ষায় পেয়ারা, গরমে আম, শীতে কমলালেবু দুজনে একই রকম ফল বেচে। শুধু একই রকম ফল নয়; দুজনের ফলের বর্ণ, গন্ধ, আকার, আয়তন সর্বদাই একরকম, দেখে মনে হয় যেন একই ঝুড়ির ফল দুজনে ভাগ করে বেচছে। কিন্তু গোলমাল রয়েছে এক জায়গায়, দুজনের দাম দু রকম। একজন মোটা, কালো, তার নাম মোটা মিঞা তার ফলের দাম সর্বদাই চড়া, এক কাঠি ওপরে। দ্বিতীয় জন রোগা, ফর্সা তার নাম পাতলা খাঁ। তার দাম কম। একই রকম দেখেতে, একই সাইজের ন্যাংড়া আম মিঞাসাহেব দশ টাকার এক পয়সা কম দামে দেবেন না। ও পাশে খাঁ সাহেব সেই একই আম আট টাকা, সাড়ে সাত টাকায় বেচছেন। সুতরাং খাঁ সাহেব যখন রমরমা ব্যবসা করছেন, তখন মিঞা সাহেবের ভাঁড়ে মা ভবানী অর্থাৎ বিক্রিবাটা শূন্য। দু এক ঘণ্টার মধ্যে আম হোক, পেয়ারা হোক বা কমলালেবু হোক, খাঁ সাহেবের সমস্ত ফল উড়ে যাচ্ছে আর মিঞা সাহেব তখনো চড়াদাম হেঁকে খদ্দের তাড়াচ্ছেন।

মিঞা সাহেব কেন এমন করছেন, তাঁর এতে লাভ কি? আসলে মিঞা সাহেব বোকা লোক নন। তাঁর আর খাঁ সাহেবের একই ব্যবসা, দুজনেই সমান অংশীদার। মিঞা সাহেবের দাম বেশি বলেই খদ্দেররা চটপট সস্তায় একই ফল খাঁ সাহেবের কাছ থেকে কম দামে কিনে নেয়। খাঁ সাহেবের ফল ফুরিয়ে গেলে তখন মিঞা সাহেব তাঁর ঝুড়ি থেকে আবার অর্ধেক ফল তাকে দিয়ে দেন, ব্যবসা জোর জমে ওঠে, মিঞা সাহেব হাঁকতে থাকেন, 'দশ রূপেয়া, দশ রূপেয়া.......' পাশেই খাঁ সাহেব আরো জোর গলায় হাঁকেন, 'আট রূপেয়া, আট রূপেয়া....।'

আবার এমন খদ্দেরও জুটে যায় যে দাম বেশি দিয়ে মিঞা সাহেবের ফলটাই কেনে, কারণ তার ধারণা, যা কিছুর দাম বেশি তাই ভলো। এরকম খদ্দের জুটলে তো কারবারে একবারে ষোলো আনা লাভ।

একই জিনিস বেশি দামে কেনার ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক গল্প নয়। এটা ক্রেতা মনস্তত্ত্বের একটা বড়ো দিক। মার্কিন দেশে কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষা হয়েছিল। একটা পাঁচ ডলার দামের মাখনের প্যাকেট ঠিক সমান দু ভাগে ভাগ করে এক

ভাগের দাম রাখা হল তিন ডলার আর অন্য ভাগের দাম দু ডলার, দোকানের তাকে দু ভাগে অর্ধেক অর্ধেক করে দু ডলার দাম লেখা এবং তিন ডলার দাম লেখা মাখনের প্যাকেটের অর্ধাংশগুলো সাজিয়ে রাখা হল। দেখা গেল ক্রেতারা অধিকাংশই ওই বর্ধিত মূল্যের তিন ডলারের টুকরোগুলো নিয়েছেন, দু ডলার দামের ওই একই মাখন তাঁরা নিকৃষ্ট ভেবে এড়িয়ে গেছেন।

আসলে ব্যবসা বাণিজ্য খুব সোজা ব্যাপার নয়। যার হয়, তার এমনিতেই হয়, যার হয় না কিছুতেই হয় না। আবার যার আজ হয় তার হয়তো কাল হয় না ব্যবসায় সফল হওয়ার যেমন অনেক অঙ্ক অনেক হিসেব আছে তেমনই আবার কখনো কখনো কোনো অঙ্ক কোনো হিসেবেই মেলে না। উনিশ শো পঁচাশির হিসেব উনিশ শো ছিয়াশিতে মেলে না, রামবাবুর অঙ্ক আর শ্যামবাবুর অঙ্ক মিলতে চায় না। দুইয়ে আর দুইয়ে মাঝে মধ্যে চার অবশ্যই হয় আবার কখনো শূন্য হয়, অন্য দিকে কারো সৌভাগ্যে বাইশ পর্যন্ত হতে পারে।

কবি বলেছিলেন, 'যাব আমি.....বাণিজ্যেতে যাবোই, তোমায় যদি না পাই তো তবু আর কারে তো পাবোই।' কবির পাওনা আর বণিকের পাওনা এক নয়। কবি হয়তো সব অবস্থাতেই কিছু না কিছু পেয়ে যান, কিন্তু বহু পরিশ্রম, বহু ক্লান্তির পরে বালু মরুর তীরে শূন্য হাতে ফিরে আসা মহাজনের সংখ্যা কম নয়।

এই রকম এক একদা-সচ্ছল, এখন সর্বস্বান্ত মহাজনকে এক সন্ধ্যাবেলা দুজন ছিনতাইকারী রাস্তার মধ্যে ধরেছিল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সেই ব্যবসায়ী লড়ে গেলেন গুণ্ডা দুজনের সঙ্গে। কিন্তু অবেশেষে কাবু হয়ে আত্মসমর্পন করলেন। তাঁর শার্টের পকেট থেকে অনেক খুঁজে একটি মাত্র আধুলি পাওয়া গেল, তখন এক নম্বর ছিনতাইকারী দু নম্বর ছিনতাইকারীকে বলল, 'সর্বনাশ! এর কাছে যদি পুরো একটা টাকাও থাকত, তা হলে আর আমাদের প্রাণে বাঁচতে হত না।'

তবু রঙ্গে ভরা

এক অভিনেতাকে একবার আদালতে একটি মামলার সাক্ষী হতে হয়েছিল। সেখানে শপথ নেবার পরে বিপক্ষের উকিল তাঁকে তাঁর নাম-ধাম, কী করা হয়, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন করেন। বলাবাহুল্য আর দশজনের মতো বিপক্ষের উকিলেরও ওই অভিনেতাকে না চেনার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে ইনি যে আজ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন সব খবর রটে যাওয়ায় আদালতে বেশ ভিড় হয়েছে।

তবু মামুলি আদালতি কায়দায় উকিলসাহেব যখন অভিনেতার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনি কী করেন?' অভিনেতা নির্বিকারভাবে বললেন, 'আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।' বিচারক শুনে একটু বিরক্ত হয়ে অভিনেতাকে বললেন, 'আপনি আরেকটু বিনয়ী হতে পারেন না?' অভিনেতা বিনীতভাবে হেসে বললেন 'হুজুর, ক্ষমা করবেন। আদালতে শপথ নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারব না। যা সত্যি তাই বলেছি।'

ইতিমধ্যে আমার হাতে একটি প্রাচীন ও অসামান্য গ্রন্থ এসেছে। উত্তর কলকাতার একটি পুরোনো গ্রন্থাগার থেকে শ্রীকমলকুমার দত্ত বইটি আমাকে কয়েকদিনের জন্য এনে দিয়েছিলেন। শ্রীদত্ত নিজেও এ সব বিষয়ে চমৎকার লেখেন, তবু এই বইটির গল্পগুলি তিনি নির্বিচারে আমাকে ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন।

ইন্দ্রমিত্রের সেই বিখ্যাত বই 'সাজঘর', পুরোনো বাংলা থিয়েটারের অন্দরমহলের বিচিত্র বর্ণনা, সেই বইতে অনেকদিন আগে এ সব গল্প যেন কিছু কিছু পড়েছিলাম। কিন্তু 'সাজঘর' বইটি কবে যেন কাকে দিয়েছিলাম, এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

সে যা হোক এবারের প্রথম গল্পটি কিন্তু অন্য সূত্রে পেয়েছি, দ্বিতীয় গল্পটিও তাই। এটা শেষ করে পুরোনো বাংলা নাটকের হলে ঢুকব।

দ্বিতীয় গল্পটি হাসির নয় দুঃখের। নাটকের উদ্বোধন রজনীতে অভিনয়ের শেষে নায়িকা ফিরে গেছেন তাঁর প্রসাধন কক্ষে। একটু পরেই আর্ত চিৎকার। সবাই ছুটে গেলেন অভিনেত্রীর ঘরে। দেখা গেল তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর ক্রমাগত বলছেন, 'আমাকে ঠকিয়েছে।' পরিচালক দেখলেন নায়িকার পদপ্রান্তে পাঁচটি অভিনন্দন বার্তা লেখা ফুলের তোড়া পড়ে রয়েছে। নায়িকা সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আমি ছটা তোড়ার দাম দিয়েছি।'

এ গল্প অবশ্যই তত পুরোনো নয়। আমরা এবার সরাসরি প্রবেশ করছি

পুরোনো দিনের মিনার্ভা থিয়াটারে। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে জলধরের ভূমিকায় নেমেছেন অর্ধেন্দু মুস্তফী এবং তাঁর স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী গুলফন হরি। দুজনেই অত্যন্ত বাক্‌পটু, সুরসিক; যাকে রাজযোটক বলে একেবারে তাই।

সেদিন নাটক দেখতে এসেছেন সলোমন নামে এক নাটক পাগল ইহুদি সাহেব। মঞ্চের সামনের সবচেয়ে প্রথম সারিতে সলোমন বসে রয়েছেন, তাঁর হাতে একগুচ্ছ ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। গুলফন হরি স্বামীর চরিত্রে সন্দিগ্ধা রমণীর ভূমিকায় মুড়োঝাঁটা হাতে মঞ্চের এক প্রান্তে বসে আছেন আজ স্বামীকে হাতে নাতে ধরবেন বলে, এমন সময় সলোমন সাহেব একটা ফুলের মালা গুলফনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সেকালের যা রীতি, অভিনেত্রী সসম্মানে মালাটি গ্রহণ করলেন এবং গলায় ধারণ করে ঘোমটা দিয়ে বসে স্বামীকে ধরার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। স্বামীরূপী অর্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দুর্দান্ত স্ত্রীর কাছে যৎপরোনাস্তি নাজেহাল হলেন। তবে আজ মুস্তফী সাহেবের একটা সুবিধে হল। গুলফনের গলার মালাটা দেখে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন, 'আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো। বলি এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে, মালাটি দোলালে কে? বল দিলে কে?'

সুচতুরা, সুরসিকা গুলফন হরি তখনই অভিনয়ের ছলে সামনে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সলোমন সাহেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই , আমার নন্দাই।'

ওই মিনার্ভা থিয়েটারেই অন্য একদিন 'আবু হোসেন' মঞ্চস্থ হচ্ছে। সেদিন দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন পুলিস কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট আমীর হোসেন সাহেব। সেকালে নাট্যশালায় রাজপুরুষেরা কেউ এলে তাঁকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করা হত। অর্ধেন্দুশেখর অভিনব উপায়ে রাজপুরুষকে সংবর্ধিত করলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের তৎকালীন পরচুলা সরবরাহকারীর নাম ছিল বাবু হোসেন। আবু হোসেনবেশী অর্ধেন্দুবাবু মঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'আজ অভিনয় কী হবে?' তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, 'আবু হোসেন।' নিজের মাথার পরচুলায় হাত দিয়ে বললেন, 'এই চুল কে দিয়েছেন?' তারপর জবাব দিলেন, 'বাবু হোসেন।' এবারে তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রশ্ন, 'আর আজ দেখতে এসেছেন কে?' নিজেই উত্তর দিলেন, 'আমীর হোসেন।' তারপর দর্শকদের মধ্যে রয়াল বক্সে আসীন আমীর হোসেনের দিকে তাকিয়ে একটি রস মধুর অভিবাদন জানালেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর দু একটা গল্পও এই সূত্রে স্মরণ করা যায়। নাট্যসম্রাট

গিরিশচন্দ্রের কাছে রমানাথ নামে এক যুবক জানালেন তিনি একটা অপেরা লিখেছেন, ছাপা হচ্ছে। গিরিশচন্দ্র বললেন, 'নাচ-গান না হলে তো অপেরা হবে না।' কিন্তু রমানাথের কথায় জানা গেল নাটকে নাচ-গান কিছু বিশেষ নেই। এই সময়ে অমৃতলাল বললেন, 'গিরিশবাবু, রমানাথ নাচের ব্যবস্থা করেছে।' গিরিশবাবু হেসে বললেন, 'কীরূপ?' অমৃতবাবু বললেন, 'যখন রমানাথ বই ছাপতে দিয়েছে, তখন অবশ্যই টাকা আদায়ের জন্য ছাপাখানার বিল রমানাথের বাড়িতে আসবে। সেই বিল দেখলেই রমানাথের বাবা নাচতে আরম্ভ করবে।'

আরেকবার স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। সারা দেশে একটা হই চই পড়ে গেছে। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ একদিন বোষ্টমদের বিনামূল্যে 'চৈতন্যলীলা' দেখানোর কথা ঠিক করেন। কিন্তু একজন প্রশ্ন তুলল, 'যদি কেউ বোষ্টম সেজে নকল টিকি লাগিয়ে ফাঁকি দিয়ে নাটক দেখে যায় তবে সেটা ঠেকানো যাবে কী করে।' সেকালের প্রসিদ্ধ অভিনেতা প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বাতলে ছিলেন, 'ভাবনা কী [illegible] আগে টিকি টেনে দেখব, তারপর ঢুকতে দেব।'

অন্য [illegible] গল্প মতিলাল সুর নামে [illegible] সরল প্রকৃতির অভিনেতাকে নিয়ে। মতিলালবাবু সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সকলেই বিশেষ করে রসরাজ অমৃতলাল তার পিছনে সুযোগ পেলেই লাগতেন।

একবার মফস্বলে থিয়েটার করতে গেছেন সবাই। মতিলালবাবু অবস্থাপন্ন লোক, সঙ্গে চাকর নিয়ে গেছেন, চাকরের নাম একলু। কিন্তু রসরাজ কয়েকজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চাকরটিকে বখশিশ দিয়ে হাত করলেন, তারপর তাকে বললেন, 'তোমার একলু নামটা ভালো নয়। আজ থেকে তোমাকে চামচিকে বলে ডাকব।' বোকা চাকর এতেই রাজি হল, সবাই তাকে চামচিকে বলে ডাকে সে তাদের তামাকটামাক সেজে দেয়। মতিলালবাবু প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি কিন্তু একদিন তিনি ব্যাপারটার রহস্য ধরতে পারলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, চাকরের নাম হল চামচিকে, এদিকে একটা কথা আছে ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মানে আমি হলাম ছুঁচো। ব্যাপারটা অনুধাবন করতেই মতিলালবাবু বন্ধুদের তাড়া করে গেলেন এবং হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন।

দানীবাবু আর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটা গল্পও তুলে দিচ্ছি। 'চাঁদবিবি' নাটকে দানীবাবুকে বিজাপুরের সুলতান আদিলশার একটা ছোটো পার্ট দেয়া হয়েছে। দানীবাবু সমস্ত পার্ট বিতরিত হবার পরে এসেছেন বলে এ অবস্থা। তবে তাঁর মর্যাদার যোগ্য জমকালো পোশাক তৈরি করতে দেয়া হল। দানীবাবু জানালেন,

'আদিলশার ভূমিকায় পোশাকের আড়ম্বর দরকার নেই। যা হয় একটা করবেন।' বিদ্যাবিনোদ বুঝলেন ছোটো পার্ট খেয়ে দানীবাবুর অভিমান হয়েছে। তিনি দানীবাবুকে প্রবোধ দিলেন, 'আদিলশা দাক্ষিণাত্যের একটা বড়ো বংশের মস্ত ঘরের ছেলে। সে কী দিনরাত বড় বড় করে বকবে? জোর একটা হুঁ করলে কী একটা হাঁ করলে।'

শেষ করার আগে অর্ধেন্দু মুস্তফীর অন্তত আরেকটা গল্প বলে নিই।

একদিন মুস্তফী সাহেব একটি নাটকে অভিনয়কালীন 'হরে' ভৃত্যকে ডাকছেন। ভৃত্যের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্টেজে আসতে দেরি হচ্ছে, এ জন্যে অর্ধেন্দুবাবু রাগের ভান করে 'হরে, হরে' বলে নেপথ্যাভিমুখে চিৎকার করছেন। এমন সময় দর্শকের আসন থেকে একজন রঙ্গ করে বলল, 'আজ্ঞে যাই।' সঙ্গে সঙ্গে মুস্তফী সাহেব লোকটির দিকে লক্ষ করে [illegible] তুমি ওখানে বসে আছো।

পুনশ্চ : এত সব অবিস্মরণীয় পুরা কাহিনীর অন্তে একটি চটুল হলিউডি ঘটনা বলি। গল্প নয় নিতান্তই ঘটনা। হলিউডের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজকর্ম ভালো নয়, কেমন যেন এলোমেলো। কয়েকদিন আগে কাগজপত্র ঘেঁটে ধরা পড়েছে নায়িকা মহোদয়া এখন পর্যন্ত যতগুলি বিয়ে করেছেন হিসেবের ভুলে তার থেকে দুটো ডাইভোর্স বেশি করেছেন। এখন কী হবে?

যা চলে তাই গাড়ি

আমাদের অল্প বয়েসে একটা খুব মজার গল্প ছিল এক প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে। গল্পটা খুবই পুরনো কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের একালের পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই এসব গল্প জানেন না, যেমন তাঁদের কারো কারো চিঠি পেয়ে আবিষ্কার করেছি কাণ্ডজ্ঞানের লেখক নিজেই জানে না একালের অনেক কথামালা। কাণ্ডজ্ঞানের অনেক বিষয়ে কেউ কেউ আমাকে এমন সব গল্প চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যা লিখিনি বলে আমার আফশোস হয়েছে।

আফশোসের কথা থাক। জেনারেশন গ্যাপের সুযোগে প্রথমে পুরোনো গল্পটা বলে নিই, এক ড্রাইভার তার দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে এক ছুটির দিনে যাদুঘর দেখতে গেছে। যাদুঘরে হাজার রকম দেখার জিনিস, দেখতে দেখতে সে তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছে ম্যমির ওখানে। ম্যমিটি যে একটা মৃতদেহ সেটা সে বুঝতে পেরেছে কিন্তু ম্যমিটি একটু দেখেই ম্যমির গায়ে কী একটা কথা পড়ে সে দৌড়ে যাদুঘরের থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর এক দৌড়ে সোজা নিজের আস্তানায়। দেশোয়ালি ভাইয়েরা পরে তাকে এসে ধরল, 'তুমি ওই রকম দৌড়ে পালিয়ে এলে কেন?' সে বলল, 'আরে সর্বনাশ মরাটার গায়ে আমার গাড়ির নম্বর দেখলে না! ওই লোকটাকেই তো পরশুদিন আমি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছি। গাড়ির নম্বর যখন পেয়েছে এবার পুলিস নিশ্চয় আমাকে ধরবে।' বলে লোকটি বাক্স-বিছানা নিয়ে কোথায় পালাল কে জানে? ড্রাইভারটি যে গাড়ি চালাতো তার নম্বর ছিল ডবলিউ বি সি ৫৪০ আর ম্যমিটির গায়ে লেখা ছিল বি সি ৫৪০, মানে খ্রিষ্ট পূর্ব ৫৪০ অব্দের। এটাই তার ভয় পাওয়ার কারণ।

(অত্যধিক কৌতূহলী পাঠকের কাছে বিনীত নিবেদন এ নিয়ে বেশি খোঁজখবর করবেন না, গাড়ির নম্বর ও ম্যমির অব্দ অন্যও হতে পারে তবে দুটোই এক ছিল।)

এই মুহূর্তে যে দ্বিতীয় গল্পটি কলমের নিবের নিচে সুড়সুড় করে এসে লাইন দিয়েছে সেটাও গাড়ি চাপা নিয়ে। আমার এক বন্ধু খুব বেআইনি গাড়ি চালাতেন, একবার এক মোটর সাইকেল আরোহী সার্জেন্ট অনেক চেঁচামেচি করে তাড়া করে এসে তাঁকে ধরে ফেলেন, 'আমি যে এত চেঁচাচ্ছি পিছনে পিছনে আপনি শুনতে পান নি?' সার্জেন্টসাহেব প্রথমেই উত্তেজিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। অস্বীকার

করার উপায় ছিল না, বন্ধুবর ঢোঁক গিলে বললেন, 'হ্যাঁ শুনেছি।' সার্জেন্টসাহেব আরও ক্ষিপ্ত হলেন, 'তাহলে, দাঁড়ালেন না কেন?' বন্ধুটি অকপটে বললেন, 'আমি ভেবেছি আমি বুঝি কাউকে চাপা দিয়েছি, সেই চেঁচাচ্ছে। চেঁচাতে চেঁচাতে পিছনে ছুটছে।'

তবে গাড়ি বিষয়ে সবচেয়ে মর্মান্তিক গল্পগুলি এই শহরেই এক সওদাগরি অফিসের বড়োসাহেবের লোকান্তরিতা বেগমসাহেবাকে নিয়ে। বলা বাহুল্য তিনি লোকান্তরিতা হয়েছেন ওই গাড়িরই কল্যাণে।

বেগমসাহেবাকে আমি জানতাম একাধিক সূত্রে। কতবার কত জায়গা থেকে, নিমন্ত্রণ-পার্টির শেষে ভদ্রমহিলা আমাকে লিফট দিতে চেয়েছেন, একবারই সে সুযোগ গ্রহণ করেছিলাম। ড্রাইভার ও স্বামীকে পিছনের সিটে বসিয়ে আমাকে পাশে নিয়ে ঈষৎ মত্ত বেগমসাহেবার প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কী ভীষণ গতিতে গাড়ি চালনা! বেশি বৃষ্টি বলেই আমি বাধ্য হয়ে লিফট নিয়েছিলাম। কিন্তু যা হয়েছিল তা অবর্ণনীয়। গাড়ির সামনের উইণ্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার কাজ করছেনা, বৃষ্টির স্রোতে পুরো কাচ ঝাপসা হয়ে গেছে। জগৎসংসারে কিছুই দেখেতে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মোড়ে গাড়িটা একটু দাঁড়াতে সন্ত্রস্ত হয়ে আমি বললাম, 'বেগমসাহেবা, গাড়িটা একটু দাঁড় করান, আমি রুমাল দিয়ে সামনের কাচটা মুছে দিয়ে আসি।' বেগমসাহেবা আমার হাত ধরে বাধা দিয়ে বললেন, 'কেন মিছিমিছি বৃষ্টিতে ভিজতে যাচ্ছেন। সামনের কাচ মুছে কী লাভ হবে?' আমি অবাক হয়ে তাকাতে বেগমসাহেবা বললেন, 'আমার তো মাইনাস চার চশমা, পার্টিতে আসব বলে সেটা চোখে দিয়ে আসিনি।'

আরেকবার, সে ঘটনার সঙ্গী অবশ্য আমি নই। অন্য এক বন্ধুর মুখে শুনেছি একদা প্রভাতকালে আমার সেই বন্ধুটি বেগমসাহেবা এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। যথারীতি বেগমসাহেবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটছে, সকালবেলার মফস্বল এলাকার ফাঁকা রাস্তা। কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই, লোকজনও নেই। গাড়ির উদ্দাম বেগ দেখে রাস্তার আশপাশ থেকে, গোরু, ছাগল, কুকুর ছুটে পাশের মাঠে নেমে যাচ্ছে। পথের একপ্রান্তে ইলেকট্রিক পোলের উপর উঠে দুজন তার-চোর বিদ্যুতের তার কাটছিল। বেগমসাহেবা তাদের দেখে ভাবলেন যে বোধ হয় তাঁর গাড়ি চালানোয় ভয় পেয়ে পোলের উপর উঠে বসেছে। তিনি উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে যেই জানতে গেছেন, 'তোমাদের এত ভয় কিসের?' চোর দুটো একলাফে আঠারো ফুট

নিচে পড়ে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাঁই বাঁই করে দৌড় দিল। বেগমসাহেবা এবং তাঁর সঙ্গীরা বিস্মিত হয়ে তাদের পলায়ন দেখলেন।

মৃতা মহিলার সম্পর্কে বেশি দুঃখজনক স্মৃতিকথায় না গিয়ে তার একটি বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি। তিনি এক সন্ধ্যায় একটা গাড়িকে গুঁতো মেরে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন তারপর সেই গাড়ির ড্রাইভারকে চেপে ধরলেন, 'আমি জানতে চাই এসব কী হচ্ছে? এই এক সন্ধ্যায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে পর পর ছটা গাড়ির সঙ্গে আমার গুঁতো লাগল, আমি জানতে চাই কলকাতার ড্রাইভাররা সব হয়েছেটা কি?'

দুর্দান্ত ড্রাইভারের সঙ্গে রাজযোটক সম্পর্ক খারাপ গাড়ির। খারাপ গাড়ি মানে পুরোপুরি ভাঙা নয়, চলছে কিন্তু চলছে না এই রকম গাড়ি। খারাপ গাড়ি হাজার রকমের। শিবরাম চক্রবর্তী একটা গাড়ির নমুনা দিয়েছিলেন, যার হর্ন ছাড়া আর সবই বাজে। এই 'বাজে' শব্দটি বিশেষণ না ক্রিয়াপদ সে নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রমথ সমাদ্দার একটা কার্টুন এঁকেছিলেন, অক্সফোর্ড মডেলের গাড়ি। আসলে সেটা একটা মান্ধাতা আমলের ফোর্ড গাড়ি, এখন গোরুতে মানে অক্সে টানে তাই ঘুরে নাম হয়েছে অক্সফোর্ড।

এই রকম আরেকটা পুরোনো, বহু পুরোনো মাইনর মরিস গাড়ির কথা জানি, তার মালিক আমার পুরোনো পাড়ার এক প্রতিবেশী গাড়িটাকে রীতিমতো হাত দিয়ে চাপড়ে আদর করে বলতেন, 'বুড়ো খোকা, কবে তোমার একুশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর তুমি মাইনর নও এখন তুমি মেজর মরিস।'

সেই মেজর মরিস সম্পর্কে ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন লিটারে পঁচিশ কিলোমিটার যায়। এই অবিশ্বাস্য তৈলাক্ত ঘোষণা আমরা বিশ্বাস করিনি; জোর করে চেপে ধরতে ভদ্রলোক স্বীকার করেছিলেন, ওই পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে চার-পাঁচ কিলোমিটার যায় তেলে, আর বাকিটুকু অনিবার্যভাবে গাড়ি খারাপ হয়ই তখন কুড়ি-একুশ কিলোমিটার ঠেলে-ঠেলতেই হয়, উপায় নেই।

একেকটা খারাপ গাড়ির একেক রকম দোষ, একেক রকম মেজাজ। এক বিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসের মাত্র প্রথম পৃষ্ঠাটি আমি পড়েছিলাম তাতে বোধ হয় লেখা ছিল, সব সুখী পরিবারের চেহারাই এক রকম কিন্তু অসুখী পরিবারগুলি একেকটা একেকরকম। খারাপ গাড়ি সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। পিছনের নাম্বার প্লেট থেকে সামনের নাম্বার প্লেটের মধ্যে যে চার মিটার জিনিসপত্র রয়েছে তার প্রত্যেকটির বিচিত্রভাবে খারাপ হওয়ার যোগ্যতা আছে।

আমি একবার একটা গাড়ির পিছনের সিটের ভাঙা স্প্রিং ও দড়ির মধ্যে দেড়ঘণ্টা আটকে থাকার পর প্রাণপণ চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে বেরিয়ে আসি। বসার সময় মোটেই টের পাইনি, সিটটা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। আরেকবার হাজারিবাগে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সির হাতল ধরে দরজা খুলতে গিয়ে পুরো দরজাটা মাথায় এসে পড়ে।

এগুলো অবশ্য গাড়ির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের অফিসের একটা গাড়ি ছিল ছাড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো গাড়ির ভেতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যেত। কোথা থেকে কী কৌশলে সেই ধোঁয়া হত কলকাতার বড়োবড়ো মিস্ত্রিরা তা ধরতে পারেনি। আরেকটা গাড়ি ঠিক পনেরো মিনিট চলার পরে প্রহৃত কুকুরশাবকের মতো কোঁ কোঁ করে কাঁদত। গাড়িতে কোনো নতুন লোক থাকলে চমকে উঠত, ভাবত সত্যি কোনো কুকুরছানা চাপা পড়েছে।

আমি গাড়ির ইঞ্জিন, কলকব্জার গোলমালের কথা বলতে যাচ্ছি না, সে অনেক বিস্তারিত ব্যাপার। বরং আর একটা পুরোনো গল্প দিয়ে শেষ করি। আমাদের বন্ধু স্বর্গীয় বিমল রায়চৌধুরী একবার একটা ঝরঝরে ট্যাক্সিতে কোথায় যাচ্ছিলেন, গাড়ি অত্যন্ত শ্লথ গতিতে ক্যাঁচক্যাঁচ করে চলেছে। বিমল ড্রাইভারকে বললেন, 'দাদা একটা ছাগলকে পেট্রোল খাওয়ালে এর থেকে তাড়াতাড়ি যেত।' সেই ড্রাইভার অম্লান বদনে বলল, 'কিন্তু আমি তো পেট্রোল খাইনি।'

অমল ধবল পালে

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্ষাশেষে প্রথম শারদপ্রাতে আমি এই মহানগরীতে অনুপ্রবেশ করেছিলাম।

এর আগে অবশ্য আরো দুএকবার নেহাত বেড়ানোর জন্যে এবং একবার মাসতুতো বোনের বিয়েতে মা-বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছি। কিন্তু সেই শারদপ্রাতে সবুজ পাসপোর্ট, সবুজ পাঞ্জাবি, এই শহরে আমার পুরোপুরি আসা।

কলেজে ভর্তি হতে এসেছিলাম। তারপর খেলাচ্ছলে, সুখেদুঃখে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু বোঝার আগে প্রায় চার দশক পূর্ণ হতে চলেছে।

সে বছর পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক পর্ষদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরোতে একটু দেরি হয়েছিল। রেজাল্ট বেরনোর পরের দিনই বোধ হয় আমাকে রওনা হতে হয়েছিল। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল এর পরে আর 'যাত্রাশুভ' ছিল না, সেটাই ছিল শ্রাবণ মাসের শেষ দিন, তারপরই ভাদ্র মাস, যাত্রা নাস্তি। সুতরাং আমাকে তড়িঘড়ি রওনা হতে হল, বিকেলে রেজাল্ট এল, পরদিন সকালেই কলকাতা যাত্রা।

কত কী ভুলে গেছি সামান্য জীবনে।

কত মুখ, কত নাম, কত ঠিকানা। অনেক ভালোবাসাভরা স্মৃতি, অনেক বেদনাভরা দুঃখ। কত কিছু আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই চলে আসার দিনটিকে ভুলিনি।

সেটা ছিল একত্রিশে না বত্রিশে শ্রাবণ। আগের দিন আকাশ ঝকঝকে ছিল। বাড়ির মধ্যে উঠোনের পাশে গোল বারান্দায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পরদিন কলকাতায় চলে আসার উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না চোখে।

মেঘ মুছে যাওয়া বর্ষণ শেষের আকাশে হাজার হাজার তারা ঝিকমিক করে জ্বলছে। পায়ের কাছে, সিঁড়ির নিচে, অনেকদিন আগের ভুঁই চাঁপা ফুলগুলো, যাদের সবাই ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ সেদিনই সন্ধ্যায় মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উল্টো দিকে হারাণ মিস্ত্রির বাড়িতে একটা বোকা শিউলিগাছ একটু আগেই ফুল ফোটানো শুরু করেছে। তার সঙ্গে বোকামি করছে আমাদের ভাঙা বাগানের

বুড়ো কামিনীফুলের গাছটা, ঠিক চৈত্র মাসের মতো হঠাৎ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে বাড়ির থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে বেরিয়ে চার মাইল দূরে নদীর ঘাট থেকে স্টিমারে উঠে বিকেল-বিকেল সিরাজগঞ্জ রেল স্টেশন, সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলা সুরমা মেল, পরদিন ভোরবেলায় সরাসরি শেয়ালদা, মোক্ষনগরীর কলকাতা।

সুন্দর সকালবেলায় অশ্রুসজলা জননী, চেনা বাড়িঘর, লোকজন, গাছপালা প্রাণপ্রিয় জন্মের শহর ছেড়ে টমটমগাড়িতে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে আকাশ অন্ধকার করে তুমুল বৃষ্টি এল, জলের তোড়ে ঝাপসা হয়ে গেল চারপাশের দৃশ্য।

কোনো রকমে ভিজতে ভিজতে বাক্স-বিছানা নিয়ে স্টিমারে গিয়ে উঠলাম। রীতিমতো দুর্যোগ, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া নেই তাই রক্ষা, স্টিমার ঠিক সময়েই ছাড়ল এবং পৌঁছাল। সারা দুপুর নদীতে কখনো ঝিরঝির করে, কখনো জোরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল।

সিরাজগঞ্জ ঘাটেও সমান বৃষ্টি। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টির বেগ প্রবলতর হল। তার মধ্যেই রওনা হল সুরমা মেল। ছোটো ছোটো সব স্টেশন সিরাজগঞ্জ টাউন, রায়পুর, স্বল্প বৃষ্টির মধ্যে ঢেকে রেখে ঈশ্বরদি জংশন, পদ্মার ওপরে সাড়া ব্রিজ, পোড়াদহ পার হয়ে এলাম; তখনো অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এরই মধ্যে শুল্কপ্রহরা, ছাড়পত্র সীমান্ত পেরোলাম।

এর পর শেষ রাতের দিকে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আমার রাত পোহালো শারদপ্রাতে, রোদে ঝলমল করছে চারিধার, ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশে স্বচ্ছ সাদা মেঘ। অন্ধকার মেঘ বৃষ্টির কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত নেই, জলবৃষ্টির পৃথিবী ছেড়ে নীল দিগন্তের দিকে জোর ছুটছে সুরমা মেল।

এক-এক করে ক্রমশ ছিটকিয়ে চলে যাচ্ছে পলতা, শ্যামনগর, শহরতলির স্টেশন আর কিছুক্ষণের মধ্যে কলকাতা। পহেলা ভাদ্র, শরতকালের প্রথম প্রভাতে নীল আকাশের নিচে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মহানগরীতে এসে প্রবেশ করলাম।

এখনো যখন কোনো কোনো দিন বর্ষা শেষ হওয়ার মুখে হঠাৎ মেঘ কেটে নীল রঙের আকাশ ঝলমল করে ওঠে ঝকমকে রোদ্দুরে ভরে যায় আমাদের এই নগরীর রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, আমার মনে পড়ে যায় একদা এমনই এক শুভপ্রভাতে এই শহরে আমি চিরদিনের জন্য প্রবাসী হয়েছিলাম।

শিশুশিক্ষার বইতে ঋতু পরিচয়ে লেখা আছে, 'ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎ কাল'। যদিও ভাদ্র মাসের অনেকটাই, কোনো কোনো বছর প্রায় পুরোটাই, বর্ষাকালের মধ্যে পড়ে। এমনকি আশ্বিন মাসেও বর্ষা থেকে যায়, বিজয়া দশমীর দিন ঝড়জল তো প্রায় বাঁধা ব্যাপার, কবিও লিখেছেন মেঘে ঢাকা দারুণ দুর্দিনের আকুল আশ্বিনের কথা।

'শরৎ' কথাটির সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ নেই ইংরেজিতে, Autumn হল হেমন্ত ঋতু, বিলিতি অভিধানের ভাষায় গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে আমাদের রয়েছে দীর্ঘ বর্ষাকাল। তবে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় অনেকেই শরৎকাল বোঝাতে Early Autumn বা আগ হেমন্ত কথাটি ব্যবহার করেন।

এই পর্যন্ত লেখার পরে অভিধান দেখতে গিয়ে খটকা লাগছে। আমরা ছোটোবেলায় বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে যে ষড়ঋতুর কথা জেনেছিলাম সেই হিসেবে শরৎকাল হল ভাদ্র-আশ্বিন। সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে' দেখছি যে শরৎকাল হল আশ্বিন-কার্তিক মাস। কিন্তু কার্তিক তো হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস সে কী করে শরতের সঙ্গে জুড়ে গেল?

রাজশেখর বসুও আমাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারছেন না। তাঁর 'চলন্তিকা'য় দেখছি ওই একই কথা। শরৎ মানে আশ্বিন-কার্তিক, তবে তিনি একটু রফা করেছেন, ব্র্যাকেটে লিখেছেন মতান্তরে ভাদ্র-আশ্বিন। এ বিষয়ে অবশ্য আশুতোষ দেবের অনেক পুরনো 'সরল অভিধান' আমার পক্ষে রয়েছে, সেখানে শরৎ বলতে পরিষ্কার বলা হয়েছে ভাদ্র-আশ্বিন মাস।

কলকাতায় এসে আমি উঠেছিলাম একেবারে শহরের খোদ মধ্যখানে এসপ্লানেডের ডেকার্স লেনে আমার ছোটো মাসিমার কাছে। সেটা ছিল সরকারি কোয়ার্টার, সেই বাড়িতে তিন ঘর বাঙালি ছাড়া পুরো এলাকায় ধারেকাছে কোনো বাঙালি ছিল না। তখনো সব ইংরেজ চলে যায়নি, তাছাড়া প্রায় সবাই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, কিছু দক্ষিণ ভারতীয় খ্রিষ্টান। পাশেই চিনেপাড়া। ইতস্তত এদিক ওদিক সন্দেহজনক এলাকা।

ও পাড়ায় দুর্গাপুজোর কথা তখন ভাবাই যেত না। কাছাকাছির মধ্যে দুর্গাপুজো বৌবাজারে আর তালতলায়। অবশ্য সুরেন ব্যানার্জি রোডে নিউ মার্কেটের ওপাশে রানি রাসমণির বাড়ির প্রাচীন পুজোও ছিল, কিন্তু তখন আমরা তার খবর রাখতাম না।

তখন খবরের কাগজে প্রাচীন বা বিশিষ্ট পুজো নিয়ে এত লেখা, ছবি, আলোচনার আয়োজন ছিল না। লোকমুখে শুনেই সবাই ঠাকুর দেখতে বেরতো, চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে দমকলের প্রতিমা, শ্যামবাজার বা ভবানীপুরের ক্লাবের ঠাকুর।

অবশ্য কলকাতায় শরৎকালে ঠাকুর দর্শনের খুব একটা সুযোগ আমার হয়নি। তার কারণ তখনো বাড়ির লোকেরা সবাই দেশে। প্রত্যেকবারই পুজোর সময় ষষ্ঠীর দিন শেয়ালদা থেকে রেলে করে বাড়ি ফিরে যেতাম। শেয়ালদা স্টেশন চত্বরে তখন ঢাকের আওয়াজ গমগম করছে, সীমান্তের ওপার থেকে পুজোর চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, কুষ্ঠিয়া থেকে ঢাকিরা এসেছে কলকাতার পুজোয় চারদিনের মেয়াদে। এ তাদের বাৎসরিক বৃত্তি, সারা বছর ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে শুধু এই চারদিন মহানগরীর জন্যে।

শুনেছি এই এতদিন পরে, এখনো ঢাকিরা ওপার থেকে প্রায়ই একইভাবে শেয়ালদায় এসে পৌঁছায় পুজোর আগে, তবে আমি দেখিনি। ষষ্ঠীর সকালে এখন আর শেয়ালদায় যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়ি যাওয়া অনেকদিন বন্ধ হয়েছে।

কলকাতায় থাকতে এসে আমার প্রথম যে শারদীয় অভিজ্ঞতা হল সে হল মহালয়ার পুণ্যপ্রভাতে। শেষ রাতে ঘুম জড়ানো চোখে বিছানায় বসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর পঙ্কজ মল্লিকের মহালয়ার দেবীবন্দনা।

আমরা যে সুদূর তেরো নদী পারের ছোটো মফস্বল শহরে বড়ো হয়েছিলাম সেখানে বেতারযন্ত্র তখনো যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়, ঘরে ঘরে রেডিয়ো পৌঁছয়নি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে ও জিনিসটা ছিল না, পাড়াতেও বোধ হয় নয়। সুতরাং কলকাতায় আসার আগে মহালয়ার ভোরের দেবীবন্দনার কোনো ধারণাই আমার ছিল না। শাস্ত্র, স্তোত্র, সঙ্গীতের এমন ভাবগম্ভীর সমারোহ, উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি, শেষরাতের আধো অন্ধকারে সুরের মায়াজাল এক মফস্বল বালকের মুগ্ধ ও শিহরিত হওয়ার পক্ষে এর বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল না।

শরৎকাল বলতে পঞ্জিকায় বা ক্যালেণ্ডারে যাই বোঝাক, অভিধানের মানে যাই হোক এই শহরে শরৎকালের শুরু ওই মহালয়ার সকালে।

আমাদের ডেকার্স লেনের পাড়ায় চারদিকে যেমন কোনো বারোয়ারি পুজো ছিল না সেইজন্যে চাঁদার উৎপাতও ছিল না। তখন অবশ্য চাঁদা পুরোটা উৎপাত ছিল না। চোখ রাঙানি ছিল না, চাঁদা আদায়ের বেশির ভাগটাই ছিল আদর-আবদার। কিন্তু পুজো না থাকায় আমাদের এলাকায় সেই আদর আবদারও ছিল না।

চাঁদা নয়। শিউলি ফুলও নয়।

ওই কাঠকট্টর পাড়ায় কোনো বাড়িতে উঠোন ছিল না। গলির মধ্যে একটাও গাছ ছিল না। কোনো জাতেরই গাছ নয়। ডেকার্স লেনের বাড়ির জানলায় বা বারান্দায় কিংবা গলির পথে মেম যুবতীর পাউডার পমেটম বা এসেন্সের উগ্র সুবাস হয়তো কখনো নাকে পেয়েছি কিন্তু কচ্চিৎ এক ঝলক শিউলি ফুলের গন্ধ কখনো বাতাসে আসেনি।

আর কাশফুল? শরৎকালের অন্য অনুষঙ্গ?

কাশফুলের প্রশ্নই আসে না। কলকাতায় কাশফুল ফুটল তো এই সেদিন। পাতাল রেলের মাটি কাটার পর হঠাৎই একদিন এক শারদীয় পুণ্যক্ষণে চৌরঙ্গীর সীমানায় ময়দান জুড়ে ফুটে উঠল রাশি রাশি কাশফুল। কাগজে কাগজে ছবি বেরলো নীল আকাশের সাদা মেঘের নিচে কলকাতায় ময়দানের হাওয়ায় আন্দোলিত ক্ষুদ্র কাশগুচ্ছের।

আমি কলকাতায় এসে শরৎকালের শিশির, শিউলিফুল বা কাশের গুচ্ছের দেখা পাইনি। প্রথম দিনের প্রবেশকালে ঝলমলে রোদ্দুরের যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম সেটুকুই যা ছিল শারদীয়।

কিন্তু মহালয়ার দিন শেষরাতের বেতার তরঙ্গাঘাতের নাগরিক শরৎকালের সঙ্গে পরিচয় হল। এর আগেই অবশ্য পুজোর বাজার কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। হকার্স কর্নার ব্যাপারটা তেমন চালু হয়নি। কেবল কলেজ স্ট্রিটে গোলদীঘির চারপাশে আর বোধহয় ধর্মতলায়। জুতোজামা, শাড়ির বাজার কলেজ স্ট্রিটে, বড়োবাজারে। গড়িয়াহাটের রমণীশাসিত বাজার ভালো করে আরম্ভ হয়নি। শুধু দুএকটি বড়ো দোকান মোড়ের কাছাকাছি।

কলকাতার বিখ্যাত ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলো যথা কমলালয়, ওয়াছেল মোল্লা, হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন তখনো জমজমাট। এত না হলেও কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে পুজোর কেনাকাটার। লাল সালুতে 'সেল, সেল' কিংবা সিনেমায় বিজ্ঞাপনের স্লাইড পুজোর বাজারের খবর বহন করছে।

আস্তে আস্তে টের পাওয়া যাচ্ছে শরৎকাল। মফস্বল থেকে, দিল্লি, পাটনা, মুম্বাই থেকে প্রবাসী বাঙালিরা ঘরে আসছে বছরকার দিনে। রাস্তাঘাটে সপরিবারে তাদের দেখলেই চেনা যাচ্ছে।

মহালয়ার দিন সকালের দেবীবন্দনায় যে নাগরিক শরৎকালের শুরু সেই দিন আরো কিছু বড়ো ব্যাপার ছিল।

গঙ্গায় তর্পণের স্নান কিংবা কালীঘাট অথবা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম

করার মতো ধর্মীয় ব্যাপার ছাড়াও মহালয়ার দিনটি লক্ষণীয় ছিল আরো দুটো কারণে।

প্রথম হল বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয় সাহিত্যসম্ভার, যার ডাক নাম হল পুজো সংখ্যা। সেই সময়েই এগুলো জনপ্রিয় হওয়া শুরু করে। কাগজগুলো যথাসম্ভব মহালয়ার দিনই বের হত। শারদীয় দেশ তখনো পুরোপুরি গল্প আর কবিতার। কিছুকাল পরে একটি করে উপন্যাসও থাকত। বড়ো উপন্যাস থাকত আনন্দবাজারে বেরতো মোটা কাগজে, বোর্ড বাঁধাই ছোটদের পূজাবার্ষিকী। তবে এত বেশি শারদীয় সংখ্যা তখন ছিল না, তখনো সিনেমার কাগজ সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেনি। তবে অন্য ধরনের কিছু সাপ্তাহিক ও মাসিক ছিল, ছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা কিংবা হুমায়ুন কবীরের চতুরঙ্গের মতো অভিজাত লিটল ম্যাগাজিন।

মহালয়ার দিন সকালে ধর্মতলার কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় পত্রিকার স্টলে দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে দাঁড়াতাম। সে এক রোমাঞ্চকর শারদীয় স্মৃতি।

আমি তখন উল্টোপাল্টা দিস্তা দিস্তা কবিতা লিখে ছোটো বড়ো, খ্যাত অখ্যাত সমস্ত পত্রিকায় পাঠিয়ে যাচ্ছি; সমস্ত সাধারণ ও বিশেষ সংখ্যায়, শারদীয়া সংখ্যায় অবশ্যই।

আস্তে আস্তে কাঁপা হাতে পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলে সূচিপত্রে নিজের নাম খুঁজতাম। হঠাৎ কখনো হয়তো দু-চার পঙ্ক্তি ছাপা হয়েছে। হয়তো বা পাদপূরণের জন্যেই। আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাওয়ার বয়েস সেটা, খুশি মনে কার্জন পার্কের দিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করতাম বর্ষাশেষের গাছের পাতা, মাঠের ঘাস অনেক বেশি সবুজ। গাছের পিছনে আকাশের নীলে সমুদ্রের চঞ্চলতা, অমল ধবল পাল তুলে সেখানে সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। পকেটের পয়সা দিয়ে আমার লেখা ছাপা হওয়া কাগজটি তখনই কিনে ফেলতাম। কমপ্লিমেনটারি কপি কবে পাওয়া যাবে কে জানে! ততদিন অপেক্ষা করার অবসর কোথায়।

মহালয়ার দিনে দ্বিতীয় বড়ো আকর্ষণ ছিল সারা রাতের থিয়েটার। উত্তর কলকাতায় হাতিবাগানে তখন শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, স্টার ইত্যাদি তিন চারটি থিয়েটার হল্ পুজোর বাজারে জমজমাট বন্দোবস্ত করত।

এক রাতে তিনটি কী চারটি পালা। শেষরাতে আকাশ ফর্সা হয়ে কাকডাকা পর্যন্ত অভিনয় চলত। থিয়েটার দেখা শেষ করে লোকেরা ফার্স্ট ট্রামে করে বাড়ি ফিরত। তখন রাস্তা জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। গ্যাসের আলো নেবাতে কর্পোরেশনের লোকেরা পথে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি অবশ্য কোনোদিন সারারাত জেগে থিয়েটার দেখিনি। সারারাত জাগার

ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে পাঠাননি। জীবনে একদিনও আমি সারারাত জাগতে পারিনি। তবে এক মহালয়ার রাতে মফস্বলের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে 'হোল নাইট' থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে রাত দশটা না সাড়ে দশটায় প্রথম পালা, বোধহয় সেটার নাম ছিল 'গঙ্গাবতরণ'। শেষ হওয়ার আগেই সিটে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে উঠে হলের সামনের বারান্দায় একটা লম্বা হেলান দেয়া কাঠের বেঞ্চি ছিল সেটিতে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

ওই থিয়েটার হলের প্রাঙ্গণের মধ্যেই কিংবা আশেপাশে কোথাও সেদিন সারারাত ধরে টুপটুপ করে শিউলি ফুল ঝরে পড়েছিল, আমি ঘুম আর তন্দ্রা জড়ানো হাওয়ায় সেই ফুলের সুবাস পেয়েছি।

ভোরবেলা আমার সঙ্গের লোকেরা আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল সেই কাঠের বেঞ্চি থেকে। দুহাত দিয়ে চোখ কচলিয়ে কোনো রকমে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি বারান্দার একদিকে ওপাশের দেয়ালের সামনে একটা ছোট্টো শিউলি গাছ থেকে অনেক ফুল উঠোনে ঝরে পড়ে রয়েছে। আমি রুমালে কয়েকটা শিউলি ফুল কুড়িয়ে নিলাম। বোধহয় সেই শেষবার। তার পর আর কখনো শিউলিফুল কুড়িয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

ভোরবেলায় ট্রামে হাতিবাগান থেকে এসপ্লানেড আসতে আসতে দেখলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট আর ওয়েলিংটনের রাস্তা এধার ওধার বাঁশ দিয়ে পুজোমণ্ডপের ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে। এখনকার মতো এত নয়, তবুও যথেষ্ট আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কলকাতায় আসার পর প্রথম কয়েক বছর এসপ্লানেড অঞ্চলে থাকার জন্যেই কোনো পাড়ার বা বারোয়ারি পুজোয় আমি জড়িয়ে পরিনি। তার অন্য একটা কারণ অবশ্য এই যে আসল পুজোর সময় তো আমার থাকা হচ্ছে না। ষষ্ঠীর বোধন থেকে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত থাকতে না পারলে পুজোর ব্যাপারে জড়িয়ে লাভ নেই।

তবে ডেকার্স লেনের পাড়া ছেড়ে আসার ঠিক শেষ বছরে ঠিক ওখানে না হলেও রাস্তারও ওপারে গভর্নমেণ্ট প্লেসে দুর্গাপুজো শুরু হল। বারোয়ারি পাড়ার পুজো। সে বছর কী একটা অশান্তির জন্যে দেশে যাওয়া হয়নি। সেই পুজোতে আমি ছোটোখাটো কিছু কিছু কর্তব্য পাড়াবাসী হিসেবে পালন করেছিলাম। খুব সম্ভব ডেকার্স লেনের মাদ্রাজ হ্যাণ্ডলুমের একটা ছোটো আধপাতা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়েছিলাম সেই পুজোর সুভেনিরে।

সত্যি সত্যি পাড়ার পুজোয় জড়িয়ে পড়ি অনেক পর দক্ষিণ কলকাতায়

পণ্ডিতিয়ায় এসে। পুজোর প্রথম মিটিং থেকে শেষ মিটিং, চাঁদা তোলার রসিদ বই ছাপা থেকে হিসেব মেটানো পর্যন্ত সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি সে পুজোর পৃষ্ঠপোষক কিংবা উপদেষ্টামণ্ডলীর তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতে এখনো আমার নাম ছাপা হয়।

এই পুজোর মণ্ডপটি ছিল আমাদের একতলায় ফ্ল্যাটের সামনের তিন কোনাচে বসার ঘরের মুখোমুখি। জানলায় দাঁড়ালেই সামনাসামনি প্রতিমা দেখতে পেতাম।

আমাদের প্রিয় সারমেয়ী, তার নাম ছিল চিলি, একবার ঠিক ষষ্ঠীর দিন সকালে চিলির চারটে বাচ্চা হল। দুটো ছেলে, দুটো মেয়ে।

পঞ্চমীর গভীর রাতে মণ্ডপে প্রতিমা এসেছে। ঘুমের মধ্যে হইচই, বাজনা শুনে বুঝতে পেরেছি। সকালবেলা বাড়ির মধ্যে উঠোনের ধারে পরিত্যক্ত পুরনো রান্নাঘরে চিলির কোলে দুই ছেলে, দুই মেয়ে। আর তখনই জানলা দিয়ে দেখছি ষষ্ঠীর সকাল আলো করে মণ্ডপ জুড়ে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে দুর্গাঠাকরুণ এসেছেন।

একটা অধার্মিক, অশাস্ত্রীয় কাজ করে ফেললাম। আশা করি ধর্মপ্রাণ কেউ অপরাধ নেবেন না। চিলির পুরুষ বাচ্চা দুটোর নাম রাখলাম কার্তিক, গণেশ আর মহিলা বাচ্চা দুটোর নাম হল লক্ষ্মী, সরস্বতী সেই গণেশ এখনো প্রবল প্রতাপে আমাদের বাড়িতে রয়েছে। তার কম্বুকণ্ঠের গর্জনে পুরো পাড়া কাঁপে।

আর বেশি কথা নয়।

কলকাতার আকাশে আবার পেঁজা তুলোর মতো, বিশ্বস্ত সাদা ভেড়ার মতো হালকা মেঘেরা ফিরে এসেছে, আকাশে সেই সাবেকি নীল আভা, ময়দানের এদিক ওদিক দু চারটি কাশফুল ফুটে ওঠার চেষ্টা করছে, শহরতলির গৃহস্থ বাড়ির আনাচে কানাচে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর ঝরে পড়ছে পুরোনো দিনের শিউলি ফুল।

রঙিন বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে দৈনিক কাগজের ক্রোড়পত্র। রাস্তায়, ফুটপাথে, দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। ছুটির ঘণ্টা বাজছে, কলকাতা থেকে বাইরে ছুটছে মানুষ। বাইরে থেকে কলকাতায় ছুটছে আরো মানুষ।

একটু তুচ্ছ গল্প বলে শেষ করি।

সেই পণ্ডিতিয়া পাড়ার দুর্গাপুজোয় যেখানে অনেক বছর বারোয়ারি উৎসবে জড়িত ছিলাম, সেখানে গত বছরও একবার গিয়েছিলাম। পুরনো পাড়ার একটা

অন্তরের টান থাকে। তা ছাড়া পুরোনো পরিচিত দু-চারজন এখনো আছেন। আমার সঙ্গে তাঁদের কারো কারো এখনো যোগাযোগ আছে। আমি যাওয়ায় তাঁরা খুশিই হলেন।

ভালোই হচ্ছে পুজো। বেশ ধূমধাম করেই। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম, হঠাৎ একটা বাচ্চা ছেলে এসে আমার পাঞ্জাবির ঝুল ধরে টানতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'এই যে তারাপদবাবু, তারাপদবাবু।'

আমি বাচ্চাটিকে চিনতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ছেলেটি কোন্ বাড়ির?'

কেউ কিছু বলার আগে বাচ্চাটিই জবাব দিল, 'আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আপনার চলে যাওয়ার পরে হয়েছি।'

বাচ্চাটির কথা শুনে মজা পেলাম। সেই সাদা মেঘ, সেই নীল আকাশ, প্রতিমার মুখে সেই একই আদল।

এরই মধ্যে অমল ধবল পালে সময়ের তরী বয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ফিরে আসছে সেই পুরোনো শরৎকাল। নতুন কালের শিশু জন্মাচ্ছে, বড়ো হচ্ছে। আমাদের বয়েস বাড়ছে।

শরৎকালের পুরোনো দিনের কথা বড়ো বেশি মনে পড়ে।

টাকা মাটি, মাটি টাকা

কলকাতায় পাতাল রেল তৈরির কাজ যখন প্রথম শুরু হল সেই সত্যযুগে, আমাদের পুরোনো কালীঘাট পাড়ার এক ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মাথা খারাপের কারণ ছিল ঐ পাতাল রেল। পাতাল রেল চালু হতে তখনো ঢের বাকি, পাতাল রেলের মাটির খোঁড়া দেখেই তিনি বেসামাল হয়ে পড়েন। যতদূর মনে পড়ছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল যতীন কিংবা সতীন পাল। সে যাই হোক, পালমশায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দুবেলা দুবার করে চৌরঙ্গিতে গিয়ে পাতাল খোঁড়া দেখতেন। শুধু গর্ত আর গর্ত খোঁড়া হচ্ছে, রাস্তা থেকে বিপজ্জনকভাবে উঁকি দিয়ে পাতাল রেলের অতল গহ্বরের হদিস করতে গিয়ে আমাদের পালমশায়ের মাথা ঘুরে যেত। মাথার আর দোষ কী? এইভাবে মাথা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। তিনি পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হওয়ার একটা নিয়ম আছে। সব মানুষই পাগল হয় কোনো না কোনো কিছু উপলক্ষ করে, পরে অবশ্য পাগলামির বিষয়ের পরিধি বা ঘের ক্রমশ বাড়তে থাকে, কিন্তু প্রথম উপলক্ষটা খুব নির্দিষ্ট ধরনের হয়।

পালমশায়ের উপলক্ষটা হয়েছিল পাতাল রেলের মাটি। যন্ত্রচালিত কড়াইতে করে হাজার হাজার কিউবিক ফুট মাটি কলকাতার গর্ভ থেকে তুলে আনছে নতুন পৃথিবীর কারিগরেরা, কলকাতার ভূগর্ভ ট্রেনের কৌশলীরা। মাটি, শুধু মাটি। এসব দেখে অনেকেই সে সময় থতমত খেয়ে গিয়েছিল। একাধিক পত্রিকার খবরের কাগজে চিঠি দিয়েছিলেন, 'দু-হাজার সালের আগে কলকাতায় পাতাল রেল চালু হবে না, চালু হতে পারে না।' এক রাজনৈতিক ভাঁড় বলেছিলেন, 'সব মাটি করে দিল।' আরেক অসহায় আধুনিক কবি কিছুই বুঝতে না পেরে লিখেছিলেন,

'কলকাতার পেটে পেটে এত মাটি ছিল,
এতদিন কে জানত?'

পালমশায়ের সমস্যা অবশ্য আলাদা। চিরদিন পাগলদের সমস্যা একটু আলাদাই হয়। তাঁর মাথায় চিন্তা ঢুকেছিল এই এত মাটি, ঝুড়ি-ঝুড়ি, রাশি-রাশি, পাহাড়-পাহাড় মাটি, এত মাটি কোথায় রাখা হবে? ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা শুধু

পালমশায়ের নয়, এ সমস্যা সে সময়ে আমাদের প্রত্যেকের মাথায় ঢুকেছিল। এত মাটি কী হবে?

পালমশায় পাগল হয়ে গেলেন কিন্তু আমরা পাগল হইনি। কারণ পাগল হওয়া অত সহজ নয়। এই যে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পাতাল রেল হয়েছে, হুশ্ করে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে টালিগঞ্জ থেকে এসপ্ল্যানেড এবং কিছুকালের মধ্যেই একইরকম হুশ্ করে পৌঁছে যাওয়া যাবে বেলগাছিয়া, দমদম।

.......দম মারো দম।.........

শুধু হিন্দি সিনেমায় এমন সম্ভব ছিল। সেবার পালমশায়ের পাগলামো সারানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আমাদের কালীঘাট পাড়ায় এক নতুন ভাড়াটে আসেন, তুখোড় বুদ্ধি তাঁর। যতদূর মনে পড়ছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল যতীন কিংবা সতীন পালচৌধুরী। সে যাই হোক পালচৌধুরীমশায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পালমশায়ের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে গিয়ে পাতাল খোঁড়া দেখতে লাগলেন। অবশেষে একদিন পালচৌধুরীমশায় পালমশায়ের সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

খুব সহজ সমাধান।

পালচৌধুরীমশায় পালমশায়কে বললেন, 'জানেন, মাটি ব্যাপারটা কিছু নয়। জানেন, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বলেছেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।'

পালমশায় স্বীকার করলেন যে তিনি সেটা জানেন কিন্তু মাটি, এত মাটি। সারা শহর জুড়েই তো গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে, এত মাটি পাতাল কোম্পানি রাখবে কোথায়? পালচৌধুরীমশায় তখন পালমশায়কে বুঝিয়ে বললেন, 'আরে সেজন্যে আপনি চিন্তা করছেন কেন? আরেকটা করে বড়ো গর্ত এই লাইনের পাশেই খোঁড়া হবে। খুবই বড়ো গর্ত হবে সেটা, সেই গর্তের মধ্যে এই মাটিগুলো রাখা হবে।'

পালমশায় একথা শুনে সাময়িকভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তাঁর পাগলামিও হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু কয়েক দিন পরেই আবার প্রশ্ন তুললেন, 'কিন্তু ওই দ্বিতীয় গর্তের মাটিগুলো কোথায় রাখা হবে?'

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের জবাব পালমশায়কে পালচৌধুরীমশায় কিংবা অন্য কেউ দিতে পারেনি।

পালমশায়ের পাগলামি আর সারানো সম্ভব হয়নি। পরের দিকে তাঁর পাগলামি অবশ্য অন্যখাতে প্রবহমান হয়েছিল।

কালীঘাট পাড়া বহুদিন ছেড়ে চলে এসেছি, বহুদিন পালমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। জানি না এখন তিনি কেমন আছেন। বছর পাঁচেক আগে তাঁকে শেষবার দেখেছিলাম এসপ্ল্যানেডের চৌমাথায়। তখন পাতাল রেলের লাইন পাতা হয়ে

গেছে, গর্তগুলোর মধ্যে মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছে পাতাল রেলের সুড়ঙ্গ। হাজার হাজার পাওয়ারের ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রাতের বেলা কাজ হচ্ছে। সেই সময়ে দেখেছিলাম সেই কর্মযজ্ঞের একপাশে দাঁড়িয়ে পালমশায় চেঁচাচ্ছেন, 'দাদারা ভুল করবেন না। গর্তে মাটি চাপা দেওয়ার আগে সুড়ঙ্গের মধ্যে রেলগাড়িটা ঢুকিয়ে নিতে ভুলে যাবেন না।'

গল্পটা অতিবাস্তব হয়ে গেল। এবার পাতাল রেলের একটা অবাস্তব গল্প বলি। গল্পটা তেমন পুরোনো নয়, তবে আগে কোথাও বোধহয় বলেছি। পাতাল রেল চলতে আরম্ভ করার আগে এর দরজাগুলো নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যায়।

দরজা ঘেঁষে দাঁড়ানো বিপজ্জনক, এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা মাইকে সর্বদাই ঘোষিত হয়। কিন্তু ভবানীপুরের সনাতন মিস্ত্রি এ সব সতর্কবাণীর ধার ধারেন না। একদিন গাড়িতে উঠে ওই রকম দরজা ঘেঁষে দাঁড়াতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। সতর্কবাণী সত্ত্বেও সনাতন সরলেন না, অবশেষে দরজা চেপে আসতে যখন কোনো মতে সরতে গেলেন তাঁর একটা কান আটকে গেল দুই দরজার ভাঁজে, মুহূর্তের মধ্যে কানটা ছিঁড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে পড়ে গেল।

রক্তারক্তি কাণ্ড, হইচই, চেঁচামেচি। পাতাল রেল থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এই ভদ্রলাক ছুটে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে সনাতন মিস্ত্রির ছেঁড়া কানটা কুড়িয়ে আনলেন। সনাতন মিস্ত্রি সেই কানটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না এটা আমার কান নয়। অন্য কারও কান।'

সনাতন মিস্ত্রির কথা শুনে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। সনাতন মিস্ত্রি বুঝিয়ে বললেন, 'আমার কানে একটা লাল-নীল পেন্সিল গোঁজ ছিল। এটা সে কানে নেই।'

কৌতূহল

চিরদিনই আমার কৌতূহল কিঞ্চিৎ বেশি। সব কিছু জানার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা সব সময়ে আমাকে তাড়না করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিলিতি প্রবাদে এক বেড়ালের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তার কৌতূহল। এখন পর্যন্ত অবশ্য আমি সেরকম মৃত্যুঘন বিপদের মুখোমুখি হইনি, কিন্তু দুচারবার যে গভীর সংকটে পড়িনি তেমন নয়।

মনে আছে, অনেকদিন আগে কলকাতা চিড়িয়াখানায় জলহস্তী খন্দের পাশে জীবনে প্রথমবার জলহস্তী দেখার উত্তেজনায় এবং স্বাভাবিক কৌতূহল ডানদিকে দাঁড়ানো এক অপরিচিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দাদা এটা কি পুরুষ জলহস্তী, নাকি মেয়ে জলহস্তী?

উক্ত ভদ্রলোক আমার এই প্রশ্নে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্তবোধ করেন, আমাকে জবাব দেন, 'দেখুন একমাত্র একটি পুরুষ বা মেয়ে জলহস্তীই খোঁজ নিতে পারে, এই জলহস্তীটা মেয়ে না পুরুষ। আপনি মানুষ হয়ে এরকম খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

জলহস্তী থেকে অন্য জলজন্তুতে যাই। সেও এক কৌতূহলপ্রদ কাহিনী এবং বেশ পুরোনো। বিলিতি কার্টুনের বইতে ছবিটা দেখেছিলাম, একপাল নাবালক (এবং/অথবা নাবালিকা) অক্টোপাস তাদের মাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। সবাই মাকে প্রশ্ন করছে। 'মা তুমি আমাদের বলে দাও, এই আটটার মধ্যে কোন্‌গুলো আমাদের হাত আর কোন্‌গুলো আমাদের পা?'

কার্টুনের অপরিসর সীমানার মধ্যে এই মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, জানা যায়নি নব্য অক্টোপাসদের কৌতূহল তাদের মাতৃদেবী নিবারণ করতে পেরেছিলেন কিনা এবং সত্যি সত্যি তিনি নিজেই অবগত আছেন কিনা, কাকে হাত বলে আর কাকে পা বলে এবং তা যদি জানেন, তবে জানেন কিনা, কোন্‌গুলো তাঁর হাত আর কোন্‌গুলো তাঁর পা।'

বাংলা সিনেমার মহানায়ক এক পরমপ্রিয় চলচ্চিত্রের মোক্ষম দৃশ্যে মহানায়িকার এক হৃদয়ভেদী প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কারসহ কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, কৌতূহল থাকা ভালো। কিন্তু অত্যাধিক কৌতূহল ভালো নয়।

আমার উদ্ধৃতিতে সামান্য ভুল কিংবা হেরফের হয়ে থাকতে পারে, সেজন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে এই সূত্রে একটি করুণ কাহিনী মনে পড়ছে। এক সিনেমাগ্রস্ত

তরুণ বেকার একটি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। সেখানে তাকে যথারীতি প্রশ্নাদি করা হয়।

প্রথম প্রশ্ন ছিল, নাম। সে ভুরু কুঁচকিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে তার নামের প্রত্যেকটি অক্ষর আলাদা করে উচ্চারণ করে নিজের নাম ব্যক্ত করে। ইণ্টারভিউ-বোর্ডের প্রবীণ সদস্যরা এতে একটু বিস্মিত বোধ করেন কিন্তু বলাবাহুল্য এরকম ব্যাপারে তাঁরা মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু এর পরে যখন তরুণ কর্মপ্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হল, বাবার নাম, তরুণটি আর বসে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডের মাননীয় সদস্যদের মুখের দিকে একের পর এক কঠোর দৃষ্টিতে সে তাকাল, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'কৌতূহল থাকা ভালো, কিন্তু অত্যধিক কৌতূহল ভালো নয়।'

ফলে এই তরুণটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত চাকরি পায়নি। কিন্তু এর চেয়ে বেশি ক্ষতি তার হয়নি। অধিক কৌতূহলের ফলে এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল এক গ্রাম্য ব্যক্তির।

সেই গ্রাম্য ব্যক্তিটি কোথায় যে শুনেছিল, গোরুর দাঁত গুণে বয়েস নির্ধারণ করা যায়। এর যেন কী একটা হিসেব আছে, এত বয়েসে এত দাঁত তারপর এত বয়েসে এত ইত্যাদি স্থূল অংক।

আমাদের গ্রাম্য লোকটি রাস্তার ধারে একটা অচেনা গোরু দেখে ভাবে, এর বয়েসটা কত জানলে হয়, কৌতূহল নিবারণ করার জন্যে সে তৎক্ষণাৎ গোরুর মুখের মধ্যে হাত দিয়ে দেয় দেখার জন্যে যে গোরুটার ঠিক কয়টা দাঁত আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটা এক তরফা থাকেনি। অবলা গোরুটিরও হঠাৎ কৌতূহল হয়, যে লোকটা তার মুখে হঠাৎ হাত ঢোকালো তার হাতে কয়টা আঙ্গুল আছে সেটা জানার। ফল দাঁড়াল, একটি ভয়াবহ আর্ত চিৎকার, রক্তধারা এবং চারটি ছিন্ন অঙ্গুলি।

সবসময় রক্তপাত হবে এমন কথা নেই। কিন্তু অনেক সময়ের অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসা মর্মবেদনার কারণ হয়ে থাকে। বিলিতি গল্পে এক মেমসাহেবের কথা পড়েছি। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন না। তাই মেম সাহেব আর তাঁর বোন এক সঙ্গে থাকতেন। সেই বোনটিও দেখতে ভালো ছিলেন না।

একবার মেমসাহেবের কী একটা অসুখ হয়েছে, বাড়ির ডাক্তার কিছুতেই ধরতে পারছেন না। তখন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দিলেন যে একজন বিশেষজ্ঞ দেখালে হয়।

নিজের শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে সেই মেমসাহেব রাজি হলেন। কিন্তু

তাঁর খুব জানতে ইচ্ছে সত্যি সত্যি তাঁর কী হয়েছে। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে, যদি তাঁর কোনো খারাপ কিছু হয়ে থাকে তবে এই ডাক্তারেরা নিশ্চয় তাঁকে কিছু বলবে না। অথচ তাঁর ভীষণ কৌতূহল। (এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক) তাঁর ঠিক কতটা গুরুতর অসুখ হয়েছে, সেটা জানার।

সুতরাং মেমসাহেব তাঁর বোনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাক্রমে এক বুদ্ধি করলেন। ব্যাপারটা খুব সোজা, তাঁদের পারিবারিক ডাক্তার আর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যখন তাঁকে পরীক্ষা করে বাইরের ঘরে যাবে তখন বাইরের ঘরের পর্দার আড়ালে তাঁর বোন লুকিয়ে থাকবেন। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে আড়াল থেকে শুনবেন ডাক্তারেরা কী বলে।

যথা নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ডাক্তারদ্বয় মেমসাহেবের বাড়িতে এলেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তার পর তাঁরা বাথরুম থেকে সাবান দিয়ে হাতটাত ধুয়ে বাইরের ঘরে গেলেন।

তখন বাইরের ঘরে পর্দার পিছনে উৎকর্ণ এবং উৎকণ্ঠিত মেমসাহেবের বোন দিদির কী অসুখ সেটা জানার জন্যে অধীর প্রতিক্ষা করছেন, ডাক্তারেরা অবশ্য সেটা জানেন না।

ডাক্তার সাহেবেরা বাইরের ঘরে এলেন। তখন বাড়ির ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রোগিণীকে কেমন দেখলেন?' বিশেষজ্ঞ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রোগিণী আর কী দেখবো মশায়? কোনো মেয়েছেলে দেখতে এমন কুচ্ছিত হয়? এমন খারাপ দেখতে মহিলা আমি জীবনে দেখিনি।'

এবার গৃহচিকিৎসক বললেন, একে আর কি কুচ্ছিত দেখলেন? ওর বোনটাকে তো দেখেননি। আসল হাড় কুচ্ছিত হল সেটা, দিদির এককাঠি ওপরে।

পর্দার আড়ালে ধপাস করে শব্দ হল। কৌতূহলী দিদির কৌতূহলী বোন মূর্তি হয়ে পড়ে গেলেন।

রং

শিবরাম চক্রবর্তী একবার তাঁর এক গল্পে রং ফলানোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। শিব্রামীয় পানরীতির অমোঘ ব্যবহারে রং শব্দটি বাংলা ও ইংরেজি দুই দিক থেকে এসেছিল। বাংলা রং, মানে বর্ণ, রং ফলানো মানে সোজা কথায় বাড়িয়ে বলা আর ইংরেজি রং অর্থাৎ Wrong মানে ভুল।

ইংরেজি ব্যাপারে এবারে যাচ্ছি না শুধু হাতের কাছে এসে গেছে যখন ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে থাকি।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, অরভিল এবং উইলবার রাইট, প্রথম এরোপ্লেন চালিয়ে ছিলেন। এরোপ্লেন বিষয়ক এক খণ্ডকাব্যে বিখ্যাত রসিক কবি অগডেন ন্যাস লিখেছিলেন, 'টু রাইটস মেক এ রং', (Two rights make a wrong); ন্যাস সাহেব উচ্চারণের মিলের জন্যে একটুও বানানের তফাত মানেননি। রাইট নামের বানানের প্রথমে যে ডবলিউ আছে সেটাকে উপেক্ষা করেছেন। সে যাহোক, দুই রাইটে মিলে একটা রং বানিয়েছে, বিমান সম্পর্কে কবির এই তির্যক উক্তিটি চমৎকার।

বাংলা রঙের ব্যাপারে রসায়ন বিজ্ঞানী পরশুরাম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বোদ্ধা। তাঁর অসংখ্য গল্পে রঙের, বিশেষ করে গাত্রবর্ণের, তিনি অতুলনীয় বিশ্লেষণ করেছেন। ধুস্তরীমায়া অর্থাৎ দুই বুড়োর রূপকথা গল্পের নায়ক উদ্ধব পাল নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে রাজকুমারী স্পন্দচ্ছন্দাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'অত ফরসা কী করে হলেন?' রাজকুমারী যখন বললেন, যে তাঁর গায়ের-রং-ই ওই রকম, উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, 'ওগো চণ্ডপণ্ডা পদীরানি রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যবসা। তুমি এক কোট আস্তরের উপরে তিন কোট পেন্ট চড়িয়েছ—হবক্স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করছ, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন?'

তাঁর অন্য এক গল্পে পরশুরাম এক আত্মভিমানী বাঙালি কালো মেয়ের কথা লিখেছেন, যার আগে নাম ছিল শ্যামা। ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই বদলে তমিস্রা করে, কারণ তার কালো রং শ্যামবর্ণ বলে চালাতে চায় না।

এই সূত্রে আমার নিজের কথাও একটু বলি। আমার মা বলতেন আমার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু আসলে তা নয়। আমার কৃষ্ণ ত্বক মাতৃস্নেহের তারল্যে কিছুটা ঝকঝকে মনে হত স্বর্গতা জননীর দৃষ্টিতে। গায়ের রং নিয়ে এ

বয়েসে আমার আর দুঃখ নেই। বাঙালি পুরুষের গায়ের রং শুধু বিয়ের রাতে কন্যাপক্ষের মহিলামহলে সামান্য আলোচ্য-বিষয়। তবে দু একটা অসুবিধে আজো আছে। কলকাতায় নবাগত অনেক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক রাস্তাঘাটে আমাকে পেলে তামিল ভাষায় কথা বলে কিছু জানতে চান। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার বেশ দু চারবার হয়েছে।

আরেকটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিদেশ যেতে গিয়ে। আমাদের গরিব দেশের পাসপোর্টে চোখের বর্ণ চুলের বর্ণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয় কিন্তু সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ কোনো কোনো দেশে যেতে গেলে ভিসার দরখাস্তে গায়ের রং কী রকম তাও জানাতে হয়। আমার গায়ের রং কালো, অবশ্যই কালো কিন্তু আমি কৃষ্ণাঙ্গ নই, ব্ল্যাক বলতে যা বোঝায় আমি সে জাতের নই। আমি সাদা বা কালো নই, আমি ভারতীয় কিংবা বড়োজোর বাঙালি। কিন্তু গাঁয়ের রং তো ইণ্ডিয়ান বা বেঙ্গলি লেখা যাবে না। উদ্ধার করেছিলেন ভিসা অফিসার নিজেই, ফর্মের ওই জায়গাটা ফাঁকা রেখেছিলাম, তিনি নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন 'হুইটিস' মানে গমের মতো। সেই থেকে নিজের গায়ের রং সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেছে, যখনই কোথাও লালচে গমের দানা চোখে পড়ে নিজের গায়ের চামড়ার দিকে তাকাই, সেই সাহেব ভিসা-অফিসারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে।

গায়ের রং মোটামুটি পাকা ব্যাপার। সাহেব মেমরা অনেক সময় সমুদ্রতীরে যান গায়ের চামড়া রোদে পুড়িয়ে ট্যান করার জন্যে কিন্তু জনপদে ফিরে এসে তাঁরা আবার তাঁদের দুঃখের শ্বেতবর্ণ ফিরে পান। আমাদের কালো রঙ অনেক সময় অসুখ-বিসুখে, রোদ্দুরে ঘুরে, রাত জেগে বা অন্য কোনো কারণে আরো কালো হয়ে যায়, চেনাশোনা লোক পথেঘাটে দেখা হলে বলে, 'কী হল এত কালো হলে কী করে?' পার্থক্যটা অবশ্য ভূত-চতুর্দশীর অন্ধকার আর শ্যামাপুজোর অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও কম, তবু পরিচিত চোখে ধরা পড়ে। এদিকে গ্রামের লোক কলকাতার এলে কলকাতার কলের জলে তাদের গায়ের রং চিকেশাভাব ধারণ করে, মাজা রঙের মেয়ে গৌরাঙ্গী হয়ে ওঠে। আবার গ্রামে ফিরে গেলে কয়েকদিনের মধ্যে যে-কে সেই।

হকার্স কর্ণারে দেখেছি রং উঠে যাওয়া সদ্য কাচা নতুন শাড়ি হাতে স্থূলাঙ্গিনী মহিলা চেঁচাচ্ছেন, 'আপনি বলেছিলেন না পাকা রং, এই আপনার পাকা রং?' প্রিণ্টেড শাড়ির লাল ফুল, নীল পাতা, সবুজ পাখি—রং মেখে প্রায় একাকার হয়ে গেছে, সেই শাড়িটা দোকানদারের মুখের সামনে মেলে ধরেছেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু দোকানদার নির্বিকার। শুধু নির্বিকার নন, পাশের তাক থেকে আবার প্রিণ্টেড

শাড়ি নামাচ্ছেন আর বলছেন, 'মাসিমা, যা হবার হয়েছে, এবার এই রামপুরের প্রিন্ট নিয়ে যান, এবার সত্যিই পাকা জিনিস দিচ্ছি।'

এর চেয়েও মারাত্মক গল্পের সেই দোকানদার। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সে নাকি উল্টো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রংটা উঠে কী হল?' কেনা-দিদি জবাব দিয়েছিলেন, 'উঠে গিয়ে লাগল অন্য কাপড়ে।' দোকানদার এবার আশ্বস্ত হলেন, 'ও তা হলে এক সঙ্গে কেচেছিলেন। বাকি কাপড়গুলো কী রং ছিল?' কেনা-দিদি, এই প্রশ্নে খেপে গেলেন, 'আপনার চাদরের নীল রং লেগে গেছে সাদা তোয়ালেতে, বিছানার চাদরে, কর্তার গেঞ্জিতে, ছেলের পাজামায়।' এবার দোকানদার স্মিত হেসে বললেন, 'কেনা-দিদি, এবার দেখবেন রংটা কত পাকা। ওই তোয়ালে চাদর, পাজামা থেকে জন্মেও ওই নীল রং উঠবে না। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সেদ্ধ করলেও না।'

এ গল্প বানানো গল্প, কিন্তু যে কোনো মহৎ সাহিত্যের মতো এর বিষয়বস্তু সত্যি; পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন কেউ কী আছেন যাঁর সাদা কাপড়ে কখনো পাকা দাগ পড়েনি অন্য কোনো কাপড়ের কাঁচা রঙের? এবং সে রং আর ওঠেনি।

কাঁচা রঙের ব্যাপারটা আরো একটু পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারে আমার নিজেরই একটি ঘটনায়। আমার পরমারাধ্য পত্নীঠাকুরানি একবার আমাকে একটি কলকাপেড়ে সাদা শাড়ি কিনে আনতে বলেছিলেন। এসব কঠিন কাজ সাধারণত তিনি নিজেই করেন, কিন্তু বোধহয় এই অসামান্য জিনিসটা বাজারে পাননি। আমিও পেলাম না, কিন্তু শততম একাদশ বিপণিতে এক বিক্রেতা একটি আশ্চর্য কথা বললেন, 'ফিকে নীল অথবা ফিকে হলদে রঙের কলকাপাড়ের শাড়ি নিয়ে যান স্যার। এক ধোপেই সাদা হয়ে যাবে।'

রঙের গল্প শেষ করার আগে আরো একটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার আছে।

কিছুদিন আগে এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের পোষা মেনি বিড়াল গান্ধারী তিনটে বাচ্চা দিয়েছিল। গান্ধারী নিজে আগাগোড়া সাদা আর বাচ্চা তিনটে হয়েছে চমৎকার সাদাকালো। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক পুরো এক রিল ছবি তুললেন আমাদের বাড়িতে। ফোটোগুলো ডেভেলপ করে আর প্রিন্ট করে এক ছুটির দিনে নিয়ে এলেন। চমৎকার ঝকঝকে সব ছবি উঠেছে বিড়ালছানা ও তাদের মা সমেত বাড়ির সকলের। তবে অর্ধেকের বেশি ছবিই বেড়াল ছানাদের।

ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক রঙিন ছবি তুলেছিলেন এবং রঙিন ছবির খরচটাই আমার কাছে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে অর্ধেক টাকা দিয়েছিলাম। সাদাকালো

বেড়ালছানার রঙিন ফটো দিয়ে কী হবে, যদি তিনি তুলে থাকেন সেটা তাঁর বোকামি। তার মাশুল আমি দেব কেন? সেই ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক আর আমাদের বাড়িতে আসেন না। এখন মনে হচ্ছে পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেই হত।

রং সম্পর্কে শেষ কথা বলেছিলেন এক অনিদ্রা রোগী। নানা রকম ঘুমের ট্যাবলেট তাঁর মাথার কাছে সাজানো। একটা দুটো বড়িতে তাঁর ঘুম আসে না, অন্তত তিন চারটে লাগে। বিভিন্ন ট্যাবলেট বিভিন্ন আকারের সাদা-কালো হলদে ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের।

একই হোটেলে আমার পাশের বেডে ছিলেন ভদ্রলোক। দেখলাম একেক রঙের একটা করে ট্যাবলেট নিয়ে তিনি চার রকম ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়ে খেয়ে ফেলছেন। আমি বললাম, 'এটা কী করলেন?' অনিদ্রা রোগী মৃদু হেসে বললেন, 'নানা রঙের ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে খাই রঙিন স্বপ্ন দেখব বলে।'

অভিনয় নয়

কলকাতা নামক এই ধূসর মরুভূমিতে একটি মধ্যসাপ্তাহিক মরূদ্যান আছে; যেখানে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় বিদগ্ধ পুরুষ এবং সুন্দরী রমণীরা সমবেত হন। সেখানে সোনালি পানীয় এবং মেজাজি আড্ডা এবং কখনো কখনো চূড়ান্ত সুখাদ্য আমার এবং অনেকের জন্যে অপেক্ষা করে। সরাসরি বলা উচিত ওই সান্ধ্য আসরে আমার অবারিত দ্বার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই সুস্থলে আমি কদাচিৎ যাই। গেলে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু যাওয়া হয় না। তার একটাই কারণ, অভিনয়। অভিনয়ের ব্যাপারে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয়, গায়ে জ্বর আসে।

হয়তো আমার মঞ্চ-কাঁপানো কণ্ঠস্বরে অথবা ভাঁড়োপম স্থূল অবয়ব আমার অবচেতন মনে অভিনয় সম্পর্কে একটা অতিশীতল অনীহা রচনা করেছে। অথচ সেখানে গেলেই দেখতে পাই আমার বিখ্যাত বন্ধুরা দিনের সমস্ত ক্লান্তি হাতে ঠেলে দিয়ে সায়াহ্নের পর সায়াহ্ন কেমন সাবলীলভাবে মহড়া দিয়ে চলেছেন। বিখ্যাত লেখক যাঁর কলম ছুরির মত ধারালো, মৃত্যুঞ্জয়ী সার্জন যাঁর ছুরি মাখনের মতো মসৃণ, রূপসী বন্ধুপত্নী যাঁর হাসি জন্মজন্মান্তের অনুরাগ বিধুর, প্রবীণ সম্পাদক যাঁর প্রতিষ্ঠা প্রবাদপ্রতিম তাঁরা কত অনায়াসে, কত আয়াসে নাটকের মুখস্থ পার্টে গলা জোগাচ্ছেন।

যে গান ভালোবাসে না সে খুন করতে পারে। যে অভিনয় ভালোবাসে না সেও খুন করতে পারে। কিন্তু আমি অভিনয় ভালোবাসি না, তা তো নয়। আসলে আমি এখনো একটু চঞ্চল, একটু পরিহাস প্রিয়, বাক্‌বিলাসী; আমার পক্ষে অসম্ভব স্থির হয়ে বসে অন্যদের কথাবার্তা শোনা, বিশেষ করে সে যদি হয় মুখস্থ পার্ট এবং আগেও একবার শোনা হয়ে গিয়ে থাকে।

স্বীকার করি অভিনয় সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। উল্টোদিক দিয়ে ব্যাপারটায় ঘুরে আসছি।

এ গল্পটা অবশ্য আগেও একাধিকবার অন্য সূত্রে বলেছি, তবে আমার অভিনয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ হিসেবে এত ভালো যে না বলা ঠিক হবে না।

জীবনে মাত্র একবার আমি একটা থিয়েটারে পার্ট পেয়েছিলাম। ঠিক পার্ট বলা উচিত হবে না, কারণ আমার ভুবনবিখ্যাত কণ্ঠ ব্যবহার করার কোনো সুযোগ

ছিল না। নাটকের একেবারে প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠতেই, বিছানায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী নায়কের বৃদ্ধ পিতার ভূমিকা ছিল আমার, একবার আর্তকণ্ঠে 'ওঃ, ওঃ' বলে আমার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া এবং সেখানেই নাটকের শুরু।

কিন্তু এই সামান্য পার্টেও পরিচালক আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। মহড়ার সময় যতবার, 'ওঃ ওঃ' করে মারা যাই, পরিচালক বলেন মরার পরে ও রকম শক্ত হয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবেন না, মৃত্যুর দৃশ্য হলে কী হবে নাটকে সব কিছুর মধ্যেই লাইফ আনতে হয়, একটু লাইফ আনুন। বলা বাহুল্য মৃত্যুর মধ্যে কী করে জীবনসঞ্চার করতে হয় অদ্যাবধি সে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধগম্য হয়নি।

মিথ্যাভাষণের অপবাদ এড়ানোর জন্যে এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি। এই মৃত পিতার ভূমিকার পূর্বেও আমার কৈশোরে একবার আমার মঞ্চে উঠবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার অবশ্য আমার কিছুই করতে হয়নি। একলব্য নাটক, আমাকে দেয়া হয়েছিল গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তির ভূমিকা, রক্তমাংসের দ্রোণাচার্যের পার্ট করেছিল অন্য একজন। আমাকে মূর্তি হয়ে নিশ্চুপ, নিশ্চল বসে থাকতে হল, আমাকে সামনে রেখে একলব্য অস্ত্রশিক্ষা করল। মফস্বল শহরের আমবাগানে মশকবহুল সন্ধ্যায় প্রায় পনেরো মিনিটের সেই দৃশ্যে নট নড়নচড়ন স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকা, সে স্মৃতিও আমার খুব মধুর নয়। সে বড়ো সুখের সময় নয়।

আমি জানি, আমার এই দুঃখময় অভিনয় জীবনের কথা পাঠ করে কোমলতমা পাঠিকার নয়নকোলেও একবিন্দু অশ্রু সঞ্চারিত হবে না। আমি এও জানি, বরং তিনি এখন ঠোঁট টিপে হাসছেন, এবং সেটাই আমার নিয়তি। সুতরাং হাসির কথাই বলি।

এক বেদনাঘন, বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা এক সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি করুণ, হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করেছিলেন। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই করুণ রসের শুরু, আর সেই দৃশ্যে যাকে দর্শকের ভাষায় ফাটিয়ে দেওয়া বলে, তাই করলেন নায়িকা। সিন পড়ে যাওয়ার পর উইংসের অভ্যন্তরে নায়িকাকে অভিনন্দন জানালেন পরিচালক, 'এমন জীবন্ত,এমন প্যাথেটিক পার্ট এমন সুন্দর করেছেন আজকে, ভাবাই যায় না। দর্শকরা কোনোদিন এই দৃশ্যে এত হাততালি দেয়নি।'

নায়িকা শুকনো গলায় ডান পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে খুলতে বললেন, 'এই চটিটার একটা পেরেক উঠে রয়েছে, সেটাই পায়ে ফুটে আমার চোখ দিয়ে জল বার করে দিচ্ছে। সাধে কী আর পার্ট এত করুণ হচ্ছে।'

এই কথা শুনে পরিচালক যেন হাতে চাঁদ পেলেন, তাড়াতাড়ি নায়িকাকে বললেন, 'ম্যাডাম, এখন চপ্পলটা খুলবেন না।' দয়া করে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত পায়ে দিয়ে থাকুন। আর এর পর থেকে প্রত্যেক শোতেই পেরেক ওঠা অবস্থায় পায়ে দিয়ে আসবেন। এই পেরেক আপনার জীবনে আর বাংলার অভিনয়ের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দেবে।'

আরেকটা মজার কাহিনী মনে আসছে। এক পেশাদারি নাটকের মঞ্চসফল নায়ক প্রযোজক মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলেন, 'স্যার, ওই ক্যাবারে নাচের সিনে যদি আপনি গেলাসে লাল রঙের সরবত না দিয়ে সত্যি মদ খেতে দেন তাহলে অভিনয়টা আরো প্রাণবন্ত, আরো জমজমাট করতে পারি।'

প্রযোজক মহোদয় ব্যাণ্ডেল লোকালে চানাচুর বিক্রি করে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তারপর বহু ঘাটা-আঘাটা, নালা, খাল, বিল পার হয়ে হাতিবাগানের ঘাটে নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন। এ ধরনের বাজে অনুরোধকে ঠাণ্ডা করতে তাঁর নিঃশব্দ পাথরপ্রতিম চাহনি, ইনডাস্ট্রির আপামরের ভাষায় সাপের চাউনি, যথেষ্টের চেয়েও বেশি। কিন্তু নায়ক তো ফেলনা নয়। শিশির ভাদুড়ি কিংবা নির্মলেন্দু লাহিড়ি না হতে পারে কিন্তু ভদ্রলোকের বক্স অফিস খুব খারাপ নয়; প্রযোজক মহোদয় কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, শেষ দৃশ্যে বিষপানের দৃশ্য আছে, আপনি যেখানে আত্মহত্যা করছেন। সেই দৃশ্যে আপনার গেলাসে খাঁটি বিষ দেব তো?'

এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। উত্তর নেই এইরকম আরো অনন্ত প্রশ্নের। কিছুদিন আগে দূরদর্শনে কয়েক রবিবার সকালে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র প্রাঞ্জল এবং সরসভাবে অভিনয়ের ব্যাপারটা নতুন যুগের নাট্যোৎসাহীদের ব্যাখ্যা করলেন। সেখানে তিনি প্রথমেই বললেন, সব মানুষই অভিনয় করে, অভিনয় করতেই হয় মানুষকে। বাড়িতে হয়তো কেউ এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না, বিরক্ত হচ্ছি, কিন্তু তবু তাঁকে বলছি, 'এখনই চলে যাচ্ছেন? আরেকটু বসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।'

সেক্সপীয়রের মতে, জীবনে এ রকম অভিনয় আমাদের সব সময়েই করে যেতে হচ্ছে।

সেক্সপীয়র সাহেব আরো বহু কথা জন্মমৃত্যু, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ মানুষের সব কিছু নিয়ে সব রকম কথা বলে গিয়েছেন। এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছোটো ছেলেকে নিয়ে সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে?' ছেলে গম্ভীর মুখ করে বলল,

'ভালোই, তবে বইটা একেবারে কোটেশনে ভর্তি।' আরেকটি ছেলেকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'সেক্সপীয়র কে?' সে অম্লানবদনে বলেছিল, 'ঐ যে লোকটা আমাদের স্কুলের বার্ষিক উৎসবের নাটক লেখে।'

অভিনয় সংক্রান্ত এই এলেবেলে নিবন্ধ মহাকবি সেক্সপীয়রকে দিয়ে সমাপ্ত করতে পারলেই ভালো হত। কিন্তু আমার স্বভাব মন্দ; একটা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বাজে ঘটনা মনে পড়ছে। এক মূকাভিনেতার বাড়ির সামনে দিয়ে বছর কয়েক আগে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে যেতাম। মাঝেমধ্যেই তাঁর বাড়ির দরজায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত। সেই মূকাভিনেতার বন্ধু ছিলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। মুকাভিনেতার সঙ্গে দেখা হলেই আমি প্রশ্ন করতাম, 'আচ্ছা অমুক আপনার এত বন্ধু, আর আকাশবাণীতে আপনাকে একটা চান্স দেয় না।' মূকাভিনেতা ভদ্রলোক করজোড়ে বলতেন, 'দেখুন, আমি করি মূকাভিনয়, রেডিয়োতে আমার কী প্রোগ্রাম দেবে?' আমিও নাছোড়বান্দা, দেখা হলেই ওই একই প্রশ্ন করতাম। মূকাভিনেতা ভদ্রলোক শেষে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমাকে দেখলেই মূকাভিনয় করতেন।

শিশু কাহিনী

শিশু কাহিনী সহজে ফুরোবার নয় অন্য সব উল্টোপাল্টা লেখার চেয়ে এ অবশ্য অনেক সরল ব্যাপার।

সর্বত্রই শিশু খুব সহজলভ্য। কিন্তু তাদের সব থেকে বেশি ঝোঁক সভাসমিতির প্রতি। গ্রামগঞ্জে মফস্বলে, এমন কী কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যেখানেই কোনো অনুষ্ঠান, জলসা হতে পারে কিংবা পরিবার পরিকল্পনার সরকারি প্রচার জমায়েত হতে পারে। মাইক প্যাণ্ডেল মঞ্চ এসব থাকলেই ঝাঁকে ঝাঁকে শিশু এসে যাবে ঠেকানো যাবে না।

তাই অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা ঠিক মঞ্চের সামনে কয়েক হাত জায়গা শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট করে ফরাস পেতে রাখেন, বালখিল্যদের জন্য ঢালাও বন্দোবস্ত।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি এমন অনেক সভা দেখেছি, যেখানে বয়স্ক শ্রোতার সংখ্যা বড়োজোর দশ-পনেরো। তাঁরা দুই সারির কাঠের চেয়ারে ইতস্তত অবিন্যস্তভাবে বসে আছেন আর তাঁদের ঠিক সামনেই ফরাসের ওপরে শ-আড়াই শিশু খলবল করছে।

আমার এক সুরসিক, বক্তৃতাবাজ বন্ধু যখন কোনো সভায় যেতেন বলতেন যাই, শিশু পাল বন্ধ করে আসি।

এ শিশুপাল মহাভারতের চরিত্র নয়, এ হল শিশুর পাল, শিশু পাল। ষষ্ঠী তৎপুরুষ। যারা সভামঞ্চের সামনে ফরাসে বসে থাকে।

শিশুদের বিষয়ে দু একটা পুরোনো গল্প মনে পড়েছে।

কাণ্ডজ্ঞানে এক যুগ আগে দুটি শিশুর কথা বলেছিলাম। বলাবাহুল্য তারা আর শিশুটি নেই। দুজনেই এখন সরকারি হিসেবে প্রাপ্তবয়স্ক। গত নির্বাচনে সাতসকালে গিয়ে পরমোৎসাহে ভোট দিয়ে এসেছে। এবং তারা এখন এতই সাবালক, যে কাকে কিংবা কোন দলকে ভোট দিয়েছে, সে কথা ফাঁস করেনি। কিন্তু প্রশ্ন করলে মিটিমিটি হেসেছে।

এরমধ্যে প্রথমজন ছিল প্রকৃত বিচ্ছু। তখন তার চার পাঁচ বছর বয়স। তাদের বাড়িতে একদিন সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে গেছি, শিশুটির বাবার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছি, এমন সময় সে ঘরে প্রবেশ করল, আর আমাকে দেখেই বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে একটা বাটি নিয়ে এল।

তারপর হাতের বাটিটা আমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল এটা কি? আমি সরলভাবে

বললাম বাটি। শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল তোর বৌয়ের সঙ্গে সাঁতার কাটি। ক্ষুদ্র শিশুটির এই দূরাভিলাষ দেখে সেদিন চমৎকৃত হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় শিশুটি অবশ্য এতটা গোলমেলে ছিল না। তার একটা বাঁধা গত ছিল। তাদের বাড়িতে কোনো অবিবাহিত বা অবিবাহিতা ছেলেমেয়ে এলে সে প্রশ্ন করত (বি এ টি এ) বানান কি? যেই উত্তর আসত বি এ টি এ। সে বলত, তুমি বিয়েটিয়ে কিছু করবে না?

পুনশ্চঃ এক দুরন্ত শিশুর পিতৃদেবকে তার এক প্রতিবেশী সেই শিশুর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। নালিশের বিষয়বস্তু হল 'আপনার ছেলেটি আজ দুপুরে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের সামনের বারান্দায় কাচের জানলা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।'

একথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত পিতৃদেব জানতে চাইলেন আপনার জানলার কাচ ভেঙেছে কি?

প্রতিবেশী বললেন, না ভাঙেনি। ভাঙতে পারেনি।

পিতৃদেব একথা শুনে নিশ্চিন্তভাবে বললেন, মনে হচ্ছে আপনি ভুল করছেন। আমার ছেলে কিছুতেই ঢিল ছোড়েনি, সে ঢিল ছুঁড়লে আপনার জানলার কাচ ভাঙতই ভাঙত।

শিশুদের নিয়ে আরো কয়েকটা গল্প হাতের কাছে রয়েছে। পরে কোথায় হারিয়ে ফেলব। তার থেকে লিখে রাখি।

শিশুরা কী জন্য যে কী চায়, সেটা সব সময়ে জানা যায় না। তারা ঠাকুর্দার মোটা কাচের চশমা নিয়ে রোদ্দুরে আতস কাচের মতো ধরে শুকনো ঘাসে কিংবা ছেঁড়া কাগজে আগুন ধরানোর চেষ্টা করে। ফলে সে ঠাকুরদার কাছে যখন তাঁর চশমাটা অল্পক্ষণের জন্য চায় সে বৃদ্ধ বুঝতে পারেন না ওই হাই পাওয়ারের চশমা ওইটুকু শিশুর কী কাজে লাগবে।

একটি শিশু যখন গামছা চায়, ধরে নেওয়া যায় সে স্নান করার জন্য গামছা চাইছে না। সে বাড়ির সামনে সদ্য জমা হাঁটু জলে ওই গামছা দিয়ে জালের মতো করে মাছ ধরবে, তা সে জলে মাঝ থাকুক বা না থাকুক।

শিশুরা পেনসিল কাটার ছুরি চায় পেনসিল কাটার জন্য নয়। বাড়ির দরজা জানলা অথবা স্কুলের বেঞ্চের কাঠ কেটে নিজের নাম খোদাই করবে বলে।

তালিকা বিস্তৃত করে লাভ নেই। এবার আমি যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি সেটি খুবই বিপজ্জনক।

সন্ধেবেলা। লোডশেডিং চলছে। শোবার ঘরে একটি বালক মোমবাতি জ্বালিয়ে স্কুলের পড়া করছে। তার মা রান্না ঘরে রান্না করছেন।

হঠাৎ বালকটি রান্না ঘরে ছুটে এল মা তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল দাও। মা জল দিলেন ছেলেটি জল নিয়ে শোবার ঘরে ছুটল। তারপর এক মিনিট পরে বালকটি আবার ছুটে এল, মা আরেক গ্লাস জল দাও।

আবার বালকটি জল নিয়ে ছুটে গেল। তারপর আবার জল চাইতে এল। চারবারের বার মা জিজ্ঞাসা করলেন, পড়াশুনা না করে এত জল দিয়ে কি করছ? বালকটি বলল, কি করব? মোমবাতিটা উল্টে গিয়ে বিছানায় আগুন ধরে গেছে কিছুতেই নিবছে না।

এই বালকটি খুবই সরল, এবার ধূর্ত বালকের কাহিনী বলি।

এই ধূর্তটিকে মাস্টারমশাইরা সবাই ভালো করে চেনেন। তাদের সব ক্লাসেই এ রকম বালক বা বালিকা দুএকটি সব সময়েই থাকে।

মাস্টারমশাই ক্লাসে বাক্যরচনার পাঠ নিচ্ছেন। বাক্যরচনার ক্লাসে অনেক রকম মজার ব্যাপার ঘটে। হয়তো কোনো ছাত্র বাক্যরচনা করল, কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটি তুলসীবনের বাঘ আছে। আরেকজন করল সুখের পায়রার মাংস অতি সুস্বাদু। এমন কী এও দেখা গেছে যে, 'বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি দুজনেই বিধবা।

এ সবের মধ্যে যথেষ্টই হাসির ব্যাপার আছে। কিন্তু যে গল্পটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় দিয়ে বাক্যরচনা করতে দেওয়া হয়েছিল, সে যা করেছিল সেটা তার ধূর্ততার নিদর্শন। সে অনেক ভেবেচিন্তে লিখেছিল 'শিক্ষক মহাশয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটি দিয়ে বাক্যরচনা করতে দিয়েছেন।'

এই বাক্যরচনার জন্য ধূর্ত বালকটি কী নম্বর পাবে শুধু মাস্টারমশাই ঈশ্বর বলতে পারবেন।

শিশুদের নিয়ে অনেক হল। এবার শেষ করি যমজ শিশু দিয়ে। দুই যমজ ভাই। বছর পাঁচেক বয়স। তাদের বাড়িতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। বাইরের ঘরে দুজনে খেলছে, তাদের ভদ্রলোক বললেন এই যে খোকারা, তোমাদের মা বাবা কোথায়?

ভাইদের মধ্যে একজন উত্তর দিল। আমার মা রান্নাঘরে রান্না করছে আর ওর বাবা শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে।

ভদ্রলোক তাজ্জব হয়ে গেলেন। দুই যমজ ভাই নিজেদের মধ্যে মা বাবা ভাগাভাগি করে নিয়েছে! একজনের ভাগে বাবা, একজনের ভাগে মা।

ভুলের মাশুল

এক সাহেব বুদ্ধিজীবি বলেছিলেন, 'অভিজ্ঞতা হল সেই জিনিস, একই ভুল দুবার করলে যখন আমরা ধরতে পারি যে এ ভুলটা আগেও একবার করেছিলাম।'

তিনি আরো বলেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে মানবজন্মে ভুল না করে উপায় নেই। যে মানুষ ভুল করে না সে কিছু করেও না, এবং সেটাই একটা বড় ভুল।

কথাগুলো একটু যেন জটিল হয়ে গেল। লঘু নিবন্ধের গোড়াতেই জটিলতা এনে আমি নিজেই বেশ ভালো একটা ভুল করে ফেললাম।

ভুলের বিষয়ে এ যাবৎ আমি অনেক কিছুই উল্টোপাল্টা লিখেছি। এতসব হাবিজাবি অখাদ্য লেখার পর এখন আর কিছুতেই মনে থাকে না, খেয়াল করতে পারি না কোন্ গল্পটা আগে লিখেছি, কোন্‌টা মোটেই লিখিনি।

পরমা মান্যবতী সুবুদ্ধি পাঠিকা মহোদয়া, আমি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এইবার আপনি টিপটিপ কিংবা মিটমিট করে হাসছেন, অর্থাৎ আপনি ধরে ফেলেছেন আমার উদ্দেশ্য এবং বিধেয়।

অর্থাৎ দুয়েকটা পুরোনো গল্প ভুল করে 'ভুলের মাশুল' নিবন্ধে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেব। এই রকম আপনি ভাবছেন।

না। তা করব না।

একই গল্প বার বার লিখে লিখে লেখায় ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কিন্তু প্রত্যেকবার নতুন গল্পই বা কোথায় পাব?

ভুলের একটা গল্প আছে সেটা মোটেই নতুন নয়, গল্পও নয়, একেবারে খাঁটি সত্য কাহিনী। এবং আগেও লিখিনি।

আমার একটা পুরোনো হাতঘড়ি আছে (কিংবা ছিল, এখন আর নেই)। ঘড়িটা আজকাল তেমন ভালো চলে না, অনেক সময় এগিয়ে যায়, অনেক সময় পিছিয়ে যায়, তার চেয়েও খারাপ, অধিকাংশ সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নট নড়ন চড়ন নট ফট।

ঘড়িটা আমার পৈতের সময় আমার দিদিমা দিয়েছিলেন। সে অনেককাল আগের কথা। এতদিন পরে সেসব কথা থাক। শুধু একটা কথা লিখে রাখি, আমার এই কাঠখোট্টা জীবনে বিশেষ যে সামান্য কয়েকটি দুর্বলতা অবশিষ্ট আছে

এখনো, তার মধ্যে ওই প্রাচীন হাতঘড়িটির প্রতি দুর্বলতা একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে।

যখন ঘড়িটা কম বেশি হয়, আমি ঠিকঠাক মানিয়ে নিই। উপযুক্ত মতো কম বেশি মিলিয়ে নিই। যখন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়, আমি হাতে নিয়ে জোরে জোরে ঝাঁকি দিই, আবার চলা শুরু করে।

একেক দিন শুধু ঝাঁকি দিলে হয় না, একটি বৈদান্তিক মন্ত্র আছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি, ঘড়িটার বেল্ট ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এই মন্ত্রটা বার বার আওড়াতে হয়, অবশেষে ঘড়িটায় প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসে, আবার টিকটিকানি শুরু হয়।

সেদিন কিছুতেই ঘড়িটায় দম ফিরে আসছিল না, বহুক্ষণ ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে চরৈবেতি চরৈবেতি করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ হাত ফসকিয়ে ঘড়িটা মেঝেতে পড়ে গেল। তারপরে যখন আর কিছুতেই চালু হল না, বাজারের ঘড়িওয়ালার কাছে ঘড়িটাকে সারাতে নিয়ে গেলাম।

ঘড়িওয়ালাকে বললাম, 'দেখুন ভুল করে ঘড়িটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।

ঘড়িওলা ঘড়িটা খুলে দেখে আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন, 'ঘড়িটাকে হাত থেকে ফেলে দেওয়ার ভুল কিছু হয়নি। বরং তারপর আবার তুলে আনাই ভুল হয়েছে।'

শুধু এই নয়, আমার নিজের জীবনে আরো বহুরকম ভুল আছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লাভ নেই।

বরং তার থেকে একটি মর্মান্তিক ভুলের কাহিনী বলি।

বড়োবাজারের এক ব্যবসায়ীর গদিতে এক কর্মচারী নতুন নিযুক্ত হয়েছেন। দুঃখের কথা, এই কর্মচারী কাজে যোগ দেওয়ার দুয়েক দিনের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ওই ব্যবসায়ী গদির ভিতরে তাঁর মানিব্যাগটি হারিয়ে ফেললেন। ব্যবসায়ীর অভ্যাস ছিল গদিতে বসে পকেট থেকে বার করে সামনের ক্যাশবাক্সের একপাশে মানিব্যাগটি রাখতেন।

কিন্তু সেদিন হল কী বিকেলের দিকে ব্যবসায়ীটি দেখলেন মানিব্যাগটি যথাস্থানে নেই। স্বভাবতই সন্দেহ গিয়ে পড়ল নতুন কর্মচারীটির ওপরে। এতদিন কখনো মানিব্যাগ চুরি যায়নি, আজ যখন চুরি গেছে—নতুন লোকটিই নিয়েছে, তাকেই ধরা হল।

সেই হতভাগা কর্মচারীকে প্রচুর জেরা করা হল, এমন কী সার্চ পর্যন্ত করা হল কিন্তু মানিব্যাগটির কোনো হদিস মিলল না। অবশেষে যখন মালিক ঠিক করলেন যে ওই নবনিযুক্ত কর্মীটিকে পুলিসের হাতে তুলে দেবেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাড়ি থেকে ফোন এল এবং তাঁর স্ত্রী জানালেন যে তিনি আজ ভুল করে তাঁর

মানিব্যাগটা শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ফেলে এসেছেন। ভদ্রমহিলা আরো বললেন যে, অনেকক্ষণ ধরেই তিনি এ কথাটা জানানোর জন্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফোনে লাইন পাননি।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কঠোর হলেও অমানুষ নন, এই ফোন পাওয়ার পর তিনি কেমন বিচলিত বোধ করলেন। তিনি তাঁর ভুলের কথা গদিঘরের সবাইকে বললেন, তদুপরি নবনিযুক্ত কর্মচারীটির কাছে হাতজোড় করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে।'

এরপরে সেই কর্মচারী ভদ্রলোক যা বলেছিলেন সেটা স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কিছুই মনে করিনি। আপনিও ভুল করেছিলেন, আমিও ভুল করেছিলাম।'

এই কথা শুনে ব্যবসায়ীটি বললেন, 'আমি তো ভুল করেছিলাম। কিন্তু আপনি কী ভুল করেছিলেন?'

কর্মচারীটি বললেন, 'আপনার ভুল হয়েছিল আমাকে চোর ভেবেছিলেন। আর...।

ব্যবসায়ীটি বাধা দিলেন, 'আর?'

'আর আমার ভুল হয়েছিল আমি আপনাকে ভদ্রলোক ভেবেছিলাম।' এই বলে কর্মচারী ভদ্রলোক বহুকষ্টে পাওয়া সামান্য চাকরিটি ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু সব সময়ে এত সহজে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

একটি বাচ্চা ছেলে বারংবার চেষ্টা করছিল হাত ছেড়ে পালাতে। কিন্তু সে পারেনি। তার কোনো দোষ নেই।

সেটা ছিল এক দোলের দিন। রাস্তায় বাচ্চা ছেলেরা হই-হুল্লোড় করে রঙ নিয়ে খেলা করছিল। ভুষিকালো থেকে ক্যাটক্যাটে লাল বা বেগুনি অজস্র রঙে মাখামাখি হতে হতে বেলা বারোটা নাগাদ বাচ্চাগুলো ভূতের মতো দেখতে হয়ে গেল। বাড়ির জানলা দিয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে না পেরে একটি বাচ্চার মা রাস্তা থেকে তাঁর ছেলেকে জোর করে ধরে আনলেন।

ছেলেটি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মহিলার হাত ছাড়াতে। কিন্তু খুব শক্ত হাতে মহিলাটি ধরেছিলেন তাকে, সে কিছুতেই পিছলে যেতে পারল না, মহিলাটি তাকে পাকড়াও করে সোজা বাথরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ও সাবান দিয়ে পরিচর্যা করার পর যখন ছেলেটির আসল চেহারা বেরল তখন মহিলা অবাক, এ তো তাঁর ছেলে নয়। দোলের রঙ মেখে এমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে সব বাচ্চা—তিনি ধরতেই পারেননি যে অন্য একটা বাচ্চাকে নিজের ছেলে ভেবে ধরে নিয়ে এসেছেন।

ভদ্রমহিলা যখন তাঁর ভুল ধরতে পারলেন তখন ছেলেটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে

আর বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আর কোনো দিন আপনার ছেলের সঙ্গে রং খেলব না।'

অতঃপর আরো দুটি মারাত্মক ভুলের গল্প বলি। দুটি গল্পই তস্কর ও নারীঘটিত এবং রসিক ব্যক্তি মাত্রেই অন্য আকারে গল্প দুটো কোথাও না কোথাও শুনেছেন।

প্রথম গল্পটি ক্লাবে তাসের টেবিলে শোনা। অনেক রাত্রে তাস বাঁটতে বাঁটতে এক ভদ্রলোক বললেন, 'কাল রাতে যখন এখানে তাস খেলছিলাম, তখন আমাদের বাসায় চোর ঢুকেছিল।'

সেই শুনে তাঁর পার্টনার জিজ্ঞাসা করলেন, 'চোর কিছু পেয়েছে?'

তাস বাঁটা শেষ করে একটি অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, 'তা পেয়েছে,' বলে চুপ করে গেলেন।

স্বভাবত পুনরায় প্রশ্ন হল, 'কী পেল?'

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'প্রচুর। আমার স্ত্রী ভুল করে ভেবেছিলেন আমি বুঝি বাড়ি ফিরলাম। প্রথমে তিনি একপাটি হাইহিল জুতো ছুড়ে মারলেন। চোরটা তো আমার মতো অভিজ্ঞ নয়, মাথা সরিয়ে নেয়ার আগে নাকে গিয়ে হিলটা লাগল। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত, লোকটা চোখে সরষে ফুল দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সেই অবস্থায় অব্যর্থ লক্ষে তার মাথায় পড়ল লেডিস ছাতার স্টিলের বাঁট।' একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বলো, আর কী চাই?'

দ্বিতীয় গল্প ওই একই, শুধু একটু রকমফের।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় তস্কর, সাক্ষীর কাঠগড়ায় মহিলা অর্থাৎ ওই তাস খেলোয়াড়ের সহধর্মিণী। হাকিম সাহেব সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাননীয়া ভদ্রমহিলা, আমি আপনার সাহসের প্রশংসা না করে পারছি না। যেভাবে একাকী আপনি ওই চোরকে ধরেছেন, তারপরে পুলিসের হেফাজতে তুলে দিয়েছেন সবই অতুলনীয়, কিন্তু আপনি আমাকে বলুন এমন নৃশংসভাবে কে এই আসামীকে প্রহার করল? এর নিচের পাটির সামনের তিনটে দাঁত ভাঙা, একটা চোখ কালো হয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, কপালে কাটা দাগ—সেখানে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে রয়েছে। এতো নির্যাতন এর ওপরে কে করল?'

ভদ্রমহিলা শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমিই মেরেছি একে।'

আদালত স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'একটা চোরকে এমন নৃশংসভাবে মারতে পারলেন আপনি?'

ভদ্রমহিলা অধিকতর শান্তকণ্ঠে বললেন, 'অন্ধকারে আমি ঠাহর করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম আমি আমার স্বামীকে পেটাচ্ছি। ভুল করে যে চোরটাকে মারছি তা মোটেই বুঝতে পারিনি।'

পরামর্শ এবং আদেশ ও উপদেশ

এই সামান্য নিবন্ধের এত দীর্ঘ নাম, কথায় আছে না বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, বোধ হয় সেই রকম হয়ে গেল।

কিন্তু পরামর্শ আর উপদেশে কী প্রভেদ? আবার আদেশ এবং উপদেশের মধ্যেই বা তফাৎ কী? কোন গল্পটা পরামর্শের আর কোন গল্পটা উপদেশের—রম্যকাহিনীতে তার সীমানা নির্ধারণ করা রীতিমতো কঠিন।

আর তার প্রয়োজনই বা কোথায়?

তবে উপদেশ বা আদেশ একটু একটু থাকলেও এই রচনার খণ্ডকাহিনীগুলি প্রায় সবই পরামর্শ সংক্রান্ত এবং একটু আধটু আদেশ ও উপদেশ যা আছে সে সমস্তই আমাদের চিরপরিচিত ডাক্তারবাবুর বা উকিলবাবুর।

শরীর খারাপ হলে, দেহযন্ত্রটা একটু গোলমাল করলে সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারটা কোনো নিকটজন বা শুভানুধ্যায়ী জানতে পারলে অবশ্যই বলেন, 'ডাক্তারের পরামর্শ নাও।'

অবশ্য এই বলাটাও পরামর্শ। আর ডাক্তারের যে পরামর্শ নিতে তারা বলেন, সেটা শুধু পরামর্শ নয়। ডাক্তারকে পরামর্শ করলে কিঞ্চিৎ ভিজিটের বদলে ডাক্তারবাবু আমাদের যা দেন তাহল পরামর্শ প্লাস উপদেশ প্লাস আদেশ।

স্বামী স্ত্রীকে পরামর্শ দেয়, 'এ বছর মহীশূরে খুব গরম। সেখানে না যাওয়াই ভালো, আর 'অত সময় বা টাকাই বা কোথায়,' তারপর অনুরোধ করেন, 'তার চেয়ে চলো পূজার একটা দিন ডায়মন্ডহারবার বা দীঘা থেকে ঘুরে আসি।'

এরপরে স্ত্রীরত্ন যখন বলেন, 'চাপ, ইডিয়েট, মহীশূরেই যেতে হবে।' সেটা কিন্তু নির্ভেজাল আদেশ।

ডাক্তার ছাড়া পাড়ার মাস্তান, গুরুজন, গুরুদেব, স্ত্রী, উপরওয়ালা—এঁরা আদেশ দিয়ে থাকেন।

আরো যাঁরা আদেশ দেন তাঁদের মধ্যে পড়েন নাপিত, জুতো পালিশওয়ালা এবং ট্রাফিক পুলিস। নাপিত ঘাড় সোজা রাখতে বলে যেটা অনেকের খুব কঠিন কাজ। জুতো পালিশওয়ালা কিছু বলে না, সে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ব্যক্তি। সে শুধু পালিশের বুরুশ ঠুকে আদেশ দেয় পালিশ বাক্স থেকে পা নামানোর জন্যে বা ওঠানোর জন্য। আর ট্রাফিক পুলিস কী রকম আদেশ দান করেন সে তো সকলেরই জানা।

আপাতত ডাক্তারি আদেশের দুটো ঘটনার কথা বলি।

প্রথমটা আমার নিজেকে নিয়ে।

আমি একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। আমার মতো উচ্চতার সাধারণ মানুষের তুলনায় আমার স্বাস্থ্য অর্থাৎ ওজন শতকরা দেড়শো ভাগ বেশি। মানে দেড়গুণ বেশি।

আমার যিনি গৃহচিকিৎসক, তিনিও আমার মতোই স্বাস্থ্যবান। রোগী-ডাক্তার, আমরা উভয়েই যাকে বলে গতরে গর্দানেও ঠিক তাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু মোটেই নিজের কথা খেয়াল রাখেন না। কোনো অসুখ হলেই আমাকে দেখতে এসে প্রথমেই আদেশ করেন, 'ওজন কমাও'। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে রগে টান ধরেছে, ভয়াবহ যন্ত্রণা, ডাক্তার বললেন, 'ওজন কমাও'। পেটে যন্ত্রণা হয়েছে, ডাক্তার বললেন এ যন্ত্রণা পেটের ভেতরে নয়, ভুঁড়ির মাংসপেশির, 'ওজন কমাও।' শেষ রাতে নাক আটকিয়ে যায় দম বন্ধ হয়ে ধড়পড় করে ঘুম থেকে উঠে বসি, ডাক্তার বলেন নাসারন্ধ্রে মজ্জা বেড়েছে, 'ওজন কমাও।'

ডাক্তারবাবু আমাকে এই সব উপদেশ দিচ্ছেন অথচ চোখের সামনে দেখছি তাঁর ওজন আয়তন আরো বাড়ছে।

অবশেষে একদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। সেদিন ডাক্তারবাবু বেশ গুছিয়ে বসেছেন। আমার প্রেসার-ট্রেসার মেপে, জিভ ও নাড়ি দেখে আমার চেয়ারে আমার লেখার টেবিলে বসে আমার স্ত্রী, হাতের এক পেয়ালা চা, দুটো মাখন টোস্ট এবং একটা ওমলেট খেয়ে নির্বিকার ভাবে আমার কবিতা লেখার খাতা থেকে একটা সাদা পৃষ্ঠা, আমি হা-হা করে উঠবার আগে ছিঁড়ে ফেলেন এবং তারপর প্রেসক্রিপ্‌শন লিখতে লিখতে আদেশ করলেন, 'আমাদের অন্তত দশ কেজি ওজন কমাতে হবে।

আমি বললাম, বলতে বাধ্য হলাম, 'হ্যাঁ অবশ্যই। আমি পাঁচ কেজি আর আপনি পাঁচ কেজি। দুজনে মিলে দশ কেজি।'

এই সূত্রে অনেকদিন আগের অন্য একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। আমার এক বন্ধু সদ্য ডাক্তারি পাশ করে নতুন চেম্বার করে বসেছে, সেই আমাদের কালীঘাটের পুরনো পাড়ায়।

বাড়ির কাছেই পুরোনো বন্ধুর চেম্বার। তার প্রাকটিস এখনও জমেনি। সকাল-সন্ধ্যা আমারো তেমন কোনো কাজ নেই, তার চেম্বারে গিয়ে দুজনে মিলে আড্ডা দেই। আরো কেউ কেউ কখনো সখনো আসে।

তা একদিন হয়েছে কি সন্ধ্যাবেলা আমি আর আমার ডাক্তার বন্ধু বসে আছি। এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকলেন। ভদ্রলোকের নাম জ্ঞানদাবাবু, জ্ঞানদাবাবুকে

আমরা দুজনাই চিনি। তিনি আমাদের পাড়ার প্রবীণ ও বিখ্যাত মদ্যপ। এ সব খেলে যা হয় বুড়ো বয়েসে লিভারের অসুখ টসুখ বাধিয়ে বসেছেন কিন্তু মদ্যপান কিছুতেই ছাড়ছেন না। প্রতিদিন রাত দশটা সাড়ে দশটায় দেখি কোথা থেকে মদ খেয়ে টলতে টলতে আসছেন হাজরা পার্কের পাশ দিয়ে আর গুন গুন করে গান ভাঁজছেন মুখে সেই একই গানের একটাই মাত্র পংক্তি, বহু পুরোনো কিস্মৎ ছবির গান, ঘর ঘর মে দেওয়ালি, মেরা ঘর হ্যায় অন্ধেরা।

সেদিন সম্ভবত মদ্যপানে যাওয়ার পূর্বে তিনি একটু তাঁর লিভারটা যাচাই করে নিতে ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ পেট টিপে তারপর জিভ-চোখ সব দেখে আমার ডাক্তারবন্ধুটি জ্ঞানদাবাবুকে বললেন, 'জ্ঞানদাবাবু, আপনার আর কোনো চিকিৎসা-টিকিৎসা করে লাভ হবে না, আপনি এখন মদ খাওয়াটা পুরোপুরি ছেড়ে দিন।'

মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ শুনে সেই মুহূর্তে জ্ঞানদাবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপর দুম করে বলে বসলেন, 'তুমি ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও।'

আমার ডাক্তারবন্ধুটি তো হতভম্ব। আমিও তথৈবচ। পেট টেপার সুবিধে করার জন্যে ধুতির কষিটা জ্ঞানদাবাবু একটু ঢিলে করে দিয়েছিলেন, এবার সেটাকে কষে বেঁধে চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জ্ঞানদাবাবু আমার বন্ধুকে বললেন, 'তুমি কী জানো হে। তুমি সেদিনের ছোকরা। জানো, মদ খেলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আয়ু বৃদ্ধি হয়। জানো বুড়ো মাতালেরা বুড়ো ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচে।'

রাগে গজ গজ করতে করতে ভিজিট না দিয়ে জ্ঞানদাবাবু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারের পরামর্শ প্রত্যাখান করে।

দুর্ভাগ্যবশত ঠিক অনুরূপ আর একটি ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এক উকিলের বাড়িতে।

সত্যি কথা বলতে কী উপদেশ বা পরামর্শ বলতে যা বোঝায় সেটা ওই উকিলবাবুরাই দিয়ে থাকেন। সেটাই তাঁদের জীবিকা। তাঁরা পরামর্শ দিয়ে পয়সা পান।

এমনিতে হরবখত কত লোকই তো কত লোককে কত রকম পরামর্শ দিচ্ছে কিন্তু পরামর্শের বিনিময়ে পয়সা পান একমাত্র উকিলবাবুরাই। ডাক্তাররাও পরামর্শ দেন তবে সেই সঙ্গে চিকিৎসাও তো করতে হয়।

উকিলবাবুদের পরামর্শ হল পেশাদারি উপদেশ তো সেটা যতই ঘরোয়া বা যৎসামান্য হোক না কেন? এক ক্লাবে জনৈক ভদ্রলোক এক উকিলবাবুকে

বলেছিলেন যে তাঁর বড়ো ছেলে ভিন্ন জাতে বিয়ে করছে এবং তিনি এ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন ব্যবহারজীবি মহোদয়ের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে ওই ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে একটা বিল পেলেন উকিলবাবুর কাছ থেকে।

'গত রাত্রে বৈষয়িক পরামর্শ বাবদ ফি একশো আটাশ টাকা।'

তবে আমি নিজে এক উকিলবাড়িতে যা দেখেছিলাম সেটা ঠিক এরই বিপরীত।

আমি একটি বৈষয়িক প্রয়োজনে উকিলবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। আমার সামনেই ছিলেন গ্রাম্য গোছের এক মালকোছা দিয়ে ধুতি এবং হাফসার্টপরা ভদ্রলোক।

আমি যখন গিয়েছি তখন শলাপরামর্শ প্রায় শেষ। আমি শুধু শুনতে পেলাম উকিলবাবু বলছেন, 'বুঝলেন তো, আপনি অনুরাধাদেবীর জমির ওপরে যে দেয়ালটা তুলেছেন সেটা ভেঙে ফেলুন। কাজটা ঠিক হয়নি। আইনসঙ্গত হয়নি।'

সব শুনে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে গ্রাম্য-ভদ্রলোকটি যখন চলে যাচ্ছেন— উকিলবাবু ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার পরামর্শের ফি-টা দিয়ে যাবেন।'

মুখ কালো করে মক্কেল ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার পরামর্শ আমি নিচ্ছি না আর তাই ফি দিচ্ছি না।'

আরেকটি উকিলের পরামর্শের কাহিনী বলি।

এই কাহিনীর উকিলবাবুটি নিতান্ত তরুণ। তিনি সদ্য আদালতে যাতায়াত করছেন।

সেদিন আদালতে এক খুনের মামলায় আসামীকে আনা হয়েছে। জজসাহেব আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উকিল কোথায়?

আসামী হাতজোড় করে নিবেদন করল, 'হুজুর আমি গরিব মানুষ। আমার উকিল দেবার ক্ষমতা নেই।'

এ রকম ক্ষেত্রে আদালত সরকারি খরচে এক উকিল নিযুক্ত করতে পারেন, জজ সাহেব ওই তরুণ উকিলটিকে এই আসামীর দায়িত্ব দিয়ে বললেন, 'আপনি এর কেসটা নিন, একে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে এর কেসটা শুনুন, তারপরে উপযুক্ত পরামর্শ দিন।'

উকিলবাবু তাই করলেন, আসামীকে নিয়ে কোর্টের পিছনের বারান্দায় চলে গেলেন তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কোর্টে ফিরলেন কিন্তু একা। জজ সাহেব বললেন, 'আসামী কী হল।' উকিলবাবু বললেন, 'আসামীর কাছে যা শুনলাম তাতে ও রক্ষা পেত না। ওকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলাম এই একটু আগেই ও কোর্টের দেওয়াল টপকিয়ে বড়ো রাস্তায় চলে গেছে।'

পরামর্শ—অপরামর্শ, আদেশ উপদেশের কচকচি আমি ইচ্ছে করলে পাতার পর পাতা অথবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারি কিন্তু সামান্য রচনাটি ঠিক অপাঠ্য করার আমার ইচ্ছে নেই।

তার চেয়ে পাঠকনন্দিত একটি কাহিনী স্মরণ করি।

পাঠকনন্দিত কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না।

কেউ হয়ত অদ্যাবধি এই গল্পটি পাঠ করেনি। এই গল্পটি আমি অবশ্য লিখেছিলাম খেলাচ্ছলে। কিন্তু আমার কোনো লেখা কবেই বা কে মন দিয়ে পাঠ করে?

পাঠকও খেলাচ্ছলেই পাঠ করেছিলেন এবং ভুলেও গেছেন।

তবে সুপরামর্শের এর চেয়ে ভালো গল্প বোধ হয় আর হয় না!

মা চিঠি লিখছেন ছেলেকে। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে। ছেলে নিজে দেখে ভালোবেসে পাত্রী মনোনয়ন করেছে। এখন বাবা-মা দিনক্ষণ ঠিক করে শুভলগ্নে বিয়ে দেবেন।

মা ছেলেকে লিখছেন—'এর চেয়ে আনন্দের কথা হয় না। আমি আর তোমার বাবা কী যে খুশি হয়েছি! আমরা চিরদিনই চেয়েছি একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। একটি ভালো মেয়ে পুরুষ মানুষের জীবনে আর সংসারে শান্তি নিয়ে আসে।' ...ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি তোমার মা।

ঠিক এর নিচে অতি দ্রুত হস্তাক্ষরে লেখা ঃ বিশেষ উপদেশ—

'তোর মা চিঠিটা খামে ভরে এই মাত্র পাশের ঘরে গেছে ডাকটিকিট আনতে। সেই সুযোগে লিখছি, ওরে বোকা বিয়ে করিস না। মারা পড়বি। ধনে প্রাণে ডুবে যাবি।'

ইতি— তোমার বাবা।

মাতাল-রহস্য

মদের মতই মদের গল্পও অতি উত্তেজক। এর আগে নানা বিষয় নিয়ে কত উল্টোপাল্টা লিখেছি। কুকুর-বেড়াল, চোর-ডাকাত, ছাতা-মাথা কত না খুচরো গল্প শুনে, বানিয়ে বা অন্য বই থেকে টুকে লিখলাম, কিন্তু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে ইতিমধ্যে টের পেয়েছি মাতাল কথামালা যত জমজমাট হয় কিছুই আর তেমন জমে না। মদ ও মাতালের আকর্ষণের কোনো তুলনা হয় না।

সম্প্রতি বেড়াল নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে গেছে বোধহয়। ফলে আমার শোচনীয় ঝুল অবস্থা দেখে আমার পরম বন্ধু রসরঞ্জন শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তিনটি সুরাসিক্ত রসিকতা প্রেরণ করেছেন, সেগুলি নিবেদন করছি। সুরারস পিপাসু পাঠকপাঠিকাবৃন্দ সে সব মন দিয়ে পাঠ করুন যদি কিঞ্চিৎ গোলাপি আবেশ তাঁদের স্পর্শ করে সমস্ত কৃতিত্ব হিমানীশবাবুর, আমার নয়।

স্কচ হুইস্কি দিয়ে আরম্ভ করা যাক। এটাই নাকি জগৎসংসারের সেরা মদ। এক বিখ্যাত ফৌজিদারি উকিলের বাড়িতে এক মক্কেলের আবির্ভাব। উকিলবাবুর টেবিলের ঠিক সামনের চেয়ারে বসে মক্কেল মহোদয় বললেন, 'স্যার, এক কেস স্কচ হুইস্কি চুরি করার দায়ে ধরা পড়েছি। এই কেস কি আপনি নেবেন? উকিলবাবু তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে মক্কেলের কানের খুব কাছে মুখটা নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, নেব। নিশ্চয়ই নেব। কেসটা কোথায়?'

দ্বিতীয় গল্পটি প্রথমটির মতো তত সরল নয়। রেললাইনের পাশে এক উচ্চতল বাড়ি। সে বাড়ির উপরের এক ফ্ল্যাটে পার্টি হচ্ছে, পার্টি ভাঙল গভীর রাতে, তখন লোডশেডিং, ঘুটঘুটে অন্ধকার, লিফটও বন্ধ। কয়েকজন মাতাল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে অবশেষে রেললাইনের উপরে এসে পৌঁছল। সকলের অবস্থাই এমন যে চলতে পারছে না আর, রেললাইনের ওপরে হামাগুড়ি দিতে লাগল এইভাবে মিনিট কুড়ি যাওয়ার পরে একজন বলল, 'আজ বাড়িতে পার্টিতে এসেছিলাম বটে। অর্ধেক সিঁড়ি সিমেন্টের আর বাকি সিঁড়ি কাঠের।' এই শুনে দ্বিতীয় এক মাতাল বলল, 'কী উঁচু সিঁড়িরে বাবা, নামছি তো নামছিই, এ যে আর শেষ হয় না।' এইবার তৃতীয় হামাগুড়িদাতা মাতাল বলল, 'তা, সিঁড়ি বেয়ে নামতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তবে রেলিং দুটো এতো নিচু করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে না গেলে ধরতেই পারতুম না।

তৃতীয় গল্পটিও হিমানীশ প্রেরিত। কিন্তু স্বীকার করা ভালো, গল্পটি হিমানীশের নয়, এর প্রবক্তা সাংবাদিক সন্তোষ বাগচি। শ্রীযুক্ত বাগচি কিছুকাল আগে অবসর নিয়েছেন, তাঁর রসবোধ অতি সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত।

সন্তোষবাবুর গল্পটিও অবশ্য মাতাল-সংক্রান্ত। এ কিন্তু ভালো জাতের মাতাল। বছরের শেষ দিনে নিউ ইয়ারস ইভে ভদ্রলোক প্রচুর মদ্যপানের পর প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের মনে, 'না আর নয়, আজ থেকে মদ খাওয়া শেষ। এই বাজে নেশা ছেড়ে দিলাম।' সোজা বাড়ি গিয়ে যথারীতি বিছানায় শয়ান হলেন তিনি। পরের দিন দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল, তখন তাঁর আগের রাতের প্রতিজ্ঞা মনে পড়ল। খুশি হলেন নিজের ওপরে, নববর্ষে চমৎকার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; না, সত্যি সত্যি আর কখনো মদ্যপান নয়।

বিকেলের দিকে রাস্তায় বেরোলেন তিনি। তখন তিনি নিজের মনের জোর পরীক্ষা করার জন্যে পানশালার সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলেন। নববর্ষের অপরাহ্ন, পানশালার ভিতরে তখন মদিরার মোহজাল; উচ্ছল, আনন্দিত জনতা। রাস্তা থেকে মৃদু সঙ্গীতের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে। সব কিছু অবহেলা করে, সুরার হাতছানি উপেক্ষা করে ভদ্রলোক নিতান্ত মনের জোরে এগিয়ে গেলেন পানশালা অতিক্রান্ত হয়ে।

কিছু দূরেই আরো একটা পানশালা। সেখানে অনুরূপ প্রলোভন, প্রচুর নরনারী মদ্যপান করছে। কিন্তু তিনি বেপরোয়া, একে একে বহু পানশালা পার হয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরতি পথে, ওই একই শালাগুলির সামনে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে দীপ্তচিত্তে চলে গেলেন।

এইভাবে বার দশেক পারাপার করার পরে ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, ওরে মন, তোর তো খুব জোর। এই দোকান, এই মদ, এই সব মানুষজনেরা পান করছে, এততেও তোর কোনো বৈকল্য নেই, লোভ নেই। সাবাস! ওরে মন, সাবাস, সাবাস।'

ততক্ষণে নববর্ষের মধুর সন্ধ্যা নীল কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সরাব সরণিতে উচ্ছলতায় অংশ নিতে এসেছে। রাজপথে খুশি জনতার ভিড়, সুমধুর সুরলহরী ভেসে আসে পাশের পানশালাগুলি থেকে। সেই সঙ্গে হাসি, গান।

এবার ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, 'ওরে মন, ওরে আমার মন, তুই যখন এতই সাহসের পরিচয় দিলি, আজ এই নতুন বছরের শুভদিনে আয় তোকে একটু খুশি করি,' এই স্বগতোক্তি করে ভদ্রলোক তাঁর মনকে খুশি করার জন্যে সামনের পানশালার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত বাগচি, দুই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করা হয়ে গেল, আমি নিজেও মানবজাতির ওই বিপজ্জনক প্রশাখার (সৈয়দ মুজতবা আলী দ্রষ্টব্য)। ব্যাপারটা নাকি সুবিধার নয়, ত্র্যহস্পর্শের দোষ কাটানোর জন্যে এইখানে এক কুলীন কায়স্থকে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

প্রবীণ, রাশভারি, বিদগ্ধ পরশুরাম বা রাজশেখর বসুকে মদের গল্পে কখনই স্মরণ করতে সাহস হয়নি। এবার শুধু ফাঁড়া কাটাবার জন্যে করছি।

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালি গল্পে পরশুরাম মদের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়েছেন। দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন, 'দশ-বিশ কলস উত্তম আসব পাঠিয়ে দেব? পৈষ্টী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা, মৈরেয় আর দ্রাক্ষেয় মদ্য, সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়।'

শুধু ঈশ্বর বা অবতার নন, যন্ত্র সম্পর্কেও মদের কথা বলেছেন পরশুরাম। একগুঁয়ে বার্তা গল্পে আছে, মোটর গাড়ির মালিক নিজের জন্যে এক বোতল ব্র্যান্ডি কিনলেন আর তিন বোতল সাজাহানপুর রম (Rum) কিনলেন তাঁর গাড়ির জন্যে কারণ কেনার পরই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, গাড়িকে রম খাওয়ালে (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢাললে) তার বেশ ফূর্তি হয়। হর্সপাওয়ার বেড়ে যায়।

মাতাল প্রসঙ্গে আরেকজন সিদ্ধপুরুষকে স্মরণ করি, তিনি অতুলনীয় ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এক গুলিখোর মাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, 'আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। সাতঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা জোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয়ত কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুরফুর করিয়া বাতাস বহিতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে গমন করেছেন, সে পথে আরেকটু যাই, আর একটা ল্যাম্পপোস্ট ছুঁই।

কাহিনীটি পুরোনো। জনৈক সুরাপায়ী বারে এসে মদের অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে একটা পোষা গিনিপিগ বার করে টেবিলের ওপর রাখতেন। তারপর কয়েক পাত্র পান করার পরে গিনিপিগটিকে তুলে ভালো করে দেখে আবার

পকেটে পুরে চলে যেতেন। একদিন বেয়ারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'দাদা গিনিপিগটাকে নিয়ে আসেন কেন?' দাদা বললেন, 'দ্যাখো, আমি তো একটা গিনিপিগ আনি। যখন খেতে খেতে দেখি দুটো গিনিপিগ হয়েছে, তখন দুটোকে দু পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে যাই।'

কিছুদিন পরে গিনিপিগটা মারা গেছে। গিনিপিগ ছাড়া ভদ্রলোক এসেছেন। বেয়ারা বলল, 'দাদা এবার কী করবেন?' দাদা বললেন, 'সামনের টেবিলের লোকটা যেই ডবল হয়ে যাবে আমি উঠে পড়ব।' এইভাবে ভালোই চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দাদা এক পেগ খেয়েই উঠে পড়লেন বেয়ারাটি ছুটে এল, দাদা আজ এত তাড়াতাড়ি? দাদা বললেন, 'তাই তো আজ বড়ো তাড়াতাড়ি নেশা হয়ে গেল। সামনের টেবিলের লোকটা এক পেগ খেতেই দেখি ডবল হয়ে গেছে।' বেয়ারা হেসে বললে, 'দাদা, ও দেখে ভয় পাবেন না। ও টেবিলে একজন নয় দুজনই আছে। ওরা যমজ ভাই। তাই ডবল মনে হচ্ছে।'

দাদা এবার শান্ত হয়ে টেবিলে বসলেন এবং ডবল রিডবল না হওয়া পর্যন্ত, দুজন চারজন না হওয়া পর্যন্ত মনের সুখে সুরাপান করতে লাগলেন।